ফুলে গন্ধ নেই

গৌতম রায়

সাহিত্য প্রকাশ
৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা - ৯

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৭১

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র, ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : রবীন দত্ত

মুদ্রাকর : জগৎরঞ্জন মজুমদার, আকস্মিকা

৭, বিশ্বনাথ মতিলাল লেন, কলিকাতা-১২

মাত্র পনেরো দিনের বিয়ে। তাও দেখাশুনো করে নয়। রীতিমত প্রেমের বিয়ে। পাঁচ বছরের জমাট প্রেমের পরিণয়। অনেক খুনসুটি, অনেক মান অভিমান, অনেক টানাহেঁচড়ার পর রেজিস্ট্রি এবং সাতপাক।

গোলাপসুন্দর আর নয়নতারা। নামগুলো সেকেলে হলেও দুজনেই তরতাজা যুবক-যুবতী এবং মনে প্রাণে আধুনিক। দুজনের চাকরিই বেশ গায়ে-গতরে। নয়নতারার ওপর অনেকেরই লোভটোভ ছিল। থাকারই কথা। পহেলে দর্শনডালিতে ও একশোয় একশো পাবার দাবি রাখতে পারে। সাড়ে পাঁচ ফুটের ছিপছিপে মেয়ে। চলনে বলনে দারুণ স্মার্ট। মাজা রঙ। নয়নতারার নয়নবাণটিই তার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। কোন ছেলের দিকে যৎসামান্য কামনামিশ্রিত তেরচা চাহনি অবশ্যই ছেলেটিকে ঘায়েল করবে, এবং অফিসে যুবক এবং সদ্যযুবকের দল, যদিও তারা সংখ্যালঘু, প্রত্যেকেই মোটামুটি অফিস কামাই করা বন্ধ করে দিল। অ্যাটেন্ডেন্সের প্রতিযোগিতায় তখন সবাই কে কাকে হারায়!

পূর্ণ যুবক এবং সদ্য যুবকের দলকে সংখ্যালঘু বলার কারণ আছে। বর্তমানে অফিসে, ব্যাঙ্কে, সরকারি, আধাসরকারি, আর বেসরকারি ব্যবসাকরা অফিসগুলির কেউই আর নতুন কর্মীনিয়োগ করছে না। এটা যে কখন অলিখিত নিয়ম থেকে নিয়মে পরিবর্তিত হয়ে গেছে সেটা একমাত্র ম্যানেজমেন্ট আর কোম্পানির ইউনিয়নগুলোই বলতে পারে। তাই অফিস টফিসে নতুন মুখের দেখা পাওয়াই ভার। অবশ্য কিছু ছাড়ের ব্যবস্থাও আছে। কর্মরত অবস্থায় যদি কোন কর্মীর মৃত্যু হয় তাহলে তার ছেলে বা মেয়ে যোগ্যতা অনুসারে যে কোন একজন একটি চাকরি পেতে পারে। কিন্তু সে আর কজন? তাই অফিসগুলোয় এখন বুড়ো-বুড়িদের সংখ্যাই বেশি। এবং তারা প্রায় অধিকাংশই পঞ্চাশ পেরিয়ে যাওয়া। কেউ বা অবসরের দোরগোড়ায়।

মৃত বাবা আর মায়ের দৌলতে যারা এসেছে তারা অতএব সংখ্যালঘু। অবশ্য নয়নতারা তাদের দলের কেউ না।

এই মুহূর্তে নয়নতারা সম্পর্কে কিছু বলে নেওয়া ভালো। চাকরির তার কোন দরকারই ছিল না। বলা যেতে পারে সময় কাটানোর ফিকির।

প্রোথিতযশা অ্যাডভোকেট চন্দ্রমাধব ব্যানার্জির টাকা বা মানসম্মান কোনটাই কম ছিল না। চন্দ্রমাধবের ইচ্ছেও ছিল না নয়নতারা কোন চাকরি করুক। প্রথমত সে একমাত্র মেয়ে। আদরে সোহাগে মানুষ হওয়া প্রায় রাজকুমারী। অবশ্য এই মেয়েই অন্য কিছু হতে পারতো। কিন্তু মা বৈশালী আর বাবা চন্দ্রমাধবের অতি প্রশয়ে সে সর্ববিষয়েই একরোখা। যেটি করব মনে করে সেটি করেই ছাড়ে। অবশ্য সে করাটা ঠিক কতদিন তার ভালো লাগবে তা কিন্তু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষীর পক্ষেও বলা সম্ভব নয়।

মাস্টার ডিগ্রি করার পর তার ইচ্ছে করছিল ছেড়ে দেওয়া গানটাকে আবার নতুন করে ঝালাবার। বসেও ছিল মাসখানেক। ব্যস্। তারপরেই ইতি। হঠাৎ তার শখ হল সিরিয়াল ব্যাপারে জানার। সে ভেবে দেখল তার থেকেও কমস্মার্ট, কমসুন্দরী মেয়েরা আজকাল রেগুলার স্টুডিওপাড়া চষে ফেলছে। প্রত্যেকের হাতে একটা করে সেলফোন। কে কত কাজ পায় কে জানে।

নয়নতারা কয়েকদিন গিয়েছিল ওর বাবার বন্ধু অলোক শাসমলের কাছে। না, কোন বিশাল ইচ্ছেটিচ্ছে নিয়ে নয়। অভিনয় তো নয়ই, নিতান্তই কৌতূহল। কেমন করে ছবি টেক করা হয়, কেমন করে নায়ক-নায়িকা স্বচ্ছন্দে অভিনয় করে। কেমন করে ডিরেক্টর স্টার্ট সাউন্ড ক্যামেরা অ্যাকশান নিয়ে রুটিন ধরে কাজ করে যাচ্ছেন এ সবই নয়নতারার দেখার বিষয় ছিল।

দিন তিনেক স্টুডিওয় যাবার পরই এলো অফার। অলোকই প্রপোজাল দিয়েছিলেন, খুকি অ্যাকটিং করবি?

নয়নতারার ডাকনাম খুকি। লজ্জাটজ্জার কোন ধার সে কোনেদিনই ধারেনি। ঘাড় বেঁকিয়ে বলেছিল,—আঙ্কেল, তুমি আমায় রিয়েলি অ্যাকট্রেস করতে চাইছ নাকি?

মৃদু মৃদু হেসে অলোক বলেছিল,—ইচ্ছে করলেই কাউকে অ্যাকট্রেস কবানো যায় না ইফ ওয়ান ইজ নট বেসিক্যালি অ্যান অ্যাকটর। অভিনয়টা রক্তে থাকা দরকার।

—দেন হোয়াই ইউ আর প্রভোকেটিং মী? অ্যান্ড ওয়েস্টিং ইওর টাইমস্? তুমি খুব ভালোকরেই জান আমার বাপঠাকুরদা কেউই কিন্তু অভিনেতা নন। ওটা জিনেটিক ব্যাপার।

—ভুল বললি খুকি। তোর বাবা আর আমি, আমরা প্রায় সমবয়েসী। ছোটবেলায় আমরা একটা ইউনিট করেছিলাম।'

—মাই গড! আমার বাবা চন্দ্রমাধব ব্যানার্জি ওয়াজ অ্যান অ্যাকটর?

—আবার বলছি খুকি. অ্যাকটর হওয়া অত সোজা নয়। চন্দ্রমাধবেরও থিয়েটারে অভিনয় করার তেমন কোন বাসনা ছিল না। আমার চাপে পড়েই করতো। খারাপ করতো না। তবে ট্যালেন্ট ফ্যালেন্ট ছিল না। ভালো নকলনবিশি ছিল। যা করে দেখাতাম, স্টেজে সেটাই হুবহু তুলে ধরতে পারতো। এটাই ওর ক্যালি। আর কজনই বা তা পারে? অতএব তোর রক্তে সামান্য হলেও অভিনয়ের বীজ আছে। তুই যেটাকে জিনেটিক বললি। করবি? বীফিটিং রোল। আমি অনেক ভেবেই তোকে করতে বলছি। ছোট রোল। বাট, ভালো রোল। মজা পাবি।

সামান্য কিছু ভাবতে ভাবতে নয়ন বলেছিল,—আঙ্কেল, তুমি অনেক আগে থেকেই ব্যাপারটা ভেবে নিয়েছ, তাই না?

—বলতে পারিস।

—এবং, এখন আমি না বললে তুমি মনে মনে দুঃখ পাবে।

—দুঃখ না পেলেও, ঠিক তোর মতো একটা মেয়েকে আমায় খুঁজে বার করতে হবে। অ্যান্ড ইট উইল টেক টাইম। বুঝতেই পারছিস সিরিয়ালের ব্যাপার। আমাদের দেরি করার বা ফেলে রাখার কোন স্কোপ নেই।

—ওক্কে। ডান্। তবে—

—টাকাকড়ি?

—দ্যুৎ, ওসব কথা কে বলছে, ঐ 'তবে' টা খুব ডেঞ্জারাস। তোমার মনঃপুত হবে না।

বরং শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

—ঝেড়ে কাশো মা।

—মুড্ না হলে আমি কিন্তু যখন-তখন তোমায় ঝুলিয়ে দিতে পারি।

—সে ব্যবস্থাও আমার আছে। কারণ আমার কাজই তো মুডি গুলোকে গুডি করা।

বলেই তিনি হাঁক দিয়েছিলেন—প্রভাত, প্রভাত, একে দিয়ে কনট্র্যাক্ট ফর্মটা সই করিয়ে নাও। আর খুকি—

কপট ধমকে নয়ন বলেছিল,—নো খুকি। নয়নতারা ব্যানার্জি।

—আচ্ছা বাবা তাই। আজ তোর বাড়ি যাব। আমার সঙ্গে ফিরবি। একটু হোমওয়ার্কের দরকার। দেখবি কালই তুই অনেকেরই মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিবি।

তো, মুণ্ডু ঘোরাতে না পারলেও প্রথম অ্যাপিয়ারেন্সে নয়ন গুড নয়, ভেরি গুড। মনিটরে নিজেকে দেখে ওর মনে হয়েছিল সে হিরোইন হতে পারবে। স্ক্রিনে তার ভেরি প্রেজেন্স অনেকেরই ঈর্ষান্বিত হবার কারণ হতে পারতো। কিন্তু অলোক আঙ্কেলের সব প্রত্যাশাকে ঘোলাজলে ফেলে দিয়ে নয়নতারা ডুব। অবশ্য ওর কাজটুকু শেষ করেই।

এরপর কেউ কেউ এসেছিলেন। এবং অলোক আঙ্কেল তো বটেই। কিন্তু নয়নতারা স্পষ্ট জানিয়ে দেয় সকাল থেকে সেজেগুজে মেকাপ নিয়ে হা পিত্যেশ করে বসে থাকার ধৈর্য তার নেই। আর ক্যামেরার সামনে গিয়ে যতঃ সব মিথ্যে মিথ্যে ডায়লগ তার পক্ষে আউরানো সম্ভব নয়। ব্যাপারটা খুবই বোরিং অ্যান্ড টিডিয়াস।

অতএব নয়নতারার ফিল্ম বা টিভি কেরিয়ার শেষ। এরপর বেশ কিছুদিন ফের গানটান নিয়ে পড়ে। সেটাও আধখেঁচড়া চালিয়ে ঢুকে পড়ে কমপিউটার কোর্সে। কোর্স কমপ্লিট করেই চন্দ্রমাধবকে একদিন পাকড়াও করে ওর চাকরি করার বাসনা জানিয়ে দেয়।

চন্দ্রমাধব রাশভারি মানুষ হলেও মেয়ের কাছে আহ্লাদে জল, —কিন্তু মা, আমতা আমতা করে চন্দ্রমাধব বলেন, তুই কেন চাকরি করবি? তোর বাবার যা আছে তাই তোর পক্ষে অঢেল।

—এই তো বাপি, তোমাদের গণ্ডগোল এইখানেই। তোমার আছে, তা তোমারই থাক। সে টাকা আমাকে খরচ করতে দিলে রোজগার করা টাকা খরচ করার মেজাজটাই পাব না। আমি চাই আমার টাকায় আমি ইচ্ছে মতো খরচ করি।

—কিন্তু সামান্য কমপিউটার কোর্স করে তুমি আর কত টাকা পাবে, এবং সেটা যথেষ্ট খরচ করার পক্ষে নট ইনাফ।

—ঠিক আছে, কিছুদিন তো করি। ভালো না লাগলে ছেড়ে দিতে কতোক্ষণ। আরে বাবা ইংলিশে আমার মাস্টার ডিগ্রি আছে। এবং তোমার বিরাট সোর্স। তুমি একটা জায়গায় আমায় লাগিয়ে দাও।

অতঃপর চন্দ্রমাধব ব্যানার্জির পক্ষে মেয়ের একটা চাকরি জোটানো এই হার্ড মার্কেটেও অসম্ভব হয়নি। মালটিন্যাশন্যাল এই ফার্মটির এম ডি শরৎচন্দ্র শ্রীনিবাসের টিকি বাঁধা চন্দ্রমাধবের কাছে। অনেকভাবে। সে আর এক কাহিনী। নয়নের ব্যাপারে বলতেই, আরে সেকী, সেকী, তোমার মেয়ে বলে কথা। তবে কিনা গ্রেডেড স্টাফ হিসেবে ঢোকাতে পারব না। ওখানে ইউনিয়নের সাঁড়াশি আছে। ওকে পাঠিয়ে দিও। জুনিয়ার এগজিকিউটিভ করে নোব।

সেই চাকরি নয়নতারার। এবং নয়নতারার ঠাঁট ঠমক কেতা কায়দায় কিছু যুবকের পতন

এবং মূর্ছা যাওয়া ছাড়া অন্য কিছু হবারও ছিল না। তারা কামাই টামাই বাদ দিয়ে ঠিক সময়ে হাজিরা দিত এবং দূর থেকে ম্যাডামের দেহ এবং অঙ্গসুধা পান করে তৃষ্ণা মেটাতো। এবং অবশ্যই নয়নতারা তাদের কারো দিকেই মাত্র একবার কৃপাদৃষ্টিতে ঘায়েল করার পর দ্বিতীয়বার ফিরে তাকানোর কষ্টটুকুও করতে চাইতো না।

তবু, সেই নাক উঁচু নয়নতারা প্রেমে পড়ল। সি আই ডি অফিসার গোলাপসুন্দর বসুর। গোলাপের চাকরি, ভাল্লো চাকরি। সরকারি চাকরি। মাইনে পুরুষ্টু। নিরাপত্তা আছে। প্রমোশন আছে। তার পেটে বিদ্যে আছে। মগজে বুদ্ধি আছে। বুকে সাহস আছে। অবশ্য অপরাধীর পেছনে ছুটে বেড়ানোর কারণে জীবনের ঝুঁকিও আছে।

গোলাপসুন্দরের সঙ্গে নয়নতারার আলাপ বলা যেতে পারে একটা ঘটনা অথবা দুর্ঘটনা। দু'জন দু মেরুর বাসিন্দা। নয়নতারা ধনীবাবার একমাত্র খামখেয়ালি মেয়ে। তার ঘণ্টাখানেক আগের চিন্তার সঙ্গে একঘণ্টা পরের চিন্তার প্রায়শই কোন মিল থাকে না। এটা তার ইচ্ছাকৃত নয়। তার আবেগ। এক আবেগ থেকে আর এক আবেগে ঝাঁপ দেওয়াটাই তার চারিত্রিক কাঠামো। আর গোলাপসুন্দর ঠিক তার উল্টো। সে এক সি আই ডি অফিসার। তার চলার গতি আছে। কিন্তু সেটা আবেগতাড়িত নয়। সবটাই যুক্তিনির্ভর। তার কাজ সে ভেবে রাখে। ভাবতে থাকে সেই কাজটা কীভাবে সম্পন্ন করবে। এবং সেটি তার গন্তব্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই। একজন দু হাতে খরচ করতে পারলেই তৃপ্ত। অন্যজনের নয়ছয় করার কোন বাসনাই নেই। নয়নতারা রুপোর নয় সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছে। কিন্তু গোলাপসুন্দর যতই সুন্দর দর্শন হোক না কেন, তার শুরুটা ছিল কষ্টকর। অনেক কাঁটা-ঝোঁপ পার হয়ে আজ তার পরিচয় চিফ সি আই ডি অফিসার গোলাপসুন্দর বসু।

রবিবারের সন্ধে। সন্ধে বলা ভুল হবে। রাত প্রায় নটা। বন্ধুর জন্মদিনের নেমন্তন্ন সেরে ফিরছিল নয়নতারা। টালিগঞ্জ থেকে রাজা বসন্ত রায় রোড। গাড়িতে কতটুকুই বা রাস্তা। বন্ধুর বাবা চেয়েছিলেন কাউকে সঙ্গে দিতে। কিন্তু নিজের গাড়ি। পথ সামান্য। তায় নিজে ড্রাইভিং-এ পাকা। আর কলকাতা শহরের রাত নটা। নয়নতারার কাছে কোন ব্যাপারই নয়। তবু দুর্ঘটনাটা ঘটল। দুর্ঘটনা এমনি একটা ঘটনা যার কোন আভাস আগে থেকে পাওয়া যায় না। সেটা বিধি নির্দিষ্ট হয়ে ঘটে। কেন ঘটে তার তাৎক্ষণিক কোন ব্যাখ্যা নেই। অবশ্য পরে তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হতে পারে। কিন্তু নয়নতারা আর গোলাপসুন্দর। একজনের এসটিম আর একজনের পুলিস বাইক। সাধারণত হয় না, কিন্তু হোল। মুখোমুখি কলিশান। নাহ্! বড় কিছু অ্যাকসিডেন্ট হতে গিয়েও হোল না। ইঞ্চি দেড়েকের ব্যবধান দুটোই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল। সময়ের এদিক-ওদিক হলে গোলাপের উড়ে যাবার কথা।

দোষটা নয়নতারার। ট্র্যাফিক আইন না মেনে ও রাস্তার ডানদিকে গাড়ি নিয়ে চলে এসেছিল। গোলাপের রুট ঠিকই ছিল।

বাইক থেকে নেমে অনডিউটির গোলাপসুন্দর কেস লেখার জন্যে রেডি হয়ে এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ধুসর কাচ নামিয়ে মুখবাড়ানো নয়নতারাকে দেখে।

—স্যরি। খুবই করুণ মুখে উচ্চারণ করেছিল নয়নতারা। একে আইন লঙ্ঘন তায় পুলিস অফিসার।

—স্যরি বললেই সব দায় শেষ নাকি? ব্যাপারটা কী হোল বুঝতে পারছেন, এমনিই কিছু বলতে গিয়েছিল গোলাপসুন্দর।

—না, মানে...বললাম তো স্যরি।

শুরুটা এইভাবেই। তবে সব দুর্ঘটনাই দুর্ঘটনা নয়। একটা মধুর ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া গেল।

গোলাপ প্রথমে ভেবেছিল গাড়ি থেকে নেমে অপর পক্ষকে তুলো ধোনা করবে। এবং থানায় নিয়ে যাবে। কিন্তু গোলাপকে থমকাতে হোল একটাই কারণে। অপরাধী একজন মহিলা। এবং অতীব সুন্দরী। এবং চোখে মারাত্মক বাণ।

নয়নকেও পিছিয়ে যেতে হোল। প্রথমত সুপুরুষ যুবকটি তখন ডাকাবুকো হয়ে ধমক ধামকের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তার ওপর অনডিউটিতে এবং উইথ ফুল ইউনিফর্মে। উর্দির একটা ক্ষমতা আছেই। আর পুলিসকে নয়ন যতটা পারে এড়িয়ে চলে। যদিও সে আইনজ্ঞ বাবার একমাত্র মেয়ে।

আগেই বলেছি দুর্ঘটনা টার্ন নিল মধুসংঘাতের দিকে। প্রেম তখন গাঢ়, বেলের আঠার মত চটচটে। চন্দ্রমাধব ব্যানার্জি বারবার বলে চলেছেন, তার মেয়ে হয়ে একজন পেটি সি আই ডি অফিসারের সঙ্গে জোটবদ্ধ হবার কোন মানে হয় না। একজন সি আই ডি অফিসারের কিই বা রোজগার? তায় সে একজন চাকুরে। তদুপরি এদের চাকরি জীবন খুবই রিস্‌কি। জীবনে যে কোন মুহূর্তে বিপদ নেমে আসতে পারে। কিন্তু নয়নতারা নাছোড়বান্দা। যদিও সে গোলাপসুন্দরকে মৃদু আদেশের ভঙ্গিতে অন্য কিছু জীবিকার কথা ভাবতে বলেছিল, কিন্তু গোলাপসুন্দর তাতে সায় দিতে পারেনি। বরং সে জানিয়ে দিয়েছিল, এই প্রফেশান তার ভালো লাগা প্রফেশান। যদি নয়নের আপত্তি থাকে তাহলে সে অন্য কারো গলায় মালা চড়াতে পারে। কারণ তার কাছে নয়নের থেকেও বেশি প্রিয় তার এই বিশেষ চাকরিটি। অপরাধীকে আইনের আলোর নিচে নিয়ে আসতে পারার মধ্যে একধরনের গর্ব সে অনুভব করে। নয়নের বিনিময়েও এটা তার পক্ষে ছাড়া সম্ভব নয়।

অগত্যা নয়নকে সেটা মানতেই হয়েছিল। এবং অবশ্য নয়নেরও ফুলইউনিফর্মে স্মার্ট অ্যান্ড হ্যান্ডসাম, ছ ফুট লম্বা সুঠামদেহী গোলাপকে তার ভালো থেকে আরো ভালো লাগা শুরু করল। সম্ভবত এটা মনসিজের ম্যাজিক। ম্যাজিকই হোক আর যাই হোক, দৈবলিখন পড়ার সাধ্য সাধারণের নেই। এই বিদ্যায় যারা পারদর্শী অথবা গভীর বুৎপত্তি আছে তাদের ভবিষ্যতবাণী করার পেছনে কতটা সত্যাসত্য ফলপ্রাপ্তি ঘটে সেটা কারোরই জানা নেই। হয়তো অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার ফলে কিছু মিলে যায়। অধিকাংশ মেলে না।

চন্দ্রমাধববাবু অনেক জ্যোতিষী দেখিয়েছিলেন। নয়নতারাও। তারা খুব শিগগীরই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও সেটি টানাহেঁচড়ার পর পিঁড়িতে পদার্পণ করতে সময় লেগেছিল পাঁচ বছর। যাট মাস। একটা লিপইয়ার ধরে আঠারশো ছাব্বিশ দিন।

সব ঠিকই ছিল। মাঝে মাঝে, কোন কোন যুবক-যুবতী বিবাহের ক্ষেত্রে গড়িমসি করেই থাকে। তাদের বিবাহবন্ধনের সময় কিছুতেই ঠিক হ'তে চায় না। গোলাপসুন্দর আর নয়নতারার ব্যাপারটা সবাই তাই ভেবে নিয়েছিল।

কিন্তু তার পরের ঘটনাটা যা ঘটল সেটাই বোঝার পক্ষে দুরভিগম্য। বিয়ের আচার কানুন, নিয়ম, নির্ঘণ্ট সবই চিরাচরিত হিন্দুমতেই হয়েছিল। মালাবদল, শুভদৃষ্টি, সাতপাক, কুশণ্ডিকা সব, সবই বাপ পিতামহর নিয়মেই লগ্ন মেপে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এসব ব্যাপারে চন্দ্রমাধবের খুব খুঁতখুঁতুনি।

ফুলশয্যার রাতে গোলাপসুন্দর এবং নয়নতারার কমন 'মাইডিয়ার ফ্রেন্ড' ডাক্তার অম্লান দত্তগুপ্ত দুটি মানালির টিকিট ধরিয়ে দিয়েছিল। সঙ্গে বিখ্যাত হোটেল নটরাজের নাম্বার ওয়ান স্যুইটের বুকিংয়ের দরকারি কাগজপত্র। আর চন্দ্রমাধববাবু দিয়েছিলেন বিশ হাজার টাকার ট্রাভেলার্স চেক। যেহেতু গোলাপসুন্দর বিবাহে কানাকড়ি স্পর্শ করেনি। এ পর্যন্ত সবই ছিল একেবারে রুটিন মাপা পদক্ষেপ। কিন্তু বিধাতার মনে বুঝি ছিল অন্য কোন চতুর অথবা আপাত না বুঝতে পারা প্যাঁচ।

হনিমুনে যাবার কথা ছিল বিয়ের দশদিন পর। তার আগে কিছু পারিবারিক কাজকর্ম, আচার-অনুষ্ঠান তো থাকেই। এই করতে করতেই সাত-আটদিন, এর মধ্যে আছে দ্বিরাগমন। কোথা দিয়ে সব হুশ করে কেটে যায়।

সব কাটিয়ে ওরা দিল্লীগামী রাজধানীতে চড়ে বসেছিল ঠিক দশদিনের দিন। ফেরার কথা পনেরো দিন পর। কারণ অফিস গোলাপসুন্দরকে এর বেশি ছুটি দিতে পারেনি। তবে নয়নতারার পার্মানেন্ট ছুটির ব্যবস্থা ও নিজেই করে নিয়েছিল। বিয়ের এক সপ্তাহ আগে বিয়ের কার্ড এবং রেজিগনেশান লেটার দুটো নিয়েই এম ডির ঘরে হাজির। এম ডি হাস্যমুখেই দুটি চিঠিই গ্রহণ করেছিলেন। কারণ তিনি নাকি জানতেন এমনটিই ঘটবে।

যে নয়নতারা একদিন গোলাপের জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিল সেই নয়ন, হনিমুনে যাবার পর ঠিক দশদিনের মাথায় ফিরে এল কলকাতায়। সবাইকে হতচকিত করে। কারণ সে ফিরেছে একাই। দমদম থেকে সোজা নিজের বাড়ি। গদাধরের হাতে ভি আই পি গছিয়ে দিয়ে সটান নিজের ঘরে। এবং এসেই দরজা বন্ধ।

বাবা, মা, ঠাকুরদা কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন, এমন কি ঝি চাকর বামুনমাসি পর্যন্ত অনেক রকমভাবে ডাকাডাকি করেও দরজা খোলাতে পারেনি। মাত্র একবার ভেতর থেকে তার কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল, —আয়্যাম ওকে বাপি। তোমাদের কিছু চিন্তা করতে হবে না।

ব্যাপারটা যদি এখানেই শেষ হোত তাহলেও নতুন কিছু ভাবার রাস্তা ছিল। কিন্তু দরজা খোলার পরও নয়নতারার মুখ থেকে আর একটা শব্দও বার করানো গেল না।

বাবা-মা দুজনেই তখন প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন। বিশেষ করে ঠাকুরদা হরমোহন। সবাই তখন একটাই প্রশ্নের জবাব খুঁজছেন, ব্যাপারটা কী? এমনটা তো হয় না। তবে কি দাম্পত্য কলহ? নয়নতারার জেদ এবং খ্যাপামির ঘটা সবারই জানা। তারাও ভেবে নিয়েছে গোলাপের সঙ্গে নিশ্চয়ই কোন ব্যাপারে মনোমালিন্য হয়েছে। চন্দ্রমাধববাবু অনেক প্রশ্ন করেছিলেন। উত্তর একটাই, ও কিছু নয়। পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

—কিন্তু ঘটনাটা কী সেটাই বলবি তো। এখনও সব আত্মীয়স্বজনরা ফিরে যায়নি। তাদের কী উত্তর দোব? এমন করিস না মা, চন্দ্রবাবু প্রায় ভেঙে পড়ার জোগাড়।

—তোমায় বললাম তো বাপি, কাঠ কাঠ জবাব নয়নতারার, এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। অভিভাবক হিসেবে এখানে মাথা গলানোটা ঠিক উচিত হবে না। আর যদি জেদাজেদি করো তাহলে এ বাড়ি ছেড়ে আমায় অন্য কোথাও চলে যেতে হবে।

চন্দ্রমাধববাবু মেয়েকে চেনেন। জানেন তার গোঁয়ারগোবিন্দ মার্কা কথা। কোন জিনিসে না তো না। আবার হ্যাঁ বললে সেটা না করানো যাবে না।

হাল ছেড়ে দেন চন্দ্রমাধব। আর বৈশালী দেবী বলে গেলেন,—তোর কপালে অশেষ দুর্গতি নয়ন। মেয়েদের এতো জেদ ভালো নয়।

নয়ন একবার আড়চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে 'মা একটু নিউ মার্কেট যাচ্ছি', বলে সাইড ব্যাগ দুলিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

'তোমার আস্কারাতেই মেয়ের এতো বাড়'। বলে বৈশালী দেবী পা ধুপধুপিয়ে সম্ভবত ঠাকুরঘরের দিকেই চলে গেলেন।

একা চন্দ্রমাধব কাউকে পাশে না পেয়ে জামাই গোলাপসুন্দরকে সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিলেন। তিনি যে খুব টেনশনে আছেন সেটা তার চলনে বলনে প্রকাশ পাচ্ছিল।

কিন্তু হা হতোস্মি! গোলাপসুন্দরের ছুটি পনেরো দিনের। এতো তাড়াতাড়ি সে ফিরবেই বা কেন? চন্দ্রমাধব চেষ্টা করলেন ডাক্তার অম্লান দত্তগুপ্তের সঙ্গে যোগাযোগ করার। কিন্তু সেও গোলাপের কোন সংবাদ দিতে পারল না।

নয়নতারা যে তাকে এভাবে একা ফেলে রেখে চলে যেতে পারে এটা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি গোলাপসুন্দর। বিয়ের আগে তার মনে আর সব যুবকদের মতো ভাবী স্ত্রীকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছিল। সেটাই স্বাভাবিক। ছেলে হিসেবে সে বেশ স্মার্ট। অনেক মেয়েরই সে কাম্য। কিন্তু নয়নতারার প্রবল আকর্ষণ সে এড়িয়ে যেতে পারেনি। যেটা অন্য অন্য মেয়ের ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছিল। বিয়ের আগে নয়নতারা অনেকবারই তার ব্যাচেলার্স ডেন-এ যাতায়াত করেছে। মাত্র একদিন একটি চুমু খাওয়া ছাড়া কোনদিন কোনরকম হ্যাংলামি করেনি। নয়নতারা সম্ভবত এতে মানুষটার ওপর বেশ প্লিজ্‌ড্‌ হয়েছিল। তার বিশ্বাসটাও অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল।

এই বিশ্বাস অর্জনটা কিন্তু গোলাপসুন্দরের আয়াসসাধ্য প্রচেষ্টা নয়। নয়নতারাকে সে প্রথমে আমল না দিলেও পরে সে কিন্তু নয়নতারাতে সম্পূর্ণ মজে গিয়েছিল। যথার্থ অর্থে সে ভালোবেসে ফেলেছিল। এবং সেই কারণেই, একদিন যে তার স্ত্রী হবে তাকে আগে থেকে পেয়ে যাবার কোন অর্থই পায়নি। তাহলে পাওয়ার সব আনন্দ আর সুখটাই মাটি।

তার সব কিছু আশা, আকাঙ্ক্ষা, দেওয়া নেওয়া, সব জমিয়ে রেখেছিল ফুলশয্যার রাতটার জন্যে। কিন্তু দরজা বন্ধ করার মুহূর্তেই নয়নতারা একটি দুঃসংবাদ শুনিয়ে দিয়েছিল। অন্তত পাঁচদিন একই শয্যায় তাদের ভাইবোনের মতো থাকতে হবে।

প্রথমটা গোলাপ চমকে উঠেছিল। নয়নের এ কী অদ্ভুত আব্দার। এটা আবার হয় নাকি? মর্মাহত গোলাপ আসন্ন ফাঁসির আদেশ শুনে ভেতরে ভেতরে ঘামতে শুরু করেছিল।

—আমি বুঝি ডিয়ার। অন্তত জীবনের প্রথম রাতে একী অন্যায় আবদার, তাই তো?

নয়নও বেশ কুণ্ঠা নিয়ে কথাগুলো বলেছিল।

—হ্যাঁ, তাই। কিন্তু ব্যাপারটা কী হোল? তাও একদিন নয় পাঁচদিন।

—আরো বেশি হতে পারে। মানে আরো দু-একদিন। আসলে, আমার সিস্টেমটা খুব ইরেগুলার অ্যান্ড টাইমও কোন নির্দিষ্ট সংকেতে চলে না।

নয়নের মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ করুণমুখে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে গোলাপ একটা সিগারেট ধরিয়ে বলেছিল, তাহলে আর কীই বা করা! তুমি শুয়ে পড়। আমি বারান্দায় মাদুর পেতে নিই।

বলেই ও বারান্দায় চলে যাচ্ছিল।

—কেন, ওটাই কি সব? আমরা গল্প করে সারারাত পার করে দিতে পারি না?

—পারি। না পারারও কিছু নেই। কিন্তু কোন কোন রাত শুধু গল্পের অছিলায় কেটে যেতে পছন্দ করে না। তার আরো কিছু প্রাপ্তির বাসনা থাকে। জানো তো, রাতের একটা নিজস্ব মোহ আছে। সে কেবলি জড়াতে চায়। কখনো স্নেহে, কখনো মমতায় আবার কখনও কামনায় বাসনায়। আজকের রাতটা তেমনি রাত।

—স্যরি গোলাপ, আয়াম সো স্যরি, আসলে এটার ওপর আমার কোন হাত নেই। এটা এনটায়ারলি ফিমেল'স নেচার।

—ইয়েস ম্যাম্ আই নো ইট। ইট্স্ অলরাইট। নাউ ইউ রিল্যাক্স।

এরপর আর তাদের মিলনের কোন সুযোগ হয়নি। ফিমেল'স নেচার এর জের কাটতে না কাটতেই এদিক ওদিক যাতায়াত। দ্বিরাগমন। এই সব করেই এসে গিয়েছিল রাজধানী চড়ার দিন।

মানালির নটরাজে কোমল বিছানা। ফায়ার প্লেস। শীতোষ্ণ স্যুইট। চারদিক কাচ মোড়া। মেঝেয় পুরু কার্পেট।

সারাদিন এদিক-ওদিক কাটিয়ে টুকিটাকি দু-একটা গরমের জামা বা সোয়েটার কিনে কপোত-কপোতির মতো চারদিকে ঘুরে বেড়ালো। সেদিন ওরা ঠিকই করেছিল হোটেলে খাবে না। বাইরে কোথাও খেয়ে নেবে। হোটেল মাস্টাস্ এর সামনে দাঁড়িয়ে আদুরে গলায় গোলাপের নিকট ঘনিষ্ঠতায় দাঁড়িয়ে বলেছিল,—গোলাপ, চলো আজ সন্ধেটা আমরা গুঁফো রেস্তোরাঁয় ঢুকি।

—গুঁফো রেস্তোরাঁ মানে?

—আহা, দোকানের নামটা দেখ? হোটেল মাসটাস। আমার মনে হয় হেড কুকের নিশ্চয় বড়ো মাপের গোঁফ আছে।

—দোকানের মালিকেরও থাকতে পারে।

—চলো তো দেখি গিয়ে ঠিক কার গোঁফের বড়াইতে এতো গুঁফো হোটেলের কেতা?

নাহ্, তেমন কারোরই কেতাদার গোঁফ ওরা দেখতে পেলো না। তবে হ্যাঁ, রান্নার কায়দা এবং সুগন্ধ মাত্ করে দিচ্ছিল চারদিক। নবদম্পতি তো আহ্লাদে আটখানা। তারা ভাবতেও পারেনি এতো ভালো রেসিপির সন্ধান তাদের হাতের কাছেই ছিল।

মানালিতে এখন বেশ ঠাণ্ডা। সন্ধের দিকে সেটা বাড়ে বেশি। অবশ্য, শোনা যাচ্ছে, মানে নটরাজের রিসেপশানে বসে সেই লেডি, সম্ভবত জাপানি লেডি, তার মতে দু একদিনের মধ্যে রোটাং দেখে নেওয়া উচিত। খুব শিগগীরই বরফ পড়তে শুরু করবে। তখন পাহাড়ে চড়াই সার হবে। রোটাং পর্যন্ত বাস যাবে না।

হোটেলে ফিরে ওরা গরম জল আনিয়ে নিল। হুইস্কি সঙ্গেই ছিল। দুজনে দুটো বড় ঢেলে

মুখোমুখে বসে পড়লো। পেট ভরাই ছিল। কেবল সিপ্ করার আগে গোলাপ বলল, দেখো বাপু শরীর বুঝে খেও। এমন খেও না যাতে করে—

নয়ন তখন চিয়ার্স বলে সিপ করতে করতে বলছে, —এমন খেও না মানে? কী হবে একটু বেশি খেলে? বাইরে ঠাণ্ডাটা দেখেছ?

—দেখিনি। তবে টের পেয়েছি।

—তবে? এই রকম চিল ঠাণ্ডায়, দু এক পেগে কিছু যাবে আসবে না।

—কথাটা মনে থাকে যেন। ঠিক সময়ে যদি কিছু যায় আসে তাহলে,

—নো বাবা নো, আর মনে করাতে হবে না। তবে বিছানাগুলো দেখেছ? যেন কেউ জল ঢেলে দিয়েছে। এই ভিজে বিছানায় প্রেমও নেতিয়ে যাবে।

—যাবে না। প্রেম থাকে হৃদয়ে। প্রেম থাকে কামনায়। এ কামনার রঙ লাল। এ কামনার টেমপারেচর একশো কুড়ি ডিগ্রি ফারেনহাইট। তোমার বিছানার উষ্ণতা ফিরিয়ে আনতে বেশিক্ষণ লাগবে না।

আরো দু চুমুকে গ্লাস খালি করে নয়নতারা বলে,—বাব্বা, তুমি আবার কবে থেকে কাব্য করা শিখলে? তুমি তো নীরস পুলিস অফিসার। তাও সি আই ডি ব্রাঞ্চে। জীবনে তো কখনও কবিতা পড়তে দেখিনি।

—ছোটবেলায় আমি একজন কসাইকে দেখেছিলাম। আমাদের পাড়াতেই তার মাংসের দোকান ছিল। লোকটার নাম ছিল সঈফ খান। তো সে লোকটা সকাল থেকে নিজের হাতে পাঁঠা জবাই করে সারাদিন ধরে বিক্রি করতো।

—কসাইরা তো তাই করে। এ আবার নতুন কথা কী?

—আছে। সামান্য হলেও নতুনত্ব আছে। লোকটা সন্ধের পর আর মাংস বিক্রি করতো না। দোকান বন্ধ করে চলে যেতো নিজের এক চিলতে ঘরে। আমায় একদিন নিয়ে গিয়েছিল তার ডেরায়। ঘরে ঢুকে আমি অবাক। চারদিক শুধু ছবি আর ছবি।

—ছবি? মানে?

—তার নিজের আঁকা ছবি। পেন্টিংস।

—য্যাঃ, গুলবাজ কোথাকার।

—য্যাঃ নয়। হ্যাঃ। লোকটা তখন পিওর আর্টিস্ট। অ্যান্ড ফর ইউর ইনফরমেশান পরেরটা শোনাচ্ছি। বেশ কিছু সমঝদার লোকের তাগিদে সঈফ খান একদিন তার ছবির এগজিবিশান করে। অ্যাকাডেমিতে।

—বলো কী?

—এর পরেরটাও শোন। সঈফ সেই এগজিবিশান থেকে তার ছবি বিক্রি বাবদ পেয়েছিল, তখনকার দিনে, পঁচিশ হাজার টাকা। সেটা সঈফের কল্পনার বাইরে। আর ঐ টাকাটাই ওর মগজ ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

—মাত্র পঁচিশ হাজার টাকায়, কী হবে? ও তো মাংস বিক্রি করে।

—না, নয়ন। এ এক অন্য ধরনের মগজ তোলপাড়ের ঘটনা। তার আঁকা পেন্টিংস যে বিক্রি হতে পারে সেটাই ছিল সঈফের স্বপ্নের বাইরে। মাংস কাটা সঈফ ছেড়ে দিল। তখন থেকে সে পুরোপুরি আর্টিস্ট।

নয়নতারা সবটা শুনল। সম্ভবত তার মস্তিষ্কে তখন হুইস্কি খেলা শুরু করে দিয়েছে। গ্লাস

সিপ্ করতে করতে নয়ন বলল, ঠাট্টা করেই—, মাংসঅলা, ভ্যানগগ্ হয়ে গেলো? ধ্যাৎ, যত্তসব আজগুবি গপ্পো। ক পেগ হোল গো তোমার?

—বেশি নয়, মাত্র দুই।

—নাহ্! দুই নয়। তুমি এতোক্ষণে মাত্র দুই। একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বললেও নো বিশ্বাস বাবা।

—এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে কেউ মিথ্যে কথা বলে না বলছ? বেশি করে বলে। গঙ্গার অ্যালিবি সামনে রেখে গুলটা বেশি চালায়।

দু পাশে মাথা দোলাতে দোলাতে নয়ন বলল,—বলে, আলবাত বলে। আমাদের পুরুতমশাই বলে। মহালয়ার দিন পিতৃপুরুষের তর্পণের দিনে বাবার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিল। উল্টোপাল্টা মন্ত্র বলছিল। মানে জানে না কিছুই, মিথ্যে আগড়ুম বাগড়ুম বলে। পয়সা কামানোর ধান্দা। তারপর বাবার হাতে ধরা পড়ে, আমরা বাঁড়ুজ্যে বামুন তো—,

কতোক্ষণ এভাবে লাইন টু বেলাইনে কথাবার্তা চলতো কে জানে। হঠাৎ, নয়নই শেষ হয়ে যাওয়া গ্লাসটা মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল গোলাপের ওপর।

—গোলাপ, গোলাপ, মাই সুইট গোলাপ, আই লাভ ইউ। প্লিজ, হ্যাভ আ সুইট কিস্। আয়াম সো হাঙরি।

তারপর?

কখন কোথা দিয়ে রাত শেষ হয়ে গেছে গোলাপের এখন কিছুই মনে পড়ছে না। ঘুম ভাঙলো তেজবাহাদুরের ডাকে।

—বাবুজি, আভি তো ন বাজ চুকা। ম্যায় দু দফে আপকো চায় দে গিয়া। লেকিন...উঠিয়ে সাব। তিসরি চায়ে ভি ঠাণ্ডি হো যায়গি।

জোড়া কম্বলের নিচ থেকে নাকটাকে কুকুরের মতো আগে বার করে কিছু শুঁকল। তারপর ধীরে ধীরে মুখটা বাব করে তেজবাহাদুরের দিকে তাকিয়ে বলল,—ইত্না চিল্লাতা কিঁউ। হুয়া কেয়া?

—কুছ নেহি বাবুজি। লেকিন, চায়ে। ঠাণ্ডা হো রহি হ্যায়।

—মেমসাহেব কোথায় রে?

—মেমসাহেব একেলা ধুপ মে বৈঠা হ্যায়।

—ঠিক আছে ডেকে দে।

তেজবাহাদুর বেবিয়ে যাবার মিনিট তিনেকের মধ্যে নয়ন ফিরে এলো। একবার আড়চোখে গোলাপের দিকে তাকালো।

গোলাপ বিছানায় শুয়ে শুয়েই সিগারেট ধরিয়েছিল। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল,—আমাকে অত দেখার কী আছে? এই প্রথম দেখছ নাকি?

কিছু না বলে নয়ন দু কাপ চা তৈরি করে এককাপ ওর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গোলাপের গালের দিকে তাকিয়ে রইল।

—কি দেখছ ডার্লিং? এনিথিং নিউ অন মাই চিক?

নয়ন কোন উত্তর না দিয়ে চা খেয়ে চলে।

—ডার্লিং, তোমায় এতো বিমর্ষ লাগছে কেন? থিঙ্কিং সামথিং অড্?

—নাহ্, ও কিছু নয়। তুমি কি এখন উঠবে?

—ওহ্ সিওর। অ্যাটলিস্ট চা টা খেতে দাও।

—কটা বাজে জানো। নটা দশ। দশটার বাস যদি আমরা ধরতে না পারি, তাহলে রোটাং যাওয়ার কোন মানেই হয় না। পৌঁছনো যাবে না। গেলেও ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে।

একচুমুকে চা শেষ করে উঠতে উঠতে গোলাপ বলে,—হোক না দেরি। এখানে তো কাউকে কৈফিয়ত দিতে হবে না।

গায়ে কম্বলটা জড়িয়ে বিছানা থেকে নামতে গিয়েই পায়ে পা জড়িয়ে সে বসে পড়ল। তারপর অবস্থা বুঝে সে বলল, তুমিও সেই রকম।

—কী রকম?

—পাজামার দড়িটা গেল কোথায়?

—পাজামার দড়ি লাগানো ছিল?

—ওহ্ সিওর, নইলে পরলাম কী করে?

—তাহলে কাল রাতে হুটোপাটিতে খুলে গেছে।

—যেতেই পারে। কিন্তু দড়িটা পাজামা থেকে একেবারে ডিটাচ্‌ড্? এ তোমারই কাজ মজা করার জন্যে কখন খুলে নিয়েছ।

নয়নতারা কিছু না বলে সামান্য সময়ের জন্যে আনমনা হয়ে রইল। পাজামার খুঁটটা কোনরকমে চেপে নিয়ে গোলাপ চলে গেল বাথরুমে।

ভালবাসার মানুষের সঙ্গে নয়নতারার এই প্রথম দেশভ্রমণ। এর আগে সে বাবা-মায়ের সঙ্গে অনেক জায়গায় গেছে। অনেক ঘুরেওছে। তবে এ ঘোরার মানেটাই আলাদা। হনিমুনের অর্থই অন্য কিছু। যার সঙ্গে সারাজীবন কাটাতে হবে তার সমস্ত বিশ্বাস, ভালবাসা, নির্ভরতাগুলোকে যাচাই করে নেবার সুযোগ এসে যায় দুটি নরনারীর মধ্যে। সেই একই সঙ্গে থাকে দেহ মিলনের অনাস্বাদিত রোমাঞ্চ।

গোলাপের খুবই ভাললাগছিল নয়নতারার সঙ্গ। নয়নতারার প্রেম, সোহাগ, আশ্লেষ। এখানকার বেশিরভাগ হোটেলেই গিজার থাকে। গোলাপ একেবারে স্নান সেরে বেরিয়ে এলো। নয়ন তখন আয়নার সামনে মেকআপ নিতে ব্যস্ত। আর আধঘণ্টা পরেই বাস ছাড়বে।

বাথরুমে যাবার সময় গোলাপ একটা কম্বল নিয়ে ঢুকে গিয়েছিল। সেই কম্বল জড়িয়েই বেরিয়ে এসে একেবারে নয়নের পিছনে এসে দাঁড়াল।

—দারুণ লাগছে কিন্তু নয়ন।

—হুঁ।

—সেকি! সামান্য 'হুঁ' দিয়েই সব অভিব্যক্তি শেষ? অ্যাটলিস্ট কমপ্লিমেন্টস-এর জন্যে একটা ছোট্ট পাপ্পি।

—এখন অসভ্যতা করার সময় নয়। গাড়ির লোক এসে তাগাদা দিয়ে গেছে। তুমি তাড়াতাড়ি ড্রেস করে নাও। আমি খাবারের প্যাকেট আর জলের বট্‌ল্ নিয়ে গাড়িতে বসছি।

ড্রেস করতে করতে গোলাপ বলল,—আর ফ্লাস্ক?

—ওটা তোমার ব্যাপার। তুমিই নিয়ে নিও।

—ওখানে কিন্তু প্রচুর ঠাণ্ডা।

—আঁচ করতে পারি। দেরি কোর না। আমি বাসে গিয়ে বসছি।

মানালি থেকে রোটাং। ওরা বসেছিল বাসের একেবারে সামনের দিকে। ড্রাইভারের

পাশের দুটো সিটে। ফলে সামনের পুরো দৃশ্যটাই যেন বিশাল প্যানোরামিক স্ক্রিনে ভেসে উঠছে। পাহাড়ের প্রতি বাঁকে নতুন নতুন দৃশ্য। প্রতি বাঁকেই প্রকৃতি যেন সৌন্দর্যের পসরা সাজিয়ে রেখেছে।

ভোরের বিমর্ষতা কেটে যাচ্ছিল নয়নের মন থেকে। ধীরে ধীরে তার স্বাভাবিক চাঞ্চল্য, স্বাভাবিক উচ্ছলতাগুলো গোলাপকে মাতিয়ে দিচ্ছিল। বাসের মধ্যে গোলাপ মাঝে মধ্যেই একটু অসভ্য হবার চেষ্টা করছিল। নয়ন কপট বাধায় তাকে নিবৃত্ত করলেও একেবারে বাধা দেবার মতো কোন গরজ দেখাচ্ছিল না। এই বাসের অধিকাংশ প্যাসেঞ্জারই সম্ভবত নব দম্পতি। হাই ব্যাকসিটের সুযোগে সকলেই প্রায় এক দেহ এক আত্মা। আসলে প্রকৃতি যেখানে উদার, উন্মুক্ত, আবিলতার বালাই নেই, সেখানে তুচ্ছ লোকলজ্জাগুলো আপনা থেকেই সরে যায়। নির্জন প্রকৃতি লাজলজ্জা ঘুচিয়ে মানুষকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় আদিমতায়। আসলে প্রকৃতি মানুষের লজ্জা দেখার সময়ই পায় না।

রোটাং এর শেষটায় ওদের যাওয়া হোল না। বরফে রাস্তা ব্লক্ড্। ড্রাইভার যখন জানালো বাস আর এগুবে না, তেমন করে কারো কিন্তু আফসোসের কিছু ছিল না। আসলে তারা এসেছে শহর কোলাহল ছাড়িয়ে সারা জীবনের সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে নিবিড় করে কাছে পেতে। প্রথম আবিষ্কারের স্বাদ চেটেপুটে গ্রহণ করতে চায়। তা সে বাসেই হোক আর বরফ ঢাকা পাহাড়ই হোক, অথবা হোটেলের শীতোষ্ণ বিছানাই হোক। এ পাহাড় সে পাহাড় ডিঙিয়ে বাস যখন নটরাজের সামনে এসে দাঁড়ালো তখন সন্ধে পেরিয়ে গেছে। ঘড়ির কাঁটা আটের ঘরে।

গোলাপ কিন্তু অনেকক্ষণ থেকেই নয়নকে লক্ষ করছিল। পাহাড় যত সংক্ষিপ্ত হচ্ছিল, হোটেলের দরজাটা যতই কাছে এগিয়ে আসছিল নয়নের সারাদিনের হাস্যোজ্জ্বল মুখটায় যেন ক্রমাগত ছায়া নামতে শুরু করেছিল।

—কী হয়েছে নয়ন? তুমি যেন বিশেষ কিছু ভাবছ?

অন্যমনস্কতাকে পাশ কাটিয়ে নয়ন বলল,—কই না তো!

—না, বললে তো হবে না! কিছু না হলেও পাঁচ বছর তোমার ঐ মুখটা দেখছি। রেগুলার। রেখাগুলোও পড়তে পারি। বল কী হয়েছে? তুমি কিন্তু কোনদিনও মলিন হয়ে থাকতে ভালবাস না।

—বললাম তো কিছু না। আসলে এই মুহূর্তে বাড়ির কথা মনে পড়ছিল।

—মা-বাবার কথা?

—হ্যাঁ, ওনারা ছাড়া আমার নিজের আর কে আছে?

—সেকী! একথা তুমি এখন বলতে পারছ?

নয়ন চট্ করে কোন উত্তর না দিয়ে ছোট্ট একটা হাইতুলে বলল,—বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

—এটা আমার প্রশ্নের জবাব নয় কিন্তু।

—তুমি যেন কী জিজ্ঞাসা করলে? ও হ্যাঁ, কথাটা কিন্তু ঠিকই। বিয়ের আগে যতই আমরা মেলামেশা করে থাকি না কেন, আমাদের বিয়ে হয়েছে মাত্র কদিন। দুজন দুজনকে একান্ত করে কাছে পেয়েছি, সত্যি কথা বলতে কি, মাত্র গতরাত্রে।

—তো?

—এর মধ্যে তোমায় কতটুকু চিনতে পারব বল? সেই তুলনায় নিজের বাবা-মা। তাঁরা অনেক বেশি পরিচিত আমার কাছে। তাঁদের সঙ্গে আমার জিনের বন্ধন। সো—

—বুঝলাম। তা খুকুমণির কি এখন বাবা মার কাছে যেতে ইচ্ছে করছে? তাহলে নয় কাল সকালেই ব্যবস্থা করি। চেষ্টা করলে কিছু একটা বন্দোবস্ত হয়ে যাবেই।

নয়নতারা একবার পূর্ণদৃষ্টিতে গোলাপের দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে জবাব দিল,—সে রকম কোন ইচ্ছে থাকলে আমি নিজেই ব্যবস্থা করে নিতে পারব।

—সে রকম কোন ইচ্ছে আছে নাকি ম্যাডামের?

—ঠিক এই মুহূর্তে বলতে পারছি না।

—আপত্তি না থাকলে বলে ফেল।

—আমাকে কটা দিন ভাবতে হবে।

—হোয়াট? ডু ইউ মিন, ইউ আর ভেরি মাচ সিরিয়াস?

নয়ন বোধহয় আবার অন্যমনস্ক হয়েছিল। বেশ কাটিয়ে বলল,—তুমি যেন কী বললে?

—তোমার কথাগুলো খুব সিরিয়াস শোনাচ্ছে। সকালে বেরুবার আগেও দেখলাম মুখ ভার। এখন আবার দেখছি মুড অফ্। প্লিজ নয়ন, এরকম রহস্যময়তা আমার ভালো লাগে না। এই প্রকৃতির মতো স্বচ্ছ আর অনাবিল হয়ে ওঠো। পরিষ্কার করে বল, কী হয়েছে তোমার? তাছাড়া আমরা এসেছি হনিমুনে।

হঠাৎই নয়ন চুপ করে গেল। একসময় গাড়ি এসে থামল হোটেলের দরজায়। নামার সময়ে নয়ন বলল,—ভেবে দেখি কথাগুলো তোমায় বলা যাবে কি না।

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর ওরা যথারীতি নিজেদের কামরায় ফিরে এলো। নিজেদেরকে ডুবিয়ে দিল একজোড়া মোটা কম্বলের নিচে।

তারপরই তেজবাহাদুরের ডাকে ঘুম ভাঙা। কোথায় নয়নের মিষ্টি গলার আওয়াজ! তা নয় তেজবাহাদুরের দিশি বোতলটানা খ্যানখেনে গলা।

—বাবুজি, আপকো চায়ে।

একটু রাগত স্বরে কম্বল থেকে মাথা বার করে গোলাপ ধমকালো তেজবাহাদুরকে,—তোমারা কুছ আক্কেল উক্কেল নেহি হ্যায়। ফিন সুবে সুবে আয়া মেরা নিদ্ হারাম করনেকে লিয়ে? মেমসাব কিধার?

মুখটা একটু কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে ছিল তেজবাহাদুর।

—কেয়া হুয়া? মালুম নেহি মেমসাব কিধার গিয়া? বোলাও উনহিকো।

একটু ইতস্তত করে পশমি টুপির নিচ থেকে একটা পাটকরা কাগজ বার করে গোলাপের হাতে ধরিয়ে দিল।

—কেয়া হ্যায় ইস্‌মে?

—আজ সুবেই, মেমসাব ইয়ে খত্ লিখ্‌কর চলি গয়ি।

তড়াক করে বিছানায় উঠে বসল গোলাপ। নিমেষের মধ্যে চিঠিটা গলাধঃকরণ করে কেমন যেন বোকা বোকা মুখে বসে রইল।

—কেয়া হুয়া সাব? কোই বুরা খবর?

তেজবাহাদুরের কথার কোন উত্তর না দিয়ে ও আবার কাগজটা খুলে চোখের সামনে তুলে ধরল। একটা ছোট্ট চিঠি। নয়নতারার। তাকে লিখেছে। একটা ভয়ংকর কথা।

গোলাপ,

বড় আশা নিয়ে বাবা মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও তোমাকে বিয়ে করেছিলাম। সেই আমি

তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। মাত্র পনেরো দিনের বিয়ে। যা কৈফিয়ত দেবার আমিই দোব। তুমি কিন্তু আর আমার সঙ্গে দেখা কোর না। এ আমাদের মঙ্গলের জন্যেই।

নয়নতারা ব্যানার্জি।

দ্বিতীয়বার পড়া শেষ করার পর ও শেষ বাক্যটা ভালো করে পড়ল। এ আমাদের মঙ্গলের জন্যেই। আরো লক্ষ করার বিষয়, নয়নতারা নামের শেষে বসু লেখেনি। লিখেছে ব্যানার্জি।

কিন্তু কেন? কেন এই বিয়ের প্রহসন? কী এমন ঘটল যে মাত্র দু রাত্রের একত্র বাসের পর তাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে? শুধু তাই নয়, পিতৃদত্ত টাইটেলকে অবলম্বন করে। অর্থাৎ বিয়েটাকেই সে অস্বীকার করতে চাইছে।

বিয়ের আগে কখনও সখনও দুজনের মধ্যে মনোমালিন্য হয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক। আবার মেঘ সরে গিয়ে সূর্য উঠেছে। কিন্তু এ তো অভাবনীয়। নয়ন বরাবরই মুডি। খামখেয়ালি। এক ভাবনা থেকে আরেক ভাবনায় চলে যায় অবলীলাক্রমে, তাই বলে—?

বিয়ে আগে এক বন্ধুস্থানীয় জ্যোতিষী তার ছক দেখে বলেছিল,—এ মেয়ে তোর বরাতে টিকবে না। বিয়ে করিস না। সেভেন্থ প্লেস খুব ড্যামেজ্‌ড। তার ওপর মঙ্গল...

গোলাপ প্রশ্ন করেছিল, দ্যুর, বাজে ভ্যানভ্যান করিস না। নয়ন তো খুব ভালো মেয়ে। উত্তরে বন্ধু বলেছিল। কে ভাল কে মন্দ সেটা এখনি বলা সম্ভব নয়। তবে বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই তোদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। লিখে রাখতে পারিস।

গোলাপের তখন জ্যোতিষের মুখটা থেঁতো করে দিতে ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু? এখন? ভবিষ্যতবাণীটা পদে পদে মিলে গেল। গোলাপ ভেবেই পেল না এর বৈজ্ঞানিক কোন যুক্তি। সে সব দিকেই একজন এব্‌ল্ পার্সন। রূপে, গুণে, অর্থে, পৌরুষে। এমন কি বিছানায়। যে কোন নারী তার কাছ থেকে পরিপূর্ণ সম্ভোগ আনন্দ উপভোগ করতে পারবে। তাহলে—?

—সাহাব।

মুখ তুলে গোলাপ দেখল তেজবাহাদুর এখনও দাঁড়িয়ে আছে। তিক্ত স্বরে ও বলল—কেয়া মাংতা?

—কা মেমসাব সাচমুচ, চলি গয়ি?

লোকটার মুখে সরল জিজ্ঞাসা। ভাঙা ভাঙা করে স্বরে গোলাপ জিজ্ঞেস করল,—তোমকো কুছ বোলকর নেহি গিয়া?

—হামকো কেয়া বাতায়গা? স্রেফ পুছা দিল্লি যানেসে কিত্‌না টেম্ লাগেগা!

—হুঁ। তো গিয়া ক্যয়সে? বাসমে?

—জি হাঁ। মালুম হোতা কি মেমসাব সিধা কালকা চলা যায়েঙ্গে। তো সাব, আপভি তো যায়েঙ্গে?

হঠাৎ কেমন একটা অভিমান জেদ আর অপমানবোধ ওকে প্রচণ্ড জেদী করে তুললো। তেজবাহাদুরের দিকে বলল,—ইয়ে চায় ঠাণ্ডা হো গয়ি। তোম কফি লাও। সাথ ব্রেকফাস্ট ভি।

—বিল ভি বানাকে লাউঙ্গা?

—নেহি। হাম কিধার যানেবালে নেহি হ্যায়। দুপুরকা খানা হাম হিঁয়াই খায়েগা। রাইস আওর চিকেন। ঠিক হ্যায় না?

ঠিক কি বেঠিক সেটা তেজবাহাদুরের প্রায় অভিব্যক্তিহীন মুখে খুঁজে পাওয়া গেল না। আসলে এই সব সাহেব মেমদের কাজিয়া এবং তার পরিণতির অর্থ সে ঠিক বুঝতে পারে না। নীরবে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া ট্রে আর পট নিয়ে বেরিয়ে যায়।

সেল ফোনটা বালিশের পাশে রেখেই শোয় গোলাপসুন্দর। ফোনের বাজনাটার এমনই মিঠে কড়া সুর যে ওর ঘুম ভাঙবেই ঐ শব্দে। খুবই পরিচিত শব্দ। দু-তিনবার শব্দ করতেই অভ্যাসবশত সেলটা তুলে ঘুম জড়ানো চোখে ভিউ স্ক্রিনে দেখে নিল কার ফোন। থানার নাম্বার। অতএব সিরিয়াস কিছু।

—হ্যালো, হ্যাঁ কে বলছ?

ওখান থকে হেড কনস্টেবল রামানন্দ দাসের গলা শোনা গেল—সাব, সোনাগাছি রেড জোন এরিয়াসে আভি আভি খবর মিলি হ্যায় কি এক লেড়কিকা মউত হো গিয়া।

—কি মুশকিল, বেশ বিরক্তিব অভিব্যক্তি ফুটে উঠল গোলাপসুন্দরের কপালে। প্রায় ধমকের সুরে ও বলল,—শুধু সোনাগাছি কেন, যে কোন রেড জোন এরিয়ায় প্রতিমাসে কিছু না কিছু অপঘাত হচ্ছে। তা এর জন্যে আমার কাঁচা ঘুমটা ভাঙাবার কি হোল? তুমি জানো কাল কত রাত্রে আমি বাড়ি ফিরেছি?

—নেহি জি।

—ঠিক আছে জানার দরকার নেই। ইন্সপেক্টর সুবীব গুপ্তকে নিয়ে তোমরা চলে যাও। দেখ কোন মাতালবাবু এসে মেরে টেরে চলে গেছে কি না। কিংবা কোন দালালের হিস্যা নিয়ে গণ্ডগোলের জের হতে পারে।

রামানন্দ লোকটা বাঙালি হলেও হিন্দি বলে। ভুল হলেও বলে। ওর ধারণা হিন্দি বলতে পারলেই প্রমোশান। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও রামানন্দ বলল—আপ যব্ হুকুম দে দিয়া হামে তো সহি ফলো করনে পড়েগা, লেকিন...সাব্।

গোলাপের ঠোঁটের কোণে এতোক্ষণে ঈষৎ হাসির ঝিলিক। অর্থাৎ সে না গেলে ইনভেস্টিগেশান ঠিক মতো হবে না। অন্তত রামানুজের ধারণা তাই। অবশ্য, তার ওপর ভরসা অনেকেরই।

—কেয়া হুয়া রামানন্দ? হাম নেহি যানেসে সব কিছু আধুরি রহে যায়গা?

—আপ যো ভি কহে, ই সোব বুরা কেসমে, সাহাবকো যানা বহুৎ জরুরী হ্যায়। কিউ কি আভি উয়ো ইলাকা কা চক্কর বহুৎ খারাপ হো গিয়া। দো দিনকা লেড়কা, পয়েদা হোনে দেখা, আভি সব দাদা বন গিয়া। পাড়াকা মাস্তান হো গিয়া। সব শালে শের বন গিয়া। আউর পাওলিককা টেন্ডেন্সি হো গিয়া কি যিধারভি যো মিসহ্যাপ হো যাতা সবকো লিয়ে পুলিস কোই গিল্‌টি বানা দেতা। ই বাত তো আপ জানতেই হ্যায়।

রামানন্দ লোকটা বকে বেশি। ওকে থামিয়ে গোলাপ বলল,—ঠিক আছে রামানন্দ, তুমি সুবীর আর আমাদের ফোটোগ্রাফার বীরেশ হালদারকে নিয়ে বেরিয়ে পড়। আমি আসছি। ও হ্যাঁ, ঠিকানাটা বল। কার বাড়ি কিছু জান?

—জী হাঁ। আপ নোট কিজিয়ে।

বেডসাইড টেবিলে নোটলেখার প্যাড আর ডট পেনটা বরাবরই রাখা থাকে। রামানন্দের দেওয়া ঠিকানাটা লিখে নিয়ে ও ফোন ছেড়ে দিল।

নয়নতারা চলে যাবার পর থেকে ওর ক্রমশ সিস্টেমেটিক হয়ে আসা লাইফটা আবার কখন যেন এলোমেলো হয়ে গেছে। একটা কাজের মেয়ে ছিল। বছর আঠারো-উনিশের মতো। নয়নতারা চলে যাবার পর মেয়েটাকে আর রাখা যায়নি। এখন অনেক খুঁজে পেতে একটা হিন্দুস্থানী ছোকরাকে পেয়েছে। নাম তামান্না। ছেলেটা ভালো। কিন্তু দোষ একটাই, জাগলে ঘুমবে না আর ঘুমলে জাগায় কার সাধ্য। বয়স বেশি না। বছর চোদ্দ-পনেরো।

গোলাপসুন্দর একবার দেওয়াল ঘড়িটা দেখে নিল। ইস্ অনেক দেরি হয়ে গেছে। সাড়ে আটটা! এতোক্ষণ তো তার ঘুমোবার কথা নয়। একবার মাথা চুলকোল সে। কাল কি অনেক রাতে শুয়েছে? ভাববার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই মনে এলো না। অগত্যা ও চেষ্টা বাদ দিয়ে তামান্নাকে ডাকল। নিশ্চয়ই উঠেছে। এতোক্ষণ তার শুয়ে থাকার কথা নয়।

চোদ্দ-পনেরোর কালোকুলো হৃষ্টপুষ্ট ছেলেটি একগাল কান এঁটো করা হাসি নিয়ে সামনে দাঁড়ালো,—চায়ে দিবে সাব?

—তা তো দিবে। এবং খুব তাড়াতাড়ি দিবে। এক্ষুনি বেরতে হবে।

ঘাড় নেড়ে তামান্না চলে যাচ্ছিল। গোলাপের ডাকে দাঁড়ালো,—আমায় এতোক্ষণ ডাকিসনি কেন রে?

—কা করে। সাব ইত্‌না নিদ্ যাচ্ছে কি, হামি আউর ডাকলুম না। যদি আপ গোঁসা কোরে।

—ঠিক আছে। যা চা নিয়ে আয়।

—লেকিন সাব। বিরেকফাস কেয়া করেঙ্গে? মাখন রোটি আউর আন্ডা দিবে?

—তাই দে।

তামান্না চলে যেতেই ও ঢকঢক করে এক গ্লাস জল খেয়ে দেখলো আজকের কাগজটা বিছানায় পড়ে আছে। সি আই ডি অফিসার গোলাপসুন্দর বসুর পক্ষে কোনদিনই সকালের কাগজ সকালে পড়া হয়ে ওঠে না। ওর চাকরিটা যেন সব সময়ের। খাতায় কলমে ছুটি ওর আছে। পাওনাই আছে। নিলেই হয়। কিন্তু নেওয়া হয় না। অবশ্য নেওয়া হয়েছিল। ছ মাস আগে। একটানা পনেরো দিনের। ওর বিয়ের সময়।

বিয়ে! আজকের দিনেও. প্রত্যেকেই চেষ্টা করে একটা সুস্থ সংসার। স্বামী-স্ত্রী আর দুটো বাচ্চা। আসলে হাম দো হামারা দো এই চিন্তা ধারাটা ভারত সরকারের দৌলতে অন্দর মহলে ঢুকে গেছে। বিশেষ করে কেরানিকুলে। শুধু কেরানিকুল কেন, যারা সংসারী হতে ভালবাসে, সুস্থ জীবনের স্বপ্ন দেখে, বাউন্ডুলে বা বোহেমিয়ান নয়, তারা হাম দো হামারা দো'র স্লোগানের সমর্থক। অকারণে সংসার বাড়ানোর পক্ষপাতি নয় বিশেষ করে আমাদের এই আবেগপ্রবণ বঙ্গ সমাজ। ছোট পরিবার সুখী পরিবারের বিজ্ঞাপন সব প্রভিন্সই দেখেছে। কিন্তু বাঙালিরাই সম্ভবত এটাকে মান্য করে বেশি। গোলাপসুন্দরের সঙ্গে নয়নতারার বিয়ের আগে খোলাখুলি অনেক কথাই হোত। তারাও এন্ডিগেন্ডি নিয়ে সতেরোজনের সংসারের কথা প্রথমেই নাকচ

করে হাম দো হামারা দো'র শপথ নিয়েছিল।

গোলাপ আজও ভেবে পায় না ঠিক কী চেয়েছিল নয়নতারা, তার কাছে? নয়নতারার সব কিছুই তার কাছে রহস্যময়। তবু তাকে ধরা একদিন দিতেই হবে। একটা মুখোমুখি সংঘাত নয় বোঝাপড়া। কিছু একটা। ইচ্ছে করলে সে এখনই নয়নতারাকে খুঁজে বার করতে পারে। কিন্তু কেন করবে? বিয়ে এবং সংসার বন্ধনের দায়িত্ব দুজনের। একজন ভেঙে দিতে চাইলে, অন্যজন গড়তে পারে না। এক হাতে তালি কে আর বাজাতে পেরেছে!

কলকাতার এক প্রাচীন নিষিদ্ধ পল্লী সোনাগাছি। এ শহরে প্রাচীনতার দাবি রাখে এমন বেশ কিছু রেড জোন এলাকা আছে বা ছিল। কিন্তু ডিগনিটিব দিক থেকে সোনাগাছি বোধহয় একটু অন্যরকমের। উত্তর কলকাতা বনেদি কলকাতা। জমিদার আর রাজাবাবুদের মহামোচ্ছবের মিলন ক্ষেত্র। কলকাতার বাবুদের পীঠস্থান। তারই মধ্যে গড়ে উঠেছিল বাঈজিদের রমরমা। সঙ্গে এসে গিয়েছিল দেহপসারিনীরাও। তারা আস্তানা গাড়লো, নন্দনবাগান, সোনাগাছি, রামবাগান, হাড়কাটা গলি, কালীঘাট চত্বরে। বাবু কলিকাতার প্রধান বারবধূগৃহ হিসেবে সোনাগাছিই নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। কত জমিদার আর উঠতি বাবুদের পতনের ইতিহাসও লেখা আছে সোনাগাছির ঘরে ঘরে। তেমনি লেখা আছে বারবনিতাদের চোখের জলের ইতিহাস।

বাইক থেকে নেমে গোলাপসুন্দর অনেকক্ষণ তাকিয়ে বইল শান্তাকোঠার ফলকটার দিকে। সাদাপাথরের ওপর কালো অক্ষরে খোদাই করা। রাতের বেলায় এ চত্বরে তাকে মাঝে মাঝে আসতে হয়েছে। কিন্তু সে তখন অন্য কাজে। এখন এই খোঁয়ারি না ভাঙা নিষিদ্ধপল্লির শান্তাকোঠাকে অনেক নগ্ন লাগল। রাতের রোশনাই নেই। রাতের লুকোচুরি খেলাও নেই। এখন অনেক বেশি সাধারণ। অনেক বেশি আটপৌরে। অনেক বেশি খোলামেলা।

জীবনটা কষ্ট দিয়ে শুরু করলেও গোলাপসুন্দর আর পাঁচটা ভাবুক বাঙালির মত। সে স্বভাবটার সঙ্গে হোমরাচোমরা ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশন অফিসারের স্বভাব নিতান্তই বেখাপ্পা। তবু কোন কোন সময়ে, কোন কোন দুর্বলমুহূর্তে গোলাপ কেমন যেন বিহুল হয়ে যায়। বাড়িটার সামনে দাঁড়াতেই ওর বুকের মধ্যে একটা 'ছ্যাঁৎ' অনুভূতি খেলে গেল। তারপরই কয়েক সেকেন্ডের অন্যমনস্কতা। এটা কেন হয় সেটাই ওর মাথায় ঢোকে না। কিন্তু মাঝে মাঝেই সে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। সকাল থেকে আরও একটা ব্যাপার ওর মাথায় ঢুকছিল না। কাল রাতে তার রিস্টওয়াচের কাচটা কখন আর কেমন ভাবে যেন ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই কোথাও ধাক্কা লেগেছিল। কব্জিটাও ছড়ে গেছে। মাঝে মাঝেই জ্বালা করছে। অনেক চেষ্টা করেও ঘটনাটা ওর স্মৃতিতে কিছুতেই ফিরে আসছিল না। বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণের জন্যে ও প্রিয় ঘড়িকে মন থেকে সরিয়ে দিল। ওকে ফিরতে হোল আর

এক ভাবনায়। এ ভাবনাটা ওকে মাঝে মাঝেই পেয়ে বসে। হয়তো এ ওর মনের অবচেতন সমাজচেতনা। পুলিস হলেও সেও মানুষ। পুলিস মানে নৃশংসতা নয়। কিছু পুলিসকর্মীর অমানবিকতায় তাদের প্রতি সাধারণ মানুষ সব আস্থা হারিয়েছে। পুলিস সম্বন্ধে তাদের মনে তৈরি হয়েছে ত্রাস আর বিভীষিকা। কিন্তু সত্যিই কি তাই? গোলাপসুন্দর একা হলেই ভাবতে থাকে সাধারণ মানুষের তাদের প্রতি এই বিতৃষ্ণার উৎস সর্বগ্রাসী রাজনৈতিক চক্র। আর এই রাজনৈতিক সুযোগসন্ধানী এবং ক্ষমতালোভীরা যতদিন থাকবে, ততদিন শুধু পুলিস কেন কোন মানুষের পক্ষেও সুস্থ জীবন ধারণ সম্ভব নয়। রাজনীতি আর গদিদখলের কাদা গায়ে লাগলে তার দাগ চট্ করে যায় না। পরতে পরতে নোংরা পাঁক। দাদা আর মন্ত্রীরা সেই পাঁক নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি খেলা খেলে। এ যেন নোংরা নিয়ে হোলি খেলা। সারা পৃথিবীতে এখন দুটো সম্প্রদায়। পলিটিকস্ অ্যান্ড নন্ পলিটিক্স্। এর বাইরে আর যা কিছু আছে সব টানামানির বস্তু। কে কোন দলে যাবে।

গোলাপসুন্দর আগে এসব কথা ভাবতো। বিয়ের আগে পর্যন্ত। চারদিকের অব্যবস্থা আর দুর্গতি দেখতে দেখতে ওর মনটা বিষিয়ে উঠত। হাতের রিভলবারটা হাতের তালুর মধ্যেই বিদ্রোহে লাফালাফি করতো। তবু, সংযমের বাঁধ ভেঙে সে কোন হঠকারী চিন্তায় ডুবে যায়নি। কিন্তু মনে মনে একটা আশা পুষে রাখতো। শাসক ও শোষণ থাকবেই। আইন এবং আইনভাঙার খেলা চলবেই। একজন মানুষের সঙ্গে আর এক মানুষের তফাত হতেই হবে। যারা বলে রক্তের রং এক, যারা বলে মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই তারা কথাগুলো কারো কাছ থেকে শুনে ওগরায়। ব্যক্তিজীবনে যাচাই না করেই বলে। মানুষ বাঁচতেই পারবে না উচ্চনীচ ভেদাভেদ না রেখে। বাঁচতেই পারবে না জিনেটিক যোগ্যতাকে সম্মান না দেখিয়ে। এগুলো রেখেই প্রয়োজন পরিবর্তনের। সে পরিবর্তন কায়েমী স্বার্থের অবলোপ। সে পরিবর্তন শক্তিকে যথাযথ বণ্টনের। ক্ষমতা কখনো এক কেন্দ্রীভূত হতে পারে না। ক্ষমতাকে ছড়িয়ে দিতে হবে জন হতে জনান্তরে। যোগ্য হতে যোগ্যতর মানুষের মধ্যে।

—সাব—

চট্কা ভাঙে গোলাপসুন্দরের। এই ওর এক রোগ। মাঝে মাঝে ও কোথায় যেন হারিয়ে যায়। তখন ওর সামনে কী ঘটছে আর ঘটছে না সেটাই ও বুঝতে পারে না। অনেক সময় ঘোর কাটলেও ও মনে করতে পারে না ঘোর লাগা সময়টাতে ও কোথায় ছিল।

ছোটবেলায় একবার ওর একটা অপারেশান হয়েছিল। ওকে অ্যানীস্টেসিয়া করতে হয়েছিল। অনেকবার চেষ্টা করেছিল অজ্ঞান হবার আগের মুহূর্ত থেকে জ্ঞান ফিরে আসার সময় পর্যন্ত ও কোথায় ছিল এটা ভাবতে বা জানতে। কিছুতেই সেই সময়টুকুও ধরতে পারেনি। মিসিং লিঙ্কটা বোধহয় কেউই ধরতে পারে না। এটাকেই কি মেন্টাল ব্ল্যাকআউট বলে? হবে হয়তো।

মাঝে মাঝে ওর মনে হয় মৃত্যু এরই বড় সংস্করণ। অ্যানীস্টেসিয়ায় চেতনার স্ক্রু সাময়িক বন্ধ থাকে। কিছুই টের থাকে না। আমি কে, আমি কোথায়, আমি কি? মৃত্যু, ঐ চেতনার সুইচটাকে চিরদিনের মতো অফ্ করিয়ে দেওয়া। যার ফলে 'আমি' নামক দেহধারী জীবটি আর জানতেই পারে না তার এই সযত্ন লালিত আমিটি এই গ্রহে আর কোথাও নেই। কোনদিনই তার আর ফিরে আসার কোন সম্ভাবনাই নেই।

—সাহাব! আপ কিধার খো গয়া?

সম্বিত ফিরে পেয়ে গোলাপসুন্দর দেখে রামানন্দ দাঁড়িয়ে আছে উৎকণ্ঠিত মুখে। সামান্য লজ্জিত হয় গোলাপ,—কেয়া হুয়া রামানন্দ?

—কুছ নেহি। আপ তো চলিয়ে।

—হ্যাঁ চল।

শান্তাকোঠা মোটামুটি সাজানো গোছানো। এ পাড়ার বাড়িগুলো রাইচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের মতো জরাজীর্ণ নয়। আবার পার্ক স্ট্রিট পাড়ার আধুনিক ম্যানসানও নয়। সোনাগাছি ইজ সোনাগাছি। খারাপ, ভালো, দেমাক, দীনতা আর ঐতিহ্য নিয়ে সে সোনাগাছি।

চেনা বাড়ি। অনেকবারই এ বাড়িটার সামনে দিয়ে তাকে যেতে আসতে হয়েছে। শোনা যায় এ পাড়ার সব থেকে অভিজাত বারবধূরা থাকে এই সব বাড়িতেই। তারা এক একজন এতোই সুন্দরী, এতোই আভিজাত্যময়ী, একটু পোশাকের আর মেকাপের রদবদল ঘটালেই তারা যে কোন পুজোপ্যান্ডেলে কোন বড়বাড়ির সুন্দরী গৃহবধূ ছাড়া আর কিছুই নয়।

গোলাপের এ বাড়িতে এই প্রথম। খানতিনেক বাড়ির পর একটা বাড়িতে বার চারেকের মতো আসতে হয়েছিল। বড়ো কোন নেতার সেফগার্ড হয়ে অথবা কোন মাঝারি মাফিয়াকে তুলে নিয়ে যাবার জন্যে। আবার কখনও বড় মাপের চোরাকারবারির রেখে যাওয়া টাকার বাণ্ডিল উদ্ধার করতে। পুলিসের চোখে ধুলো দেবার জন্যে অনেক বেআইনি মালদার পার্টি টাকার বান্ডিল রেখে যায় পেয়ারের পতিতার ঘরে। তারপর আস্তে আস্তে সেগুলো সরিয়ে নেয়। অনেকদিন তক্কে তক্কে থেকে একসময় গোলাপ হাতেনাতে ধরেছিল টাকা, টাকার কুমীর আর বারবধূটিকে। কিন্তু আজকের আসাটা একটু বড়ো ধরনের ঘটনা। খুনজখম এখানে হয়। রাস্তায় নর্দমায় অনেক গন্যি মান্যি বাবার ছেলেদের বডি পাওয়া যায়। কিন্তু সুন্দরী বারাঙ্গনা খুন? অন্তত এ অঞ্চলে চট্ করে ঘটে না। কারণ এই সব সুন্দরীদের সিকিউরিটির জোর আছে। এক কথায়, কিছু পোষা গুণ্ডা এদের জন্যে নিয়োগ করা হয়।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে গোলাপ বলল,—কোন্ তলায়?

—জী। তিনতাল্লামে।

—বডি দেখেছ নাকি?

—নেহি সাহেব। উধার এস. আই সাব হ্যায়। ফোটোগ্রাফার বীরেশ সাব ভি হ্যায়। ফোটো খিঁচ্‌তা।

কিছু না বলে গোলাপ তিনতলায় চলে এলো। খুনের ব্যাপার। যারা তিনতলায় থাকতো এখন তাদের সব ঘরগুলোই ফাঁকা। কে আর সাধ করে পুলিসি ঝামেলায় জড়াতে চায়!

সুদৃশ্য পর্দা সরিয়ে গোলাপ ঘরের চৌকাঠ পার হয়ে দাঁড়ালো। নিমেষে চারদিক দেখে নিল। অবস্থাপন্ন বারবনিতার ঘর। সব আছে। কালার্‌ড্ টিভি, ফ্রিজ, দামি সোফা, দামি বক্সখাট, দামি ড্রেসিং টেব্‌ল। একপাশে মিউজিক সিস্টেম। অ্যাটাচ্‌ড্ বাথ। ঘরের মেঝেয় হাল্কা সবুজ রঙ কার্পেট। ঘরের পর্দা, বিছানার চাদর সবই সবুজ রঙের। কেবল মৃতার বডি সাদা চাদরে ঢাকা।

গোলাপ ধীরে ধীরে মৃতার কাছে এগিয়ে যায়। এস. আই সুবীর গুপ্ত দাঁড়িয়ে ছিল পাশে। বীরেশ এখন কয়েকটা আসবাবপত্রের ছবি তুলছে।

—কিছু বুঝলে সুবীর?

—একজ্যাক্টলি বলতে পারছি না। সেটা বলবে পোস্টমর্টেম। তবে,

—তবে?

—আপনি দেখুন স্যার। আমি ঠিক গেইস করতে পারছি না। তারওপর—

আর কিছু না বলে গোলাপ পকেট থেকে পাতলা নাইলন গ্লাভ্স বার করে হাতে পরে নেয়। তারপর ধীরে ধীরে মৃতার দেহ থেকে চাদরটা সরিয়ে দেয়। মৃতার মুখ দেখে ওর মুখ থেকে একটা শব্দ নির্গত হোল,—ইস্-স্।

—কী হোল স্যার?

—মেয়েটি ফিল্মে নামলে পারতো। ভারি সুন্দর মুখখানা। কোথায় যেন দেখেছি মনে হচ্ছে।

—আপনি দেখেছেন স্যার? কোথায়?

—সেটা বলতে পারলে তো হয়েই যেত।

চাদরটা টানতে গিয়েই ও থমকে গেল। পাশে তাকাতেই দেখল সুবীর ওপাশে চলে গেছে।

মেয়েটির দেহ নিরাবরণ। সম্পূর্ণই। কেবলমাত্র হাত দুটো সোজাসুজি ছড়ানো। কিন্তু দুটি হাতেরই করাগ্রভাগ খামচে ধরা আছে বিছানার চাদর। নগ্ন ধবধবে দুটি পায়ের পাতায় খিঁচুনিভাব। দুটি পা-ই ঈষৎ ছড়ানো। পকেট থেকে ছোট্ট টর্চটা জ্বালিয়ে পায়ের পাতা থেকে আলো ফেলতে ফেলতে গোপনাঙ্গ পর্যন্ত উঠে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। আরো গভীর চোখে দেখতে দেখতে ও হাল্কা চিৎকারে ডাকল,—সুবীর কী লজ্জায় রাঙাবউ হয়ে গেলে? এদিকে এসো।

সুবীর একটু আড়ষ্ট। তার বয়েস অল্প। সবে পরীক্ষায় পাশ করে চাকরিতে ঢুকেছে। ছেলেটা বুদ্ধিমান। এখনো শরীরে পুলিসি জটিলতা বাসা বাঁধেনি। সম্ভবত তেইশ চব্বিশ বছরের ছেলেটি এর আগে কোন নগ্ন নারীকে দেখেনি। তাও বসের সামনে।

—কিছু বলছেন স্যার?

—আমি আসার আগে মেয়েটিকে ভালো করে দেখেছ?

—না স্যার।

—ভেরি ব্যাড অব ইউ। আন্দাজ কবতে পার কী ভাবে মেয়েটির মৃত্যু হতে পারে?

—বিষটিষ খাওয়ানো হতে পারে।

—মেয়েটির মুখে তার কোন চিহ্ন আছে?

—না স্যার।

—তাহলে কী আছে?

—ভয় আর কষ্ট মেশানো একটা ব্যাপার ধরা পড়ছে।

—গুড। আর কিছু?

—আর মানে, মরার আগে মেয়েটি বাঁচার চেষ্টা করেছিল।

—বুঝলে কেমন করে?

—হাত দুটো দেখুন। বিছানা খামচে ধরে আছে।

—গুড। আর?

—পায়ের পাতার ফরমেশানও নরম্যাল নয়। ওখানেও বাঁচার আকুতি।

—তার মানে...,আচ্ছা সুবীর আর কিছু তোমার চোখে পড়ছে?

—তেমন কিছু না স্যার।

—আগে কখনও কোন মেয়ের সঙ্গে এক বিছানায় রাত্রিবাস করেছ?

—হ্যাঁ স্যার।

—হোয়াট?

—মা মারা যাবাব পর আমার ছোট বোনটা কিছুতেই—

—আহ্, চুপ করো। আমি ওসব কথা বলিনি। কোন মহিলার সঙ্গে সহবাস করেছ?

—কি যে বলেন স্যার?

—হ্যাঁ কিংবা না বলবে।

—না স্যার।

—করলে বুঝতে পারবে। মেয়েটি গোপনাঙ্গ বেয়ে, সামথিং অ্যাবনরম্যাল, এনিওয়ে, যা বলার পোস্টমর্টেম বলবে। বীরেশ তোমার ছবি তোলা কমপ্লিট?

—হ্যাঁ দাদা।

—তুমি নিচে গিয়ে রামানন্দকে নিযে থানায় চলে যাও। বডি পোস্টমর্টেমে যাবে। আমি ততক্ষণে এদিকের কাজ মিটোই।

বীরেশ চলে যাবার পর গোলাপসুন্দব আরো ভালো করে ঘরটা লক্ষ্য করতে শুরু করল। একজন সচ্ছল বাববনিতার ঘর। ঘরের মধ্যে তখনও হাল্কা লালরঙ আলোটা জ্বলছিল। অর্থাৎ মেয়েটি আলো নেভাবার সময় পায়নি। এছাড়া সারা ঘরে কোথাও কোন বিশৃঙ্খলার ছাপও নেই। অ্যাটাচড্ বাথ ঠেলে দেখল। বাথরুমের আলো জ্বলছিল না। অর্থাৎ মেয়েটির যখন মৃত্যু হয় বাথরুমের আলো তখন নেভানোই ছিল। বাথরুম ব্যবহার হয়নি বেশ কয়েক ঘণ্টা। কারণ মেঝে বেশ শুকনো। রিসেন্টলি জল পড়ার কোন দাগ নেই।

গোলাপ ফিরে এলো মেযেটির সামনে। সুবীর তখনও অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল।

—আচ্ছা সুবীর, এই মুহূর্তে তোমাব এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কোন প্রশ্ন মনে আসছে না?

—হ্যাঁ স্যার আসছে।

—প্রশ্ন করো।

—হ্যাঁ স্যার, প্রশ্নই করতে বলছি। তবে বাড়ির পাঁচজনকে। কারণ এটা ঠিক ন্যাচারাল ডেথ নয় বলেই মনে হচ্ছে।

—সেটা যথারীতি হবে। এখন তুমি পয়েন্ট বাই পয়েন্ট তোমার ক্যোয়ারিজ তুলে ধর।

—প্রথমত মেয়েটির মুখ। ভয় এবং কষ্টের ছায়া স্পষ্ট। মেয়েটির পাশে মাথার বালিশের অবস্থান নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন?

—করেছি। ওটাই তো ভাবাচ্ছে। এতো দলামলা হয়ে থাকবে কেন? তবে কি মেয়েটির মৃত্যুতে ঐ মাথার বালিশের কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা আছে?

—ইয়েস স্যার, ইউ আর কারেক্ট। দ্যাট ইজ অলসো মাই পয়েন্ট। তারপর দেখুন বিছানাও যথেষ্ট পরিমাণে দলামলা হয়ে আছে। অর্থাৎ—

—বুঝেছি তুমি কী বলবে। এই মেয়েটির ঘরে কাল কোন অতিথির আগমন ঘটেছিল। তা এমনটা তো হতেই পারে।

—প্রশ্ন সেটা নয় স্যার। মহিলার যখন এটাই জীবিকা তখন যে কেউই আসতে পারে, এবং তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানানোই গণিকার কর্তব্য। কিন্তু—

—ইয়েস। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় মৃত্যুটা অ্যাবনরম্যাল। অর্থাৎ হয় সে সুইসাইড করেছে অথবা তাকে হত্যা করা হয়েছে।

—একজন অখ্যাত বারবনিতাকে, ইফ সি ইজ নট পলিটিক্যালি ইনভল্‌ভড, চট্ করে কি কেউ তাকে মারার রিস্ক নেবে?

—নাহ্ সুবীর, তোমার এ যুক্তি ঠিক মেনে নিতে পারছি না। পুলিস ডিপার্টমেন্টের সাব ইন্সপেক্টর হয়ে তোমার জানা উচিত মার্ডার বা হোমিসাইড হতে পারে অনেক, অনেক কারণে। মোটিভের কি আর শেষ আছে? মেয়েটি যদি সত্যিই মার্ডার হয় থাকে, অবশ্য মার্ডারের কোন ডাইরেক্ট প্রমাণ এখনও পাইনি। তবুও ইফ ইট ইজ আ মার্ডার কেস তার একটা মোটিভ খুঁজে পাওয়া যাবেই। এখন এই মুহূর্তে আমার এ বাড়ির লোকেদের সঙ্গে কথা বলা দরকার। দেখ তো, কাকে কাকে পাও। নাহ্ থাক। তোমার একলা যাবার দরকার নেই। চলো আমিও যাচ্ছি।

ঘরের বাইরে এসে দেখল চারদিক সান্নাটা। তিন-চারটে ঘর। সব ঘরই বন্ধ। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে আবার হোঁচট খেল গোলাপ। কাচ ভেঙে চৌচির। ঝরে পড়ে যায়নি। এখনও আটকে আছে। সকালের মতো আবার ওর ভ্রূ কোঁচকালো। আশ্চর্য, কাচটা ভাঙলো কখন। কালরাতেও ঠিক ছিল। অন্তত রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত ঠিক ছিল। কারণ কাল রাত সাড়ে এগারোটার সময় ও বন্ধু কমলের বাড়ি থেকে রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে বেরিয়ে এসেছিল।

কমলের প্রথম বিবাহ বার্ষিকী। এই মুহূর্তে গোলাপের মনে পড়ল, কমলের বাড়ি গিয়ে কমলের মিসেসের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ও কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। আসলে সেই মুহূর্তে তার মনে হয়েছিল, মাত্র ছমাস আগে নয়নতারার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কী মাত্র দুদিনের দেহমিলনও ঘটেছিল। মানালির হোটেলে। আর দ্বিতীয় রাতের শেষে, হোটেলের বেয়ারা এসে তাকে ডেকে তুলেছিল বিছানা থেকে, তখন ঘড়ির কাঁটা বারোটার ঘরে। এবং ঠিক তখনই সে নয়নের চিঠি পায়। অজ্ঞাতকারণে নয়ন চলে যাচ্ছে আর কোনদিন দেখা হবে না এই কথা জানিয়ে।

কমলের বউয়ের সঙ্গে কথা চলাকালীনই তার মনে হয়েছিল, এই অল্প সুন্দরী মেয়েটি ভীষণ সুখী। অন্তত তার মতো মাত্র দুদিনের দাম্পত্য জীবন তার নয়। হ্যাঁ দুদিন। তাকে প্রচণ্ড অপমানের সামনে দাঁড় করিয়ে নয়নতারা তার নাগালের বাইরে চলে গেছে। রেখে গেছে অনেক 'কেন'র সামনে। যে 'কেন'র কোন জবাব সে আজও পায়নি।

সুখী দম্পতিকে দেখে একটা জেলাসি তার মধ্যে ভেসে উঠেছিল কিছুক্ষণের মধ্যে। সেটাকে পাশ কাটানোর জন্যেই সামান্য কিছু মুখে দিয়েই ও বেরিয়ে পড়েছিল কমলের বাড়ি থেকে। সেই সময় সে সময় দেখে। রাত সাড়ে এগারোটা। ঘড়ির কাচটা তখনও অক্ষত ছিল। তারপর সে একটা ট্যাক্সি নিয়েছিল। ডিউটি না থাকলে সে কখনোই সরকারি বাইক বা জিপ ব্যবহার করে না। সে যখন ট্যাক্সি নিয়েছিল তখন আর ঘড়ি দেখেনি। কারণ তার বাড়ি ফেরার কোন তাগিদ ছিল না। একমাত্র তামান্না ছাড়া ফ্ল্যাটে আর কেউ নেই। এই ভরা যৌবনে ফাঁকা বিছানা তাকে ব্যঙ্গ করে। ফলে ডিউটির পরে মদ্যপান বেড়ে গেছে। হ্যাঁ মনে পড়ছে। কমলের বাড়ি থেকে একটা পাঁইট নিয়ে নিয়েছিল। তারপর ট্যাক্সিতে র-ই চুমুক দিয়েছিল। এদিক

ওদিক অনেক রাস্তা ঘুরেছিল। তারপর—। বাড়ি ফিরে ঘুম! তাহলে কাচটা ভাঙলো কখন?

—স্যার, আপনরার ঘড়ির কাচটা যে ভেঙে গেছে। হাতটাও তো ছড়ে গেছে!

—হ্যাঁ। একটু মারকিউরোক্রোম লাগাতে হবে। জ্বালা জ্বালা করছে। সম্ভবত কোথাও ধাক্কা লেগেছে।

—কোথায় স্যার? ধাক্কাটা বেশ জোরেই লেগেছিল। কাচটা একেবারে মাকড়সার নেট হয়ে গেছে। আজ সকালে বেরুবার সময়েও চোখে পড়েনি?

—হুঁ। তখনই প্রথম চোখে পড়ে। কিন্তু কাচ পাল্টানোর আর সময় পাইনি।

—তা ঠিক। আপনি ইচ্ছে করলে আমার ঘড়িটা নিয়ে কাজ চালাতে পারেন।

—আর তুমি?

—এক কাজ করুন। আপনার ঘড়িটা আমায় দিয়ে রাখুন। কোন একসময় ফাঁক পেলেই ঘড়ির দোকান থেকে কাচটা পাল্টে নিয়ে আসব। তবে এ কাচ সব দোকানে পাওয়া যাবে না। টাইটানের বিশেষ মডেল। অরিজিন্যাল কাচই লাগাতে হবে। একটু দেরি হতে পারে।

গোলাপসুন্দর একবার সুবীরের মুখের দিকে তাকালো। ছেলেটি সম্বন্ধে একটু অন্যরকম ভাবনা ছিল গোলাপের। কিন্তু এও তো বসের পা চাটা শুরু করল। ভেতরে ভেতরে হাসল সে। সত্যি এই দুনিয়ায় টাকা আর গদিই সব থেকে বড়ো কিছু। ছেলেটা প্রমোশান চায়। বসের সুনজরে পড়ে। ভালো। উন্নতির চেষ্টা তো সবাই করবে। কিছু না বলে হাতের ঘড়িটা খুলে সুবীরের হাতে দিয়ে বলল,—সারিয়ে এনে দামটা চেয়ে নেবে। নইলে চাটুকারিত্বের জন্যে তোমাকে ডিগ্রেড করব। দাও তোমার ঘড়িটা।

ঘড়িটা নিতে নিতে গোলাপ বলল,—ভয়ে সবাই নিচে চলে গেছে। তাই না?

—হ্যাঁ স্যার, ঠিক তাই। কে আর পুলিসের হ্যাপায় যেতে চায় বলুন।

—কিন্তু দোতলার ঐ চারটে ঘরের চার মেয়েকে যে দরকার। এক কাজ কর সুবীর, তুমি নিচে যাও। এদের কেউ একজন বাড়িওলি মাসি-টাসি থাকে। তাকে পাকড়াও করো। তা হলেই মেয়েদেরও সন্ধান পেয়ে যাবে। এদের এখানে একজন কি দুজন পার্মানেন্ট ডাক্তার থাকে। তাদের রেসপনসিবিলিটি অনেক। যে ডাক্তার মেয়েটিকে ডেড্ ঘোষণা করেছেন তাঁকেও ডাকতে হবে। বলবে পুলিসের প্রয়োজনে তাঁকে একবার আসতে হবে।

মাথা নেড়ে সুবীর চলে যাচ্ছিল। ও যখন সিঁড়ির কাছ বরাবর, গোলাপ অনুচ্চ স্বরে চেঁচালো—সুবীর, সোহিনীকে একবার সেইলে ধরো। আসতে বলো। মেয়েদের জেরার সময়ে ওর থাকা উচিত। তাছাড়া মহিলার ডেডবডিটাও ওর একবার দেখা দরকার। যা লজ্জাজনিত কারণে আমাদের চোখ এড়াবে সেটা মেয়েদের চোখে ধরা পড়বেই। তুমি, ইমিডিয়েট ওকে আসতে বল।

—ইয়েস স্যার, বলেই সুবীর বেরিয়ে গেল।

মৃতা মেয়েটির কাছে গিয়ে ও আরো ভালো করে তাকে পরীক্ষা করতে লাগল। সম্ভবত মেয়েটি সহবাসরত অবস্থায় মারা গেছে বা তাকে হত্যা করা হয়েছে। সব থেকে অদ্ভুত লাগছে মেয়েটির মাথার পাশে থাকা বালিশটা বীভৎসভাবে দোমড়ানো মোচড়ানো অবস্থায় পড়ে আছে। হাতে ওর নাইলন গ্লাভস পরাই ছিল। একেবারে চোখের কাছে নিয়ে এসে ও টের পেল ক্রিমকালারের বালিশের ওয়ারে শুকনো রক্তের দাগ। জমাট বেঁধে কালচে হয়ে গেছে। ঘর এবং ঘরের আসবাব, বিছানা, চাদর সবই এতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সেখানে মাথার বালিশে

ঐ ছোট্ট রক্তের দাগটা বেমানান। কিন্তু কেন? টর্চের আলো ফেলল মেয়েটির মুখে। মেয়েটির নাক আর ঠোঁটে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির চারাতে চারাতে ওর মনে হোল কষের কোণে রক্তের আভাস।

ভ্রু কোঁচকালো গোলাপের। আলতো করে মেয়েটির গলা সামান্য তুলে ধরল। নাহ্, কোথাও স্ট্র্যাঙ্গুলেশানের কোন দাগ নেই। অর্থাৎ গলা টিপে মারা হয়নি। তাহলে?

আবার ও মেয়েটির পায়ের কাছে চলে গেল। রাইগার মর্টিস সেট-ইন করে গেছে। তার মানে তিনচার ঘণ্টার আগেই মেয়েটির মৃত্যু হয়েছে। দুটো পা-ই বেশ শক্ত। স্টিফ্। কিন্তু পায়ে ওর কিসের দাগ? কোন দড়ি বা ঐ জাতীয় কিছু দিয়ে কী ওর পা দুটো বাঁধা হয়েছিল? দাগটা এখনও রয়ে গেছে। এবং যতদূর মনে হয় মেয়েটি মারা যাবার পরও পায়ের বাঁধন কিছুক্ষণ রাখা ছিল। ফলে দাগটা এখনও সামান্য হলেও থেকে গেছে।

বিছানার ওপর চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে হঠাৎই ওর একটা বস্তুর ওপর চোখ আটকালো। অতি ক্ষুদ্র একটি চকচকে বস্তু। কাটা নখের আকার। আঁশ তোলা কাচের অংশ। চিমটের মতো করে দুই আঙুলের আলতো চাপে বস্তুটিকে চোখের সামনে নিয়ে এলো। হঠাৎই ওর নজর চলে গেল নিজের হাত কব্জির দিকে। নাহ্ তার হাতঘড়ি তো সুবীরের পকেটে।

কখন যেন সুবীর ফিরে এসে গোলাপের পিছনে দাঁড়িয়েছিল। ওর ভাবনার রেশ ধরে সুবীর বলল, হ্যাঁ স্যার, আপনি যা ভাবছেন সেটাও হতে পারে।

—আমি কী ভাবছি বলতো?

—কাচটা কি ভাঙা ঘড়ির কাচ?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। কারণ একটু আগেও আমার হাতে ভাঙা কাচের ঘড়ি ছিল।

—তা দিয়ে কী প্রমাণ হোল? কাচের টুকরোটা আপনার ঘড়ির? আর সেটা হতেও তো পারে। আপনি এতোক্ষণ এই বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে হাতটাত নেড়েছেন। ভাঙা কাচের একটা ছোট্ট টুকরো পড়তেও পারে।

—তা পারে। সম্ভবত সেটাই হয়েছে। আচ্ছা দেখ তো মেয়েটির কোন ঘড়ি আছে কি না। আশেপাশে। আই মিন রিস্টওয়াচ।

সুবীর খোঁজা শুরু করার মুহূর্তেই কিছু শোরগোল শোনা গেল। গোলাপ ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ইন্সপেক্টর মিস্ সোহিনী সিং ঘরে ঢুকছেন। পিছনে মোটাসোটা এক মহিলা। চোখেমুখে সদ্য ঘুম ভাঙা আলসেমি। গোলাপকে দেখে সোহিনী এগিয়ে এসে বলল,—স্যার, ফোন পেয়েই ছুটে এলাম। সুবীর বলল, ইটস আ মার্ডার কেস।

সোহিনী পাঞ্জাবের মেয়ে হলেও তার জন্ম, শিক্ষা এবং কর্ম এই কলকাতায়। তাই বাংলা বলতে তার আটকায় না। অবশ্য বাংলার ভাঁড়ারে টান পড়লে হিন্দি এবং ইংরেজি দিয়ে বাক্য সমাপ্ত করে। নব্য যুবতীর তরতাজা মুখের দিকে সেকেন্ড দুয়েকের মতো তাকিয়ে গোলাপ বলে,—হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে। সোহিনী মেয়েটির বডিটা তুমি একটু ভালো করে দেখ। বুঝতেই পারছ।

—নো প্রবলেম স্যার। ও হ্যাঁ, ইনি শান্তাবালা। এই কোঠির জেনানারা সব ওর আন্ডারে থাকে। আপনার যা পুছতাছের আছে করতে পারেন।

—ওয়েল। সুবীর নোট নাও। তারপর শান্তাবালার দিকে তাকালো। তাকাতেই ওর ভ্রু দুটো কুঁচকে উঠল কারণ শান্তাবালা অপলক দৃষ্টিতে তারই দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে কিছুটা বিস্মিত ভাব। মাত্র কয়েক সেকেন্ড। গোলাপ ফিরে এলো তার পুলিসি মেজাজে,—আপনি

বাড়িতেই থাকেন?

মহিলার বয়েস প্রায় পঞ্চাশ-বাহান্ন। সারা জীবনব্যাপী অনেক অত্যাচারের ছাঁকনি ছাঁকা ছাপ লেগে আছে। বিশেষ করে মুখে। চোখে। চোখের তাকানি আর ভঙ্গীমায়। জীবনযুদ্ধে মহিলা ক্লান্ত। তবে কিছু দম্ভও আছে। কারণ এখন তিনি এই কোঠির মালকিন। অনেক মেয়ের মউসি।

গোলাপ আবার জিজ্ঞাসা করল,—আপনি এই বাড়িতেই থাকেন তো?

চাপা খনখনে গলায় শান্তাবালা বলে,—হ্যাঁ। এ বাড়ির সব মেয়েরাই আমার মেয়ের মতো।

—ভেরি গুড। আপনার নামটা জানতে পারি?

—শান্তাবালা দাসী।

—আচ্ছা শান্তাদেবী, যে মেয়েটি মারা গেছে তার নাম কী?

—সতী।

হোঁচট খেল গোলাপ। এ অঞ্চলের আর একটি মেয়ের নাম ও জানতো। তার নাম সীতা। কেউ না কেউ এদের এই রকমই নাম রাখে। সীতা, সতী, সাবিত্রী, অহল্যা। হিন্দুদের পৌরাণিক গল্পের প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলা এঁরা। এইসব মেয়েদের ঐ সব নাম দেবার কারণ কি? এই যন্ত্রণাময় জীবন থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে পঞ্চসতীর নামে নাম রাখা? কে জানে হবে হয়তো।

—সতীকে আপনি কতদিন চিনতেন? আই মিন, কতদিন ও আপনার কাছে আছে?

—তা বছর তিনেক হবে।

—তিন? মেয়েটির এখন বয়েস কত?

—আপনি বুঝতে পারেননি?

—প্রশ্ন নয়। যা জিগ্যেস করছি তার উত্তরটা দেবেন। জানা থাকলে।

—কুড়ি হবে।

—তার মানে নাবালিকা অবস্থায় ওকে এ লাইনে নিয়ে এসেছিলেন?

—আমরা এখানে কাউকেই আনিনি। ওদের মায়েরা একদিন এই কাজ করেছে। তাদের এখন বয়েস হয়েছে। আর খদ্দের পায় না। তাই ওদের মেয়েরা নেমে পড়েছে।

—এই মেয়েটির মা কোথায়?

—ওই একমাত্র মেয়ে যে এসে পড়েছিল।

—মানে বুঝলাম না।

—সে বাবু অনেক কথা। শুনে আর কী করবেন? সব মেয়েদেরই একই কথা। নেপালি মেয়ে। সতী রাই। খুব গরিবের মেয়ে ছিল। বাবা মা কেউ ছিল না। মামা ওকে এক বুড়োর রেন্ডি বানাতে চেয়েছিল। পালিয়ে এসেছে। তারপর বেশ কিছুদিন বিহারের এক রেন্ডিপট্টিতে চলে গিয়েছিল। আমাদের শাজাহান ওকে ওখান থেকে উদ্ধার করে এখেনে নিয়ে আসে।

—একেবারে উদ্ধার পাবার জন্যে?

—ভাগ্য বাবুজি। ভাগ্যের ওপর তো আর কথা চলে না।

—মেয়েটি কেমন ছিল?

—সুন্দরী ছিল। নজরও ছিল অনেক বাবুর। একবার তো এক বড়লোকের উঠতি ছেলে

ওকে বিয়ে করে এখান থেকে নিয়ে যাবার জন্যে পাগল।

—তা আপনারা ছেড়ে দিলেই তো পারতেন।

—আপনি কি মনে করেন বাবুজি, কোই বড়লোকের বেটা বিয়ে করব বলে কাউকে নিয়ে গিয়ে তাকে বিয়ে করে? তাকে নিয়ে সমাজে তুলতে পারে? পারে না। এরা আসে লেড়কির শরীরের মাংসের খোয়াবে। মাংস ঝরে গেলে লাথ মেরে আঁস্তাকুড়ে পাঠিয়ে দেবে। তখন ঘাট আর ঘর কোনটাই থাকবে না।

—আপনার কি মনে হয় ওর আশিকদের কেউ ওকে মেরেছে?

—কাল তো তাদের কেউ আসেনি।

—আপনি সব খেয়াল রাখেন কার ঘরে কে আসছে যাচ্ছে?

—সব সময় না হলেও কিছু কিছু সময়ে তো রাখিই।

—সতীর ঘরে কাল কারা এসেছিল? তাদের সবাইকে চেনেন?

—তিনজন এসেছিল। দু জনকে চিনি। জানাশোনা লোক। আর একজনকে আগে কোনদিন দেখিনি।

—সব থেকে শেষে কে এসেছিল?

—সেই বাবু। এ বাড়িতে সে কালই প্রথমবার এসেছিল।

—তাকে দেখলে চিনতে পারবেন?

—তেমন ভালো করে দেখিনি। তবে চেষ্টা করতে পারি।

—তবু, চেহারার একটা আন্দাজ দিতে পারবেন?

—ছেলেটার বয়েস বেশি নয় অনেকটা আপনার বয়েসি হবে। দেখতে শুনতে অনেকটা আপনারই মতো। ছেলেটা খুব নেশা করেছিল।

—চোখে চশমা ছিল?

—না সাহেব।

—চুলের স্টাইল মনে আছে?

—অনেকটা আপনার মতোই হবে।

—কি জামা কাপড় পড়ে এসেছিল মনে আছে?

—একটু একটু। কালো রঙের পাঞ্জাবি আর সাদা চোস্তা। পায়ে সাদা নাগরা।

—এই ছেলেটি যখন আসে রাত তখন কটা?

—তা ধরুন রাত একটা তো হবেই।

—অতরাতে আপনারা কি খদ্দের অ্যালাউ করেন?

—রেন্ডিবাড়ির দরওয়াজা তো গেরস্তবাড়ির দরওয়াজা নয়। রেন্ডিরবাড়ির দরওয়াজা দিনরাতই খোলা থাকে।

—ছেলেটা এসে কি সোজা ওর ঘরে ঢুকে যায়?

—আর সবার ঘরে বাবু ছিল। তাই মোহাসীন যখন বাবুর কথা বলল, আমি সতীর ঘরে পাঠিয়ে দিলাম।

—আপনার টাকাকড়ি সব মিটিয়ে দিয়েছিল?

—সে আমি জানি না। সতী থাকলে বলতে পারতো। আমরা কেবল হিসেব রাখি কার ঘরে কটা বাবু ঢুকলো। পরে হিসেবের টাকা পাঠিয়ে দেয়।

—এই ছেলেটিই যে শেষে এসেছিল, আই মিন, এর পরে আর কেউ আসেনি সেটা আপনি জোর দিয়ে কি করে বলছেন?

—আমার শুতে শুতে রাত হয়। রাত তখন তিনটে বাজে। উঠে দেখলুম কি সতীর ঘরের দরজা ভেজানো আছে। ঘরে আলো জ্বলছে। এরপর উঁকি দিয়ে দেখলাম কি সতী ঘুমাচ্ছে বিছানায়। ঘরে আউর কেউ নেই, তাই ভাবলাম কি মেয়েটা সন্ধে থেকে তিন বাবু নিয়ে খুব ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি ওকে আর ডাকাডাকি না করে বড়ো আলো নিভিয়ে লালবাতিটা জ্বালিয়ে নিজের ঘরে চলে যাই।

—তাহলে সেই ছেলেটি কখন গেছে তার খবর আপনি জানেন না?

—বেশ্যা বাড়িতে লোক আসে লুকিয়ে লুকিয়ে। আউর যখন ফিরে যায় তখন যেন চোর পালাচ্ছে। মুখে রুমাল টুমাল চাপা দিয়ে। নাহ্ বাবুজি কখন গেছে বলতে পারব না।

—গোটা বাড়ির আর কেউ দেখেনি।

—বলতে পারব না সাহেব। আপনি নিজেই জিগ্যেস করে নিন না।

—ঠিক আছে আপনি এখন যান। পরে দরকার হলে ডাকতে পারি। এই ফ্লোরে আরও কয়েকটা ঘর আছে। নিশ্চয়ই সেখানে কেউ থাকে।

—হ্যাঁ থাকে। চম্পা আছে, রাধা আছে, সুজাতা আছে।

—একে একে ওদের পাঠিয়ে দিন।

প্রথমে এলো রাধা। বছর বাইশ-তেইশের মতো বয়েস। দেখতে-শুনতে যাই হোক না কেন শরীরটা আছে। কথায় বলে বাসিফুলের মালা আর সকালবেলার বেশ্যা, এক বরাবর। জৌলুস হারানো সৌন্দর্য। ম্লান আর নিষ্প্রভ। এই রাধা নামের মেয়েটিকে হয়তো সন্ধের সাজে দেখলে অন্যকিছু মনে হবে। এখন প্রসাধনহীন জলে ধোয়া প্রতিমার মতো। ওর দিক একবার তাকিয়ে নিয়ে গোলাপ প্রশ্ন করে,—ঐ মেয়েটির নাম সতী তো?

—হ্যাঁ। আমরা নামটা পাল্টাতে বলেছিলুম। পাল্টানো না।

—কেন নাম পাল্টাবে কেন?

—সতী, সীতা, লক্ষ্মী, সাবিত্রী, এসব নামের মেয়েরা খুব একটা সুখী হয় না।

—বুঝলাম। সতীর সঙ্গে তোমার আলাপ কেমন ছিল?

—ভালো।

—কাল রাতে ও খুন হয়েছে। শুনেছ তো?

—হ্যাঁ বাবু।

—কার মুখে শুনলে? নাকি নিজে দেখেছ?

—না বাবু। তবে মদন বলছিল।

—মদন কে?

—আজ্ঞে, সবারই ফাইফরমাস ঘাটে। এই বাড়িতেই থাকে।

—দালাল?

—না বাবু। দালালদের র‍্যালা অনেক। মদন নিতান্তই বাচ্চা ছেলে।

—বাচ্চা ছেলে? কত বয়েস?

—তা ধরুন বছর বারো-তেরো হবে।

—বারো-তেরো বছরের ছেলে এই বাড়িতে কাজ করছে?

—না করে কোথা যাবে বলুন? বেশ্যার ছেলেরা কি ভদ্রসমাজে ঠাঁই পায়? ওর মা-টা হঠাৎই মরে গেল। তাই শান্তামাসি ওকে এখানেই রেখে দিল।

—শান্তামাসি মানে যিনি—

—হ্যাঁ বাবু। মাসিই তো এখেনে পাঠিয়ে দিল।

—তোমার সঙ্গে সতীর শেষ কখন দেখা হয়েছিল?

—আজ্ঞে, তেমন করে দেখা সন্ধে থেকেই হয়নি। ওর ঘরেও সন্ধে থেকে বাবু ছিল। আমার ঘরেও।

—মেয়েটা কেমন?

—বেশ্যারা খারাপ হয় না বাবু। বাবুরাই তাদের খারাপ করে।

—তত্ত্বকথা থাক। যা জিগ্যেস করছি তাই বল। স্বভাবটা কেমন ছিল? উগ্র না শান্ত?

—একটু দেমাক ছিল। সেটা অবিশ্যি রূপের জন্যে। আর বাবু, রূপই তো আমাদের রুপো দেয়।

—প্রায় মাঝরাতে মেয়েটি মারা গেছে। তখন ওর ঘরে কে এসেছিল সেটা জান?

—না বাবু। আমার ঘরের লোক গেল রাত তখন দেড়টা হবে। ঘুমে চোখ জুড়িয়ে আসছিল। তখন কি আর অন্য কারো ঘরের বাবুর দিকে তাকানোর মেজাজ থাকে?

—তার মানে তুমি দেখনি?

—না বাবু।

—কারো সঙ্গে রিসেন্টলি সতীর ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল কি না বলতে পার?

—শান্তামাসির সঙ্গে দিন তিনেক আগে একটু কথাকাটাকাটি হয়েছিল। এ ছাড়া তো—

—ঝগড়ার কারণ?

—ঐ বাবু নিয়ে ঝগড়া আর কি? আচ্ছাবাবু, আপনিই বলুন, বেশ্যার শরীর কি শরীর নয়? আমাদেরও কি মন বলে কিছু নেই। ভালো লাগা না লাগার কোন দাম নেই?

—কী হয়েছিল কী?

—লালবাবু বলে এক বড়লোকের কুপুত্তর আছে। আমার কাছেও দু একবার এসেছিল। বড় নোংরা বাবু। সে সব আপনাকে বলতে পারবো না। কেউই ওকে নিতে চায় না। সেই নিয়েই সতীর সঙ্গে তুলকালাম। সতী ওকে ঘরে ঢুকতে দেবে না আর লালবাবুও ঐ ঘরে ঢুকবে। আপনাকে কি বলব বাবু, শান্তামাসি তো আগেই টাকা খেয়ে বসে আছে। ব্যস। শেষকালে জিদ্দি এসে সব মেটালো। লালবাবুকে অন্যঘরে যেতে হোল।

—জিদ্দি কে?

—এখানে মানে বেশ্যাপাড়ায় জিদ্দিরাই তো সব চালাচ্ছে। মাস্তান বাবু। মাস্তান। জিদ্দি যদি একবার বলতো লালবাবু সতীর ঘরে যাবে তাহলে সতীর সাধ্য ছিল না তাকে না করে।

—বেশ। মদন না কি যেন নাম বললে। ছেলেটিকে এ ঘরে পাঠিয়ে দাও।

রাধা চলে যেতে গিয়েও থেমে গেল। ঘুরে এসে বলল, বাবু, সতীকে একবার দেখব?

—কী হবে দেখে? তাছাড়া এখন পুলিসের কিছু কাজ আছে।

—আপনারা কি সতীকে নিয়ে চলে যাবেন?

—আবার ফেরত আসবে। পোস্টমর্টেমের পর। তুমি মদনকে পাঠিয়ে দাও।

রাধা চলে গেল চোখ মুছতে মুছতে। সোহিনী লাশের গায়ে সাদা চাদর টেনে দিয়ে

গোলাপের সামনে এসে বলল,—স্যার, দিস ইজ নো ডাউট আ মার্ডার কেস।

—তা তো বুঝলাম, এখন মুশকিল হচ্ছে, খুনটা কে করতে পারে? হয় যে লোকটির সঙ্গে ও শেষ সময়ে ছিল, অথবা লালবাবু না কি যেন নাম বলল—আউট অব হেট্রেড, সেও খুন করতে পারে।

—কিন্তু লালবাবুকে আপনি পাবেন কেমন করে? রেন্ডিকোঠিতে যে আদমি রেগুলার আসে তারও সঠিক আস্তানার পাত্তা আপনি পাবেন না। কেউই সাচ্ ঠিকানা জানায় না।

—সে তো জানি। তাই সবার অজান্তে খুন হয়ে যাওয়া একটি বারবনিতার খুনিকে খুঁজে বার করা বেশ শক্ত। অনেকটা বুনোহাঁসের পালক খোঁজার মতো।

—আমায় ডেকেছেন বাবু?

গোলাপসুন্দর মুখ ঘুরিয়ে দেখল বছর বারোর একটি ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ হাফ শার্ট হাফ প্যান্ট পরা। খালি পা।

—এসো। তোমার নাম মদন?

—হ্যাঁ বাবু। সবাই তো ঐ নামেই ডাকে।

—কেন, আর কোন নাম আছে নাকি?

—তা তো জানি না।

—বেশ। ঐ দিদিমণি—

—হ্যাঁ বাবু। সতী দিদি। আমিই তো তেনাকে প্রথম দেখি।

—তুমি বুঝতে পেরেছিলে যে তোমার সতী দিদি মরে গেছে?

—প্রথমে বুঝিনি। রোজকার মতো সকালে ডাকতে এসে—

—তখন কটা বাজে?

—আজ্ঞে বাবু ঘড়ি তো দেখিনি। তবে দিদিদের জলখাবার আনার জন্যে সব ঘরেই আমায় যেতে হয়। সতীদিদি আবার জিলিপি খেতে খুব ভালবাসতো তো, তাই রোজ সকালবেলায় সতীদির কাছ থেকে টাকা নিয়ে জিলিপি এনে দিতুম।

—এসে কী দেখলে? দরজা কে খুলে দিল?

—আজ্ঞে দরজা তো খোলাই ছিল।

—তারপর?

—দেখলুম দিদি যেন কেমনতারা হয়ে শুয়ে আছে। অনেকবার ডাকলুম। কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচালুম।

—চেঁচালে কেন?

—এমন তো কখনও হয় না। সতীদিদি খুব ভোর ভোর উঠে চান করে নিত। তারপর ঠাকুরের পুজো করতো।

—কোন্ ঠাকুর?

—ঐ তো, বাবা পশুপতিনাথ।

—চেঁচাবার পর কী করলে?

—আজ্ঞে মাসিকে খবর দিলুম। তারপর মাসি দেখে টেখে বলল সতী দিদি মরে গেছে। মদন কেঁদে ফেলল।

—ঠিক আছে মদন তুমি এখন যাও। ওপরে আর যারা আছে তাদের পাঠিয়ে দাও।

মদন চোখ মুছতে মুছতে জিগ্যেস করল,—বাবু, সতীদিদি সত্যিই মরে গেছে। আর কথা বলবে না?

গোলাপসুন্দর ঠিক কী উত্তর দেবে বুঝতে পারছিল না। সোহিনী মদনের চুলে ঝাঁকি দিয়ে বলল—নেহি বেটা। যো আদমি গুজার যাতা ওয়ো কভি ওয়াপস নেহি আতা। যা বেটা তু এখোন যা।

চম্পা আর সুজাতার কাছ থেকে তেমন কোন নতুন সংবাদ পাওয়া গেলো না। ওদের ছেড়ে দিতে দিতে নিচ থেকে রামানন্দ এসে খবর দিল হসপিটালের গাড়ি এসে গেছে। ওরা লাশ নিয়ে যেতে চাইছে।

গোলাপসুন্দর একবার সোহিনী আর একবার সুবীরের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল তাদের আর কিছু দেখার বাকি আছে কি না। দুজনেই জানালো মোটামুটি তারা সব কিছুই খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছে।

অতঃপর লাশ ছাড়ার হুকুম দিয়ে গোলাপসুন্দর শান্তামাসিকে ডেকে পাঠাল। শান্তামাসি আসতেই গোলাপ খানিকটা ধমকের সুরেই জিগ্যেস করল,—লালবাবুকে তো চেনেন? কোথায় থাকে?

লালবাবুর নাম শুনেই শান্তা একটু থতমত খেলো। তারপর ঢোকগেলা স্বরে বলল,—হ্যাঁ বাবু, চিনি। কিন্তু তার ঘর গেরোস্থালির কোন খবর দিতে পারব না। আসল ঠিকানা কেউ দেয় না বাবু।

—কিন্তু আপনার সঙ্গে তার দোস্তি ছিল।

—না বাবু। দোস্তি না। বাবুদের সাথে রেন্ডিদের কোন দোস্তি হয় না। যতদিন আমাদের জেল্লা আছে ততদিনই বাবুদের পেয়ার আছে। তারপর ফুরিয়ে যাওয়া পোড়া সিগারেটের মতো টুস্‌কি দিয়ে ফেলে দেয় বাবু।

—সতীর ঘরে যাবার জন্যে লালবাবু আপনাকে কতটাকা দিয়েছিল?

—আপনাকে কে বলল বাবু?

—যা জিগ্যেস করছি তার উত্তর দিন।

—আজ্ঞে দু হাজার টাকা।

—দু হাজার? একটা মেয়ের ঘরে এন্ট্রি নেবার জন্যে? ওর রেট কি দু হাজার?

—না বাবু। আসলে কোন মেয়েই লালবাবুকে ঠিক পছন্দ করে না। কোন মেয়েই ওকে ঘরে নিতে চায় না। আবার লালবাবুর ভারি ঝোঁক ছিল সতীর ওপর। তাই দুহাজার টাকা দিতে চেয়েছিল।

—আপনার সঙ্গে সতীর এই নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল?

—আপনিই বলুন না বাবু, বেশ্যার আবার পছন্দ-অপছন্দ কী? যে বাবু টাকা দেবে, সেই তো এক রাতের জন্যে রেন্ডিকে বিছানায় বিবি বানাবে। এটাই তো দস্তুর। সাধা লক্ষ্মী কেউ পায়ে ঠেলে? তাই সেও বলেছিল সতীকে দেখে নেবে। সত্যি বলতে কী এতো দেমাক ভালো না বাবু। আর তার ফল তো পেলি।

—তার মানে লালবাবুই সতীকে মেরেছে?

খানিকটা জিভ বার করে দু কানে আঙুল ঠেসে শান্তা বলল,—ছি ছি, এমোন কথা বলবেন না বাবু। লালবাবুর সে হিম্মত নেই। কোন মেয়েকে খুন করার মতো হিম্মত? না বাবু। আরো

একটা কথা আছে, কাল তো লালবাবু এ বাড়িতে আসেইনি।

—সেটাই তো সব থেকে বড় পয়েন্ট। আসেনি। অথচ রেগুলার আসে। এবং সেদিন এলো না যেদিন খুন হোল। হোল এমন একটি মেয়ে যে বারবারই তাকে রিফিউজ করেছে। একজন পয়সাঅলা বাবুর পক্ষে এটা কত বড় অপমানের তা নিশ্চয়ই আপনাকে বলে দিতে হবে না। কি বলেন শান্তাজি? আচ্ছা শেষ যে লোকটি এসেছিল তাকে দেখতে বললেন...

—মাপ করবেন সাহেব। কাল রাতে আমার একটু নেশামতো হয়েছিল। তাই ছেলেটার চেহারাটা ঠিক মনে নেই। তবে লম্বা চওড়া অনেকটা আপনার মতো।

—আমি নই তো?

—ছিঃ বাবুজি।

এস আই সুবীর গুপ্ত আর ইন্সপেক্টর মিস্ সোহিনী সিংয়ের হাতে কেস ডায়েরি লেখার দায়িত্ব দিয়ে গোলাপ নিজের বাড়ি ফিরে এলো। ইতিমধ্যে মর্গে বডি চলে গেছে। পোস্টমর্টেম আর ভিসেরা টেস্টিং এর পর শান্তামাসির হাতেই বডি দিয়ে দেওয়া হবে, যেহেতু সতীর এখানে কোন নিকট আত্মীয় নেই। সুজাতার সঙ্গে সতীর ভালোই বন্ধুত্ব ছিল। ওকে সামান্য জেরা করতেই ও অনেককিছু বলে দেয় যেগুলো শান্তামাসি বা অন্য কারো কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। স্টোবির দিক দিয়ে বিশেষ নতুনত্বের কিছু ছিল না। সতীর এখানে এসে ওঠা কমন্ স্টোরির মতো। মেয়েটা সুন্দরী হওয়ার দরুন লালবাবু নামে একজন ওকে চেয়েছিল। একান্ত নিজস্ব রক্ষিতা করার বাসনায় সে শান্তামাসির কাছে বেশ কিছু টাকার অফার দেয়। শান্তামাসিব দিক থেকে তেমন আপত্তি ছিল না। এককালীন থোক কিছু মোটা টাকা পেতে কারই বা অনীহা থাকবে? কিন্তু সতী মেয়েটা ছিল ভিন দেশের মেয়ে। পাহাড়ি মেয়ে। অবস্থা আর ভাগ্য আর নিজের বোকামি তাকে বারবনিতা করে তুলেছে। তার মানে এই নয় তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যে কোন পুরুষকে নিয়েই সে বিছানায় চলে যাবে। অবশ্য শান্তামাসিও সেটা চায় না। এই সুন্দরী মেয়েটাকে কুলিমজুর কি ড্রাইভার দারোয়ানদের হাতে সে কোনদিনই দিতে চায়নি। কারণ মেয়েটা অনেকটা ফুলের মতো। ফুল কি সবার হাতে সমান যত্ন পায়?

দর্শন বাদ দিলেও সতী মোটামুটি তার ইচ্ছাটাকে ধরে রাখতে পেরেছিল। অবশ্য লালবাবুর লালসার হাত থেকে সে নিস্তার পায়নি। লালবাবু ইনফ্লুয়েনসিয়াল লোক। তায় টাকার জাহাজ। একমাত্র এই লোকটার ব্যাপারে শান্তা সতীকে প্রশ্রয় দেয়নি। বাঁধাবাবু না হতে পেরে সে যখনি শান্তাকোঠায় আসে তার প্রধান টারগেট থাকে সতীর ঘর। না পেলে অন্যত্র।

লালবাবুর সতীর প্রতি লোভ থাকার জন্যে তাকে সন্দেহ করা যেতে পারে। চাওয়া পাওয়ার ব্যাপারে মেয়ে আর পুরুষের পরিণতি সব সময়ে এক হয় না। প্রকৃতিগত কারণেই জিঘাংসার প্রবৃত্তি পুরুষের বেশি। ছেলেদের কিছু মনে ধরলে বা তার প্রেমিকাকে অন্য কারো

সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ হতে দেখলে তারা জ্বলেপুড়ে যায়। সেই মুহূর্তে কাউকে খুন করা এমন কিছু অসম্ভব কাজ নয়।

নিজের ঘরে ফিরে তামান্নাকে ডেকে চায়ের অর্ডার দিয়ে গোলাপ সোফায় বসে একটা সিগারেট ধরিয়েছিল। কোন কিছু গভীরভাবে ভাবতে গেলে সিগারেটের ভূমিকাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। বেশ লম্বা একটা টান দিতে দিতে ও ভাবছিল পি এম রিপোর্ট অন্য কিছু হবার সম্ভাবনা কম। ডেথবডি জীবনে সে অনেক দেখেছে। অ্যাবনরম্যাল ডেথ সোহিনীরও অনেক দেখা। সতীর দেহে একমাত্র গলায় সামান্য কিছুর চাপ এবং ঠোঁটের কোণে শুকিয়ে যাওয়া রক্তের সূক্ষ্ম রেখা ছাড়া শরীরে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি যার দ্বারা ডেফিনিট বলা যায় সতীকে কেউ খুন করেছে। অবশ্য আরো একটা চিহ্ন ছিল। সেটা পায়ে। কোন কিছু দিয়ে পা দুটোকে বাঁধা হয়েছিল। পায়ের ভঙ্গি ছিল সিঁটিয়ে থাকার মতো। অর্থাৎ বলপ্রয়োগে সে কোন শক্ত বাঁধন আলগা করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই বস্তুটি কোথায়? বস্তুটাই বা কি হতে পারে? কোন দড়ি? অথবা নগ্ন মেয়েটির নাইট গাউন? কোন বেল্ট জাতীয় কিছু ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ আততায়ী যে কোন ভাবেই হোক মেয়েটির পা দুটি বেঁধে রাখতে চেয়েছিল। বাট হোয়াই? ইজ ইট আ কাইন্ড অব সেক্স পারভারশান? অর এনিথিং আদার দ্যান দ্যাট?

গোলাপসুন্দরের ভাবনাগুলো জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। এছাড়াও আরো একটা প্রমাণ আছে খুনের সপক্ষে। সতীর হাতের আঙুল চাদর কামড়ে ধরে থাকা। এটাও স্বাভাবিক মৃত্যুর প্রতিকূল। অবশ্য এক্ষেত্রে আরো একটি চান্স বা প্রোব্যাবিলিটির কথা কথা উড়িয়ে দিলে চলবে না। সেটা হোল সাডেন অ্যাটাক অব হার্ট।

হার্টই হোক বা সেরিব্র্যাল হোক যন্ত্রণা কিন্তু অকহতব্য। হার্ট পেইন হলে সে যন্ত্রণায় মানুষ ছটফট করতে করতে কিছু আঁকড়ে ধরতে চায়। আর সেরিব্র্যালে কোমা বা মৃত্যুর সম্ভাবনাই বেশি।

চা এসে গিয়েছিল। তামান্না চাটা ভালোই করে। চুমুক দিতে দিতে ও বলে,—রান্নাটান্না কিছু করেছিস?

—জী সাব। চাউল, ডাল, থোড়াসা ভাজি আউর আণ্ডা তরকারি।

—আণ্ডা খাইয়ে খাইয়ে তুই আমার বাত ধরিয়ে দিবি। সকালে যাবার সময়ে আণ্ডা। দুপুরে আণ্ডা। রাত্রে আণ্ডা। এর পর আমার হাতে একদিন ডাণ্ডা খাবি।

—আপ চায়ে তো মছলি কি মাংসো বনাতে পারি।

—ফ্রিজে মাংস আছে?

—জী সাব।

—ডিমটা তুই খেয়ে নিস। আমার জন্যে খুব হাল্কামশলা দিয়ে চিকেন বানা। এবেলা ওবেলা দু বেলাই যেন হয়ে যায়।

—জি।

তামান্না চলে যাচ্ছিল। গোলাপের ডাকে ঘুরে দাঁড়ায়।

—টাকা লাগবে?

—কেনো সাহাব?

—কিছু যদি আনতে হয়।

—আভি কুছ না লাগবে। আগর জরুরত পড়বে তো, লিয়ে লিবে।

তামান্না চলে গেল। বিহারের প্রত্যন্ত প্রান্ত থেকে আসা একটা গরিব হিন্দুস্থানী ছেলে। সারাদিন ফ্ল্যাটে একা থাকে। এবং তার টাকাকড়ি এদিক-সেদিক ছড়ানো থাকে। মাত্র পনেরো দিনের বিবাহিত জীবনে নয়নতারা অনেকবারই তার এই মনিব্যাগ বা খুচরো টাকাকড়ি বা যেখানে সেখানে হাতঘড়ি ফেলে রাখার ব্যাপারে অনুযোগ শুরু করেছিল। যদিও নয়নতারা নিজেও অগোছালো, খামখেয়ালি, নিজের জিনিসও নিজে ভালো করে গুছিয়ে রাখতো না। অবশ্য মেয়েলি আধিপত্য বিস্তারের লোভে আদরের শাসন ঐ পনেরো দিনের বিয়েতে মন্দ লাগতো না। কিন্তু বিয়ে, অষ্টমঙ্গলা পিরিয়ড, আর বিছানায় দু রাতের একত্র বাসে আর কতটুকুই বা মানুষ চেনা যায়। অবশ্য তারও আগে প্রাকবিবাহিত জীবনের পাঁচটি বছরও ঘোরে কেটেছে। কেটেছে নানান দ্বন্দ্বে, নানান প্রেমসঞ্জাত জটিলতায়। কিন্তু এই চূড়ান্ত খামখেয়ালিপনার র‍্যাদার হঠকারিতার কোন হদিশই তার জানা হয়নি। জানা যায়ওনি।

গোলাপসুন্দরের সমস্ত কাজের মধ্যে ডিউটি, ডিউটির জটিলতা, জটিলতা সঞ্জাত ভাবনাচিন্তার মধ্যেও নয়নতারা ঢুকে পড়ে। মাঝেমাঝেই। তখন তার খুব কষ্ট হয়। একদিকে জটিলরহস্যের জট খোলার প্রাণান্ত চেষ্টা, অন্যদিকে নয়নতারার অবিমৃশ্যকারিতা। সেই মুহূর্তে গোলাপ অস্থির। উদভ্রান্ত। বিমর্ষ।

নয়নের ভাবনা থেকে জোর করে নিজেকে সরিয়ে আনলো সতীর মৃত্যুরহস্যে। সতী একজন বারবনিতা। ধরা যাক পোস্টমর্টেম রিপোর্ট জানালো কেউ তাকে খুন করেছে। এবং সে তার তদন্তকারী সি.আই.ডি অফিসার। কিন্তু বর্তমানে সে নিজেই তো খুন হয়ে বসে আছে। এক আপাত ভদ্রমহিলার খামখেয়ালির চপারে তার ধড় থেকে মুণ্ডটা আলাদা হয়ে গেছে। এ কেসটা কি কম কিছু? নয়না মাঝে মাঝে তাকে খুনি করে তোলে। মনে মনে সে অনেকবার নয়নার বিচার করেছে। শাস্তির বিচার। এমন কিছু শাস্তি তার পাওয়া উচিত যাতে করে আর কোনদিনও কারো সঙ্গে এই হঠকারিতাব কথা ভাববে না।

হঠাৎ মোবাইলটার পিয়ানো আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল। ভিউ প্লেটে দেখল সুবীর ফোন করছে।

—হ্যাঁ বল সুবীর। এনি নিউ নিউজ?

—আপনার ঘড়ির কাচ পাল্টানো হয়ে গেছে। আমি কি যাব আপনার বাড়ি?

—তোমার এখন কোন কাজ নেই?

—তেমন কিছু নয়।

—বেশ চলে এসো। খাবে তো? তামান্নার হাতে ভাত আর মুরগির ঝোল। খারাপ করে না কিন্তু।

—চলবে স্যার। আজ তাড়াহুড়োয় আমারও লাঞ্চ হয়নি। আসছি স্যার।

মিনিট পনেরোর মধ্যে সুবীর চলে এলো। ছেলেটা ইয়াং, হ্যান্ডসাম। বোধহয় কোথাও প্রেমটেম করছে। কাজের প্রতি দরদ খুব বেশি। তবে বস্‌কে একটু তেলিয়ে চলে। হতেই পারে। প্রত্যেকেই তো একটা সিঁড়ির খোঁজে আছে। সিঁড়িটা বড় মজার। সাপলুডোর সিঁড়ি। এক লাফে সিঁড়ি বেয়ে তিনসারি ওপরে উঠে গেলে। কিন্তু তার পরই একটা তিন। তিন ফেলেছ কি মরেছ। একেবারের শেষ সারিতে। পুলিস লাইনও বড় খতরনাক লাইন। প্রোমোশান প্রোমোশান আর প্রোমোশান। বেশ চলছে ভাগ্যের খেলা। তারপর? খাতায় কলমে ডিমোশান না হলেও পাঠিয়ে দিল ধবধবির ইন্টিরিয়ারে কিংবা সুন্দরবনের আশপাশে।

পাখি ডেকে উঠল কিচিরমিচির করে। দিন দশেক হোল বেলটা লাগিয়েছে। পাশের ফ্ল্যাটের উমা বৌদি একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল পুলিসের ঘরে পাখি? গোলাপও পাল্টা উত্তর দিয়েছিল, পুলিস প্রকৃতি বা পাখিপ্রেমী হবে না এমন কথা কি কোন নীতিকথার বইয়ে লেখা আছে?

—সাহাব। তামান্না রান্না করতে করতে হাজির।

—এক বাবু এসেছে তো? যা পাঠিয়ে দে।

—সাথ এক জানানা ভি—

—বোঝ! সুবীর কী এখন প্রেমিকা নিয়েই ঘুরছে! ঠিক হ্যায় দোনোকেই ভেজ দেও।

নাহ্, প্রেমিকা নয়। সোহিনী আর সুবীর।

—কী ব্যাপার বলতো? সদলবলে হাজির। দেশে কি আর কোন ক্রাইম হচ্ছে না? বোসো।

সামনের সোফায় দুজনেই বসল। গোলাপ কয়েক সেকেন্ড সোহিনীর দিকে তাকিয়ে রইল। লজ্জিত সোহিনী বলে,—কেয়া দেখ রহা সাব, আমাকে কি নয়া দেখছেন?

—আচ্ছা সোহিনী তুমি তো পাঞ্জাবের মেয়ে?

—জী হাঁ।

—কিন্তু তোমার শরীরে পাঞ্জাবের মাটির রুক্ষতা কই? কথার মধ্যে পাঞ্জাবি টান কই?

—জী সাব। আপনি ঠিকই ধরিয়েছেন। মেরা আসলি দেশ লুধিয়ানা। লেকিন উহো সব মেরা পিতাজি দাদাজিকা জমানা। ম্যায় তো উধার সে চলা আয়া যব ম্যায় ছোটি থি। এখোন আমার সব কুছ্ এই বাংলামুলুকে। ক্যালক্যাটা ইজ মাই ওন সিটি। আউর ল্যাঙ্গোয়েজ? আমার আফসোস কি আমি আচ্ছা বাংলা বলতে পারি না। লেকিন কোশিস করি। একদিন শিখে নিব।

—তোমার সোহিনী নামটা কে রেখেছিলো?

—মেরা দাদাজি। কিঁউ কি—

—আর কিঁউ কি-ব ব্যাখ্যা করতে হবে না। তোমার মতো সুন্দরী, রূপসী মিষ্টি একটা মেয়ের নামের মধ্যে সঙ্গীতের রাগের সুর পাঞ্চিং না থাকলে মানায় না। জানো তো সোহিনী একটা রাগের নাম। তা যাক, বল, এনি নিউজ?

সুবীর পকেট থেকে ঘড়িটা বার করে এগিয়ে ধরে,—এই নিন স্যার, আপনার রিস্টওয়াচ।

—ওহ্, তুমি দেখছি একেবারে উঠেপড়ে লেগেছো।

সুবীরের ঘড়িটা ওকে ফেরত দিতে দিতে গোলাপ বলে,—ভাঙা কাচগুলো কী করলে?

—ভাঙা কাচ? ইতস্তত করতে করতে সুবীর বলে, কী হবে স্যার? সে তো সম্ভবত ফেলে দিয়েছে দোকানদার।

—ন্যাচার্যালি।

ইতিমধ্যে তিন কাপ চা আব কিছু নোন্তা বিস্কিট রেখে গেল তামান্না। চায়ে চুমুক দিতে দিতে সোহিনী বলল,—লেকিন সার, এই কেসটা আপনার কী মালুম হচ্ছে?

—পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আসার আগেই আমি বলে দিচ্ছি, ইট্স আ মার্ডার কেস। হোয়াট ডু ইউ থিং?

উত্তরটা সোহিনী দিল,—অফকোর্স। আই ডু থিং সো স্যার। ইট্স্ আ সিম্পল কেস অব হোমিসাইড। তুমি কি বল সুবীর?

—হ্যাঁ, আমারও তাই মত। এবং অনেকগুলো সারকামস্ট্যানসিয়াল এভিডেন্স আছে।

—মানলাম। বাট, হোয়াট ওয়াজ দ্য মোটিভ?

—গোলাপদা, বলেই জিভ কাটল সুবীব, স্যরি স্যার,

—নো স্যরি সুবীর। বাড়িতে তুমি আমায় গোলাপদা বলেই ডাকবে। অ্যান্ড ইউ টু সোহিনী। যা বলছিলে বল,

—একজন প্রসটিটিউট, যে কিনা ওপন ফর পাবলিক এনজয়মেন্ট, শান্তামাসির ভাবসান অনুযায়ী লাস্ট ভিজিটরের আগেও আরো দুজন সে রাত্রে সতীর ঘরে গিয়েছিল। অ্যান্ড দে আর নট ভেরি হেঁচি পেঁচি আদমি।

—কি করে বুঝলে, সোহিনী জিজ্ঞাসা করে।

—তিনতলায় যে কটি মেয়ের সঙ্গে গোলাপদাব কথা হয়েছে তারা মোটেও খেদি, পুঁটি বা কুসুমবালাদের দলে পড়ে না। তাদের ঘর, ঘরের আসবাব, টেলিভিশান, ফ্রিজ, তাদের স্ট্যাটাসকো তাদের সম্বন্ধে খানিকটা আন্দাজ দেয়। ওদের রেট কত তুমি জানো?

—সতীর রেট পাঁচশো। হঠাৎ গোলাপ বলে উঠল।

সুবীর সামান্য বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি জানেন?

—হ্যাঁ জানি। শান্তামাসির কাছ থেকেই জেনেছি।

—তাহলেই বুঝুন। একরাত্রে পাঁচশো প্লাস আরো কিছু না হলেও হ্যানো ত্যানোয় আরো দু তিনশো অর্থাৎ এলি তেলিরা ওখানে যাবে না।

—বাত তো সহি হ্যায়, সোহিনী বলে, লেকিন ইসোব দিয়ে আমরা কউন্ নতিজায় পৌঁছচ্ছি?

সিগারেট একটা কসাই মার্কা টান দিয়ে গোলাপ বলল,—আমাদের শেষ লোকটিকে দরকার।

—হ্যাঁ, শেষ লোকটিকেই দরকার কারণ তার আগেব দুজন চলে যাবার পরও সতী জীবিত ছিল। বহাল তবিয়তেই ছিল। নইলে সে তৃতীয় কাউকে এনটারটেন করতে পারে না। বাট হাউ? হাউ কুড উই ফাইন্ড আউট দ্যাট পার্টিকুলার পারশন ইন দিস বিগ সিটি?

—স্যার, কিছু বলতে চাইল সোহিনী।

—হ্যাঁ বল।

—ওই কোঠির যা সিসটেম দেখলাম, একতাল্লা দোতাল্লায় একদম খুলা দরওয়াজা। অর্থাৎ আলুওয়ালা, ভেণ্ডিওয়ালা, রিকশাওয়ালা এনিবডি ক্যান গো। তাই ধরে নিচ্ছি এগুলোর কোই রেকর্ড থাকবে না। লেকিন তিনতাল্লামে অ্যায়সা নেহি হোগা। অ্যাটলিস্ট জানপয়ছানবালা না হলে শান্তাবাড়িওলি তো অ্যালাউ করবে না।

অনেকক্ষণ সুবীর কিছু বলেনি। এবার ও বলল,—শান্তা চেনে নয়তো ওরই কোন পেয়ারের টাউট জানে। তুমি চট করে কোন সফিস্টিকেটেড ব্রথেলে ইচ্ছেমত ঢুকতে পারবে না যদি না তোমার সঙ্গে কোন টাউটের জানাশোনা থাকে। সম্ভবতও চেপে যাচ্ছে। আয়াম সিওর, দ্যাট ম্যান ইজ নোন টু শান্তা বাড়িওলি।

—আমারও তাই মালুম হোচ্ছে, ধীরে ধীরে বলে সোহিনী।

—আর কী কী মালুম হোচ্ছে, গোলাপের প্রশ্ন, এখন আমরা নিজের মধ্যে আলোচনায় বসেছি। মনে হওয়াগুলো দিল খুলে বল, গোলাপের কণ্ঠে সামান্য ঝাঁঝ।

—একবার শান্তাবাড়িওয়ালি বলেছিল কি লাস্ট আদমিকো দেখনে সে কুছ হামারা

গোলাপ সাহাবকা মাফিক। বেশ আম্‌তা আমতা করে সলজ্জভঙ্গিতে সোহিনী জানায়।

—মাফিক তর্কের ভঙ্গিতে সুবীর বলল, মানে অনেকটা দেখতে। বাট নট হুবহু। এ রকম ছ ফুট লম্বা, ছিমছাম চেহারা, দেখতে সুন্দর আরো অনেকের থাকতে পারে। এই কলকাতা শহরেই কম করে হাজারখানেক তো পাবেই।

লজ্জা পাওয়া মুখে সোহিনী বলল—জরুর থাকতে পারে। আর অ্যায়সাই হুয়া।

—হুঁ, বলে গোলাপ সামান্য গম্ভীর হয়ে বলল,—আমাদের এই মুহূর্তে দুটি লোকের খোঁজ করতে হবে। একনম্বর লালবাবু। দু নম্বর সেই ছ ফুট হাইটের লম্বা লোকটাকে। সুবীর তুমি লালবাবুর পাত্তা লাগাও। আর সোহিনী তুমি আর একটু বাজাও শান্তাবাড়িওলিকে। আমি বরং ছ ফুটের লোকটাকে দেখি কোথাও খুঁজে পাই কি না।

খাবার এসে গিয়েছিল। তদন্ত ছেড়ে ডানহাতের ব্যবস্থায় সবাই লেগে পড়ল।

দিন দুয়েকের মধ্যে খবরটা মিডিয়ার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ল ঘরে ঘরে। খুন-জখম কোন নতুন কিছু নয়। বাঁচতে গেলে জীবনে জটিলতা থাকে। থাকে হিংসা, বিদ্বেষ। তার থেকে আসে অপরাধের প্রবণতা। থাকে গোপন খুনের ঘটনা। ঘটনা যেমন সত্য তেমনি তার উদঘাটন, অর্থাৎ সত্যকে সূর্যালোকে টেনে নিয়ে আসাটাও জীবনের আর একটা মহান কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। অন্তত গোলাপসুন্দরের জীবনদর্শনটাই সেই ভাবে তৈরি। ওর গন্তব্য পথও সত্যে পৌঁছনোর পথ।

'খবর সত্য'র তরফ থেকে টিভি নিউজ কভারেজ করতে নন্দিতা দত্ত নামে একটি মেয়ে একেবারে থানায় এসে হাজির। গোলাপ তখন ছিল না। ছোট্ট একটা কাজে ব্যস্ত ছিল। কদিন থেকে সতীহত্যা নিয়ে সে বেশ চিন্তিত। পোস্টমর্টেম রিপোর্টও এখনও এসে পৌঁছয়নি। রিপোর্ট না পেলে এগুনোও অসুবিধা। সুবীর আর সোহিনী মোটামুটি নিজের মতো করেই ভেবে চলেছে। বা ওরা দুজনে সম্ভবত খোঁজখবরও শুরু করে দিয়েছে।

নন্দিতা দত্ত একাই অপেক্ষা করছিল। ওর সঙ্গে ছিল রিপোর্টার কাম ফোটোগ্রাফার অর্ধেন্দু বিশ্বাস। একটু পরেই গোলাপ এসে গেল। রামানন্দ ওদের দেখিয়ে বলল,—ইয়ে আখবার বালা আপ্‌সে মিল্‌নে আয়া।

—কিঁউ?

—কুছ পুছতাছ কে লিয়ে।

নিজের সিটে বসতে বসতে গোলাপ বলল,—আপনারা 'খবর সত্য'র তরফ থেকে আসছেন?

—কী করে বুঝলেন? আমি তো কোন কার্ডটার্ড দিইনি এখনও?

—দরকার পড়ে না। আপনার সাইড ব্যাগে যে চৌকো বস্তুটি উঁকি দিচ্ছে।

লজ্জিত নন্দিতা মাইক্রোফোনটা বার করে আনতে আনতে বলল,—আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করার ছিল। আপনিই তো সতীহত্যা কেসের ইনভেস্টিগেটিং অফিসার?

—এখনও প্রমাণ হয়নি, বলেই গোলাপ হাত তুলে ছবি তুলিয়ে অর্ধেন্দুকে বলল,—এটার কি কোন দরকার আছে?

উত্তরটা নন্দিতাই দিল, —আছে স্যাব। পাবলিক ক্রেজ। এখনকার জনসাধারণ মুখের কথায় তত বিশ্বাসী নয়। চোখে সামনে ছবি কথা বলছে শুনলে তবু খানিকটা তারা বিশ্বাস টিশ্বাস করে।

—বুঝি না। তাহলে তুলুন। হ্যাঁ যা বলছিলাম, এখনই আপনারা এটাকে খুন বলে ধরে নিচ্ছেন কেন? পি.এম রিপোর্ট কিন্তু আমরা এখনও পাইনি। তাছাড়া যে মেয়েটি মারা গেছে একজন বারবনিতা ছাডা তার অন্য কোন পরিচয় আমাদের জানা নেই। অতএব এই মুহূর্তে আপনাদের দেবার মতো কোন সংবাদই আমাদের কাছে নেই।

—রিপোর্টে যদি পাওয়া যায় মেয়েটি খুন হয়েছে তাহলে আপনারা কী ভাবে তদন্ত শুরু করবেন?

—এটা সম্পূর্ণ পুলিসের ব্যাপার। এবং তদন্তের খাতিরে আমরা বাড়ির স্ত্রীদেরও কোন গোপন সংবাদই পরিবেশন করি না। তবে তদন্ত শুরু হলে, যেটুকু জানানো সম্ভব তা জানাতে আপত্তি নেই এটা বলতে পারি।

—সতীর বাড়ির ঠিকানাটা জানতে পারি?

—আপনি যাবেন সেখানে?

—হ্যাঁ। কেন বলুন তো?

—জায়গাটা মহিলাদের পক্ষে, বিশেষ করে আপনার মতো সুন্দরী মহিলার পক্ষে নিরাপদ নয়।

নন্দিতা উঠে দাঁড়ায়। তারপর বলে,—মিস্টার বসু আমি একজন জার্নালিস্ট। এই প্রফেশানে যখন এসেছি তখন সামনে অনেক বিপদ আছে জেনেই এসেছি। সঙ্গে আমার এই ভাইটি থাকে। আর অফিস থেকে পাইয়ে দেওয়া লালবাজারের বিশেষ আই ডি কার্ডও থাকে। অবশ্য সে রকম বিপদে পড়লে ওগুলোর থেকে বেশি কাজ দেবে আমার এই মোবাইলটা।

—আপনার মোবাইল নাম্বারটা বলুন তো?

—আমার?

—ভুলে যাবেন না আমি একজন সি আই ডি অফিসার। এই নিন আমার কার্ডটাও রাখুন। আপনারটা দিন।

নন্দিতা নিজের কার্ডটা এগিয়ে দিতে দিতে বলল,—এ একদিকে ভালোই হোল। হঠাৎ বিপদে অন্তত একজন সি আই ডি অফিসারের হেল্প পাওয়া যাবে। থ্যাঙ্কু অফিসার। এই কেসটা সম্বন্ধে আমি মাঝে মাঝে আপনাকে বিরক্ত করব। ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড।

—মাইন্ড করার ব্যাপার থাকলে আপনাকে আমার কোন নাম্বারই দিতাম না। এনিওয়ে। আমায় এখুনি বেরুতে হবে।

—ওহ্ সিওর।

দিন পাঁচেকের মধ্যে সতীর পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এসে গেল। মোটামুটি গোলাপের আন্দাজ মতোই সতীর মৃত্যু হয়েছে। স্ট্যাঙ্গুলেশান। শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে। এবং সহবাসরত অবস্থায়। মেয়েটি নার্ভে হঠাৎ অ্যাটাক জনিত জার্ক পাওয়া যায়। তার অর্থ, রমনরত অবস্থায় তার মন যখন সম্পূর্ণ অন্য কিছুতে চিন্তামগ্ন ছিল সেই সময় তার গলায় কনুইয়ের চাপ পড়ে। এবং বালিশ জাতীয় কিছু বস্তুর সাহায্যে তার নিশ্বাসপ্রশ্বাসের বিঘ্ন ঘটিয়ে তাকে মারা হয়েছে। মেয়েটির শরীর আরো দুটো চিহ্নের উল্লেখ আছে। শক্ত কিছু দিয়ে মেয়েটির গোড়ালি বাঁধা হয়েছিল। মৃত্যুর আগে সে পা ছোড়ার চেষ্টা করেও অকৃতকার্য হয়। কিন্তু শরীরে সে দাগ রয়ে যায়। এ ছাড়াও ভ্যাজাইনা এবং রেকটামের দ্বারে, ঠোঁটের কোণে এবং মাথার বালিশে যে রক্তের চিহ্ন পাওয়া যায় সব রক্তের গ্রুপ একই ব্যক্তির। অর্থাৎ মেয়েটির।

এ ছাড়াও মেয়েটির হাতের মুঠোয় ছোট ছোট কয়েকটি কাচের টুকরো আটকে ছিল। মেয়েটি সে রাত্রে তিনটি পুরুষের সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হয়েছিল। মেয়েটির মৃত্যুর আনুমানিক সময় রাত বারোটা থেকে দেড়টার মধ্যে।

রিপোর্টটা সুবীরের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে গোলাপের একটা কথাই প্রথমে মনে এলো। ভাঙা কাচের টুকরো। মেয়েটির মুঠোয় কাচের টুকরো কী ভাবে এলো? তবে কি সে রাত্রে ঐ ঘরে মদ্যপানের আসর বসেছিল? কিন্তু গ্লাস ভাঙা বা বোতলভাঙার কোন দৃশ্য বা নমুনা চোখে পড়েনি। তাহলে? অবশ্য মেয়েটির বিছানায় একটুকরো কাচ পাওয়া গিয়েছিল। সেটি তার নিজের রিস্টওয়াচের ভাঙা কাচের টুকরোও হ'তে পারে।

—আচ্ছা সুবীর।

—বলুন স্যার।

—সতীর হাতের মুঠোয় কাচ ভাঙার উল্লেখ আছে। দেখেছ?

—হ্যাঁ স্যার।

—কিন্তু আমরা সেদিন কোথাও কোন ভাঙা কাচ আসার উৎস খুঁজে পাইনি।

—হ্যাঁ, স্যার। তবে বিছানায়—

—সে তো আমারই ঘড়ির ভাঙা কাচ। হাত নাড়ানাড়িতে পড়ে থাকতে পারে। যাই হোক, আমি আজ আর একবার যেতে চাই। সতীর ঘরে।

—বেশ তো। আমাদের কি যেতে লাগবে?

—নাহ্ থাক। আমি একাই যাব। বীরেশ কি ছবিগুলো দিয়ে গেছে?

—আজ সন্ধের পর নিয়ে আসবে বলেছে।

—এতো দিন সময় লাগে। ছবি পেতে? পিকিউলিয়ার। এনিওয়ে, ছবি পেলে সঙ্গে সঙ্গে

আমাকে জানাবে। সেলে। ওকে।

ওদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে গোলাপসুন্দর বেরিয়ে পড়ে। ইদানীং ওকে একা থাকায় পেয়ে বসেছে। কর্তব্যরত অবস্থায় ও পারফেক্ট পুলিস অফিসার। কিন্তু, নয়নতারা চলে যাবার পর তার অনেক হিসেবই এদিক-ওদিক হয়ে গেছে।

রাস্তায় নেমে ও প্রথমে গেল বাইকটার কাছে। বাইক নেওয়া মানেই তাকে সরকারি কাজ নিয়ে বেরুতে হচ্ছে এটা ধরে নিতে হবে। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে তার বাইক ব্যবহারের হুকুমনামা আছে। কারণ তার সরকারি পজিশানটা অনেক উঁচু জায়গায়। ইচ্ছে করলে জিপ নিয়েও সে বেরুতে পারে। আবার কিছু না নিয়েও বেরুনোর কথা ভাবল। কিছু না নিলে মানসিক খচখচানিটা কম থাকে। সরকারী উর্দি খুলে রেখে সাধারণ পাজামা পাঞ্জাবিতে নিজেকে ইদানীং ও খুঁজে পাচ্ছে। সি আই ডি অফিসার গোলাপসুন্দর বসুর ঝাঁঝালো ব্যক্তিত্ব থেকে সরে গিয়ে রবিবারের নিতান্তই ঘরোয়া গোলাপকে তার ইদানীং অনেক বেশি আপন বলে মনে হচ্ছে।

গত পাঁচ বছর সে একটা আশা নিয়ে বেঁচেছিল। নয়নতারার সঙ্গে প্রথম দেখার পর থেকে তাদের দুজনের হাল্কা থেকে গভীর রোমান্সের দিনগুলোর কথা মনে আসার পর থেকে কখন যেন সে নিজেকে নয়নতারার হাতে সঁপে দিয়েছিল। আসলে সব পুরুষই মনে মনে একটি নারীর কাছে বেমালুম নিজেকে সঁপে দিতে চায়। এটাই বোধহয় তাদের অন্যতম ভাললাগা। অবশ্য সঁপে দেওয়া মানে দাসানুদাস করে তোলা নয়। পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও নতজানু হওয়া যায়। আর সেই নত হওয়াটাই দাম্পত্যপুলক। গোলাপ তাই চেয়েছিল। তার নয়নের কাছে। কিন্তু---

—স্যার, বাইকে তেল আছে কি না ভাবছেন?

গোলাপ মুখ ঘুরিয়ে দেখল সোহিনী। এখন সে ফুলইউনিফর্মে। মেয়েটাকে শালোয়ার কামিজে কেমন লাগে কে জানে কিন্তু পুলিসের ড্রেসে বেশ ভালোই লাগে। স্মার্ট, ইয়াং অলসো। পজেসেস আ সাবলাইম বিউটি।

—ওহ্! সোহিনী তুমি? আমি একটু বেরুচ্ছি। বাইক নোব কি না ভাবছি।

—আপনি কি আজ অফ্‌ডিউটিতে আছেন?

হাসল গোলাপ।

—হাসছেন কেনো স্যার?

—তোমাদের সতীর কেসটা সলিউশানে এলেই আমি ছুটি নোব। একটানা অনেকদিনের জন্যে।

—কেনো স্যার? আপকা কিধার যানা হ্যায়?

—তা জানি না। উর্দির মোহটা কখন যে ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে সেটাই আমায় ভাবাচ্ছে। তুমি আসার জাস্ট আগেই ভাবছিলাম সি আই ডি অফিসার গোলাপসুন্দর বসু কি আবার আধময়লা পাজামা পাঞ্জাবি পরে পার্কে ময়দানে অথবা কফিহাউসে আড্ডা দিতে যেতে পারে না?

—স্যার?

—বল।

—ইউ আর রিয়েলি ভেরি রোম্যান্টিক। অ্যায়সা ড্রাই কেরিয়ারে আপকা আনা ঠিক নেহি

হয়া।

—হ্যাঁ। আরও একজন বলতো। এই সব কথাই বলতো। তখন তাকে উত্তর দিয়েছিলাম। তাকে ছাড়লেও ছাড়তে পারি, কিন্তু এই উর্দি ছাড়ার কথা ভাবতে পারি না। সেই আমি, পাজামা-পাঞ্জাবির কথা ভাবছি। আশ্চর্য নয়?

সোহিনী বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে গোলাপ আর নয়নার ব্যাপারটা জানতো। তাই চুপ করে যায়। মাথা হেঁট করে কিছু ভাবে। তারপর বলে,—জীবন মে কোই চীজ আশ্চর্যের নয় স্যার। আজ যাকে আনরিয়্যাল মালুম হচ্ছে, এক রোজ দেখবেন উস্‌সে য্যায়দা রিয়্যালিস্টিক আউর কুছ নেহি হোতা হ্যায়।

হঠাৎ গোলাপ যেন নিজেকে ফিরে পেলো। আফটার অল এখন সে আর সোহিনী দুজনেই সরকারি পোশাকে রয়েছে। অর্থাৎ পদমর্যাদার তক্‌মা গায়ের সঙ্গে সাঁটা আছে। গোলাপ সজাগ হল, সোহিনী তুমি তো সেদিন সকালে সতীকে ভাল করে পরীক্ষা করেছিলে। মেয়ে হিসেবে কি তোমার চোখে আর কিছু পড়েছিলো?

—ইয়েস স্যার। পি.এম রিপোর্ট যো কুছ বাতিয়েছে সে সব পহেলেই আমার নোটিশে এসেছে।

—অর্থাৎ সঙ্গমরত অবস্থায় মেয়েটিকে মার্ডার করা হয়েছে। বাট ইট ইজ নট রেপ কেস।

—রাইট স্যার। ব্রথেল মে কোই লেড়কি রেপ নেহি হোতা। আমরা আগে থেকে যো কুছ শোচিয়ে ছিলাম উয়ো রাইট নিকলা। এভরিথিং ইজ নোটেড ইন দ্য রিপোর্ট, অ্যাজ উই ডিসকাস্‌ড্‌ বিফোর।

—কিন্তু মেয়েটির মুঠোয় কাচের টুকরো এলো কোত্থেকে? তোমার কী মনে হয়?

—ওনলি শিশা কা টুকরা নেহি। বহুত ফাইন গ্লাস পিসেস।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, মিহি কাচ। কিন্তু কিসের কাচ? ভেবেছে?

—নেহি সার। ও গ্লাসকা টুকরা হাম তো দেখা নেহি। যদি একবার দেখা যেতো তোখন ডেফিনিট কুছ বলতে পারতাম। লেকিন—

—লেকিন?

—লেড়কিকা বিস্তারা মে যো গ্লাস পিস মিলেছিল উসকা সাথ সতীর হাত মে মিলি হুই গ্লাস একবরাবর। রিপোর্ট সেজ সো।

—কিসের হতে পারে বলে মনে হয়?

—হো স্যকতা কোই হোমিপ্যাথ মেডিসিনকা ছোটা বট্‌ল্‌ অর কোই রিস্টওয়াচ কা গ্লাস।

—ইয়েস। আমিও তাই ভাবছিলাম। সুবীরের ভাবনাও তাই। তার মানে শেষ যে লোকটি সতীর ঘরে আসে, কোনকারণে তার সঙ্গে সতীর বচসা হয়। অথবা ধস্তাধস্তি। অথবা ঐ ধরনের কিছু। হয়তো ব্যাপারটা একস্ট্রিমে চলে যেতে থাকে।

—মাইন্ড ইট স্যার, সতীর ঘরের আশপাশে আউর তিনরুম থা। কোই না কোই শোর—

—হয়তো পায়নি। তাছাড়া আমি যা বলছি অ্যাজামশনের ওপর বেস করে। হয়তো ব্যাপারটা ধস্তাধস্তির জায়গায় পৌঁছয়। এবং লোকটি হয়তো সতীকে দমবন্ধ করে মারতে চায়। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে নিশ্চয়ই সতী আততায়ীর হাত চেপে ধরে। সেটাই স্বাভাবিক। হয়তো ঘড়িটাই খাম্‌চে ধরেছিল। হয়তো মরার মুহূর্তে মেয়েটির শরীরের জোর এতো বেড়ে গিয়েছিল যে সেই চাপে আততায়ীর রিস্টওয়াচের কাচ ভেঙে তার হাতে রয়ে গিয়েছিল।

খুব মন দিয়ে গোলাপের কথাগুলো শুনছিল সোহিনী। তারপর ধীরে ধীরে বলল,—একটু আগে আপনাকে বলেছি কি ইউ আর টু মাচ রোম্যান্টিক। ভাবুক আদমি। মার্ডারকা অ্যায়সা ডেসক্রিপসান দিয়া, মালুম হচ্ছে কি আপ উস রাতমে স্পটমে থে।

গোলাপ হাসে। সোহিনী গোলাপকে লক্ষ করতে করতে ফের বলে,

—আপকা অ্যাজামশন ইজ ভেরি কারেক্ট। ভেরি মাচ লজিক্যাল। প্রোব্যাবিলিটির দিক থেকে অগ্রাহ্য করার মতো কুছ নেই।

—সেই কারণেই আমি আরো একবার যেতে চাইছি। যদি আরো কোন সলিড কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। তুমি যাবে নাকি সোহিনী?

—কিধার স্যার?

—সতীর ঘরে। যদি আর কোন প্রমাণ কিছু পাওয়া যায়।

—ওহ্ সিওর। হোয়াই নট?

—দেন, কাম অন।

সোহিনীকে পিছনে তুলে নিয়ে গোলাপ এ রাস্তা সে রাস্তা করে সোজা চলে এলো শান্তামাসির বাড়ি। সবে সন্ধে নামছে। ঘুমন্ত পাড়া ধীরে ধীরে জেগে উঠছে।

ঠিক সন্ধের মুখেই জলজ্যান্ত দুজন উর্দিপরা পুলিসের আগমন ঘটলে বিশেষ করে নিষিদ্ধপল্লীকে অস্বস্তিতে পড়তেই হয়। কারণ খবর রটতে বেশি সময় লাগে না। এ অনেকটা সেই সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে লেখা সট্যাটুটারি ওয়ার্নিংয়ের মতো। সিগারেট কোম্পানি বিজ্ঞাপনে লিখছে ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। বাক্সের গায়েও লেখা থাকছে। অথচ বড়বড় ব্যানারে টিভিতে কাগজে সিগারেট খেতে প্রলুব্ধ করে চলেছে। গেরস্তকে বলছে সজাগ থাকতে আর চোরকে বলছে চুরি করতে। যৌনকর্মীরা সরকারি লাইসেন্স নিয়ে দেহব্যবসায় নেমেছে খদ্দেরকে প্রলুব্ধ করতে। তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাজের শেষ নেই। আর যেই মুহূর্তে কোন বাবু কামপীড়িত হয়ে যদি পছন্দের জেনানার ঘরে গিয়ে ঢোকে অমনি পুলিসবাবুদের ধরপাকড় শুরু হবে। এবং, তারপর কেলেঙ্কারি বাঁচাতে ঘড়ি আংটি বোতাম নগদ যা কিছু সব পুলিসের গব্বায় বিসর্জন দিয়ে কোনরকমে অর্ধনাঙ্গা হয়ে বাড়ি ফেরা। যেন সে নিজেই চুরি করে বাড়ি ফিরছে। বলিহারী সমাজ ব্যবস্থা।

এ সত্য গোলাপ জানে। সোহিনীও জানে। আসলে সর্ষের মধ্যেই ভূত ঢুকে বসে আছে। সমস্ত সিস্টেমেই গণ্ডগোল। একটা ধরে টান মারলে অনেক টিকি ঝট্‌কান খাবে। কিন্তু ঝট্‌কানটা দেবে কে? তাই সব্বারই এক বাক্যি, যেমন চলছে চলুক। পেটে হাত পড়ে যাবে না? হ্যাপায় না যাওয়াই ভাল।

গোলাপ কোন রকমে নানান দৃষ্টি এড়িয়ে ঢুকে যায়। যদি জানাজানি হয়ে যায়, কিংবা জেনে যায় পুলিসের আগমন তাহলে আজ রাতের মতো শান্তামাসির ভাগ্য চোট। সেটাও ও চায় না।

শান্তামাসিকে কোথাও দেখা গেল না। দরকারও ছিল না। আসার সময় সতীর ঘরের চাবিও সঙ্গেই এনেছিল। সুজাতার সঙ্গে দেখা। সন্ধ্যাসাজে নিজেকে যতদূর সম্ভব রূপসী করে তোলার চেষ্টা করেছে। যদিও মেয়েটার তেমন গ্ল্যামার নেই। যেটা ছিল সতীর। কিছুটা রাধার।

এসব ক্ষেত্রে সুজাতারা কখনোই সামনে এসে দাঁড়ায় না। সুজাতাও নিজের ঘরে ঢুকে

যাবার তালে ছিল। তাকে চোখের ইশারায় দাঁড় করালো গোলাপই।

—তোমার নামই তো সুজাতা?

—হ্যাঁ সাব।

—আমায় চিনতে পারছ?

—হ্যাঁ সাব। সেদিন তো এসেছিলেন।

—তোমায় একজনের ঠিকানা যোগাড় করতে বলেছিলাম। লালবাবু।

—উনি তো আর আসেননি। সতী খুন হবার পর এ বাড়িতে খদ্দের আসা অনেক কমে গেছে সাব। ভয়ে আর কেউ আসতেই চায় না।

—হতেই পারে। তারপর থেকে তোমার এখানে চেনা খদ্দের কজন এসেছে?

—আজ্ঞে সাহেব, চেনা কি বলছেন, অচেনাই কেউ ঢোকেনি।

—তারা জানলো কী করে?

—কেন? লোকমুখে। খবরের কাগজ পড়ে।

—ঠিক আছে। আমরা এখন সতীর ঘরে একটু খোঁজাখুজি করব। কোন চেনা খদ্দের এলে বিশেষ করে লালবাবু, সঙ্গে সঙ্গে আমায় খবর দেবে। মনে থাকবে?

—হ্যাঁ সাহেব।

ওরা দুজনে আরো একবার সতীর ঘরে ফিরে এলো। দরজা ভেজিয়ে জ্বালিয়ে দিল ঘরের নিওন বাতি দুটো। ফরটি ওয়াটের দুটো টিউব।

সোহিনী যদিও পাঞ্জাবের মেয়ে, পুলিসের ট্রেনিংপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর। তার সঙ্গে আত্মরক্ষার জন্যে একটা রিভলবার আছে। সে রিভলবার চালাতে খুবই দক্ষ। এবং গোলাপসুন্দর বসু, তার সুপ্রিম বস্। তারা দুজনেই অন ডিউটিতে। এবং গোলাপসুন্দর অত্যন্ত রিলায়েবল সি আই ডি অফিসার। তবু যে মুহূর্তে ঘরে ঢুকে গোলাপসুন্দর দরজা ভেজিয়ে দিল, ডাকাবুকো মেয়ে হয়েও সোহিনীর শরীরটা নিমেষের জন্যে হলেও শিরশির করে উঠল। এটা হওয়া উচিত নয়। হবার কথাও নয়। তবু, একটি পুরুষের সঙ্গে একা থাকার চিরন্তন অস্বস্তি! আড়চোখে সোহিনী একবার গোলাপকে দেখল। নাহ্, গোলাপের মধ্যে কোন জটিলতা নেই। সে সোহিনীর দিকে একবারের জন্যেও তাকায়নি। ঘরের প্রত্যেকটা জিনিস গোলাপ তখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। অর্থাৎ গোলাপ তখন নির্ভেজাল তদন্তকারী অফিসার। মনে মনে লজ্জিত হলো সোহিনী সিং। সম্ভবত এটা তার বয়েসের সঙ্কোচ।

—সোহিনী।

—ইয়েস স্যার।

—কোন মদের গ্লাসট্লাস সেদিন তোমার চোখে পড়েছিল? অথবা কোন মদের বোতল?

—না স্যার।

—তাহলে মেয়েটির হাতের তালুতে কাচ আসে কোত্থেকে?

দেখতে দেখতে গোলাপ কাচের আলমারির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

দরজা ধরে আলতো টান দিতেই খুলে গেল। কাচের পুতুল, কাপডিস, সুদৃশ্য মদের গ্লাস, একটি আখোলা হুইস্কির বোতল। সব কিছুই আছে।

—স্যার।

—হ্যাঁ বল।

—জেনার‍্যালি কোই আদমি ওয়াইন গ্লাস কিনলে জোড় সংখ্যাতেই কিনবে। আপনি কি বলেন?

—তুমি কি বলছ সেটাই বল?

—পেয়ার মাফিকই কিনবে। ইধার ভি চার কিসিমের গ্লাস আছে। আউর সবই দো পেয়ার। লেকিন, উয়ো যো এক্সট্রা ফাইন টল হোয়াইট গ্লাসের সেট দেখছেন, উয়ো গ্লাস হ্যায় তিনটো। লেকিন হোনা চাইয়ে চারঠো।

—হাঁ। সেটাই হওয়া উচিত। তার মানে আর একটা গ্লাস ছিল। এখন নেই। এবং সেটা কোথায়? দ্যাট ইজ ইওর কোয়েশ্চেন? ইজ ইট?

—বিলকুল সহি।

—খোঁজো। খুঁজে বার করো।

কিন্তু ঐ একটি বিশেষ গ্লাস ঘরে, বাথরুমে, লাগোয়া একচিলতে বারান্দায়, কোথাও পাওয়া গেল না।

—স্যার, দেয়ার ইজ অ্যানাদার ওয়ান আন ম্যাচিং থিং।

—কী সেটা?

—জাস্ট লুক হিয়ার বলে সোহিনী কয়্যার মাট্রেসের একদিক তুলে ধরল।

গোলাপ এগিয়ে গিয়ে দেখল একটা সাদা রঙের নাইলন হ্যান্ড গ্লাভস। ভ্রূ কুঁচকে একবার নিজেদের হাত জোড়া দেখে নিল। দুজনের হাতেই গ্লাভসপরা ছিল। যদিও ফিঙ্গার প্রিন্ট অ্যান্ড ফুট প্রিন্ট নেওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু একজন বারবনিতার ঘরে পাওয়া ফুটপ্রিন্ট বা ফিঙ্গার প্রিন্ট কতটা কাজ দেবে সে সম্বন্ধে গোলাপের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু হ্যান্ডগ্লাভস তো এ ঘরে থাকার কথা নয়। এবং কোন কারণে থাকলেও সেটা ম্যাট্রেসের নিচে গোঁজা থাকবে কেন? সোহিনীর হাত থেকে ওটা নিয়ে ভালো করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে গিয়ে গোলাপের মনে হোল গ্লাভ্সটা যেই ব্যবহার করুক না কেন সেটা একটু পুরনো অর্থাৎ আগেও ব্যবহার করা হয়েছে। গ্লাভ্সটা বাঁ হাতের ব্যবহারের জন্যে। আরও খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে ওর মনে হোল দু একফোঁটা শুকনো রক্তের হাল্কা স্পট্ সম্ভবত খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। গ্লাভস্টা সোহিনীর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে ও বলল,—সেদিন এটা আমাদের নজরে পড়া উচিত ছিল। ওটা ফোরেনসিকে পাঠাবে। ওর মধ্যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট পেতে পারো। ইনসাইডে। অ্যান্ড দ্যাট ব্লাড স্পট্। ভেরি ইমপর্ট্যান্ট্।

পলিথিন মুড়ে সাইড ব্যাগে গ্লাভ্টা ঢুকিয়ে নিল সোহিনী।

—স্যার।

—হ্যাঁ বল,

—মনে হচ্ছে কি, এই রুমে আউর কুছ মিলবে না।

—চলে যেতে চাইছ?

—নো স্যার। নট অ্যাটঅল। আদার দ্যান দ্যাট মিসিং গ্লাস এভরিথিং পুলিসনে সিজ করা লিয়া। টুডে উই হ্যাভ কালেকটেড ওয়ান ইমপর্ট্যান্ট্ থিং। দ্যাট ইজ দ্যা গ্লাভ্। ডু ইউ এক্সপেক্ট্ সামথিং মোর?

—সোহিনী, একটা মার্ডার স্পট্ অনেকটা সোনার খনির মতো। কখন যে সে কোন্ সম্পদ দিয়ে দেবে তা আগে থেকে বলা যায় না।

গোলাপ হাতঘড়ি দেখল। কাচটা ঝকমক করছে। সুবীর ছেলেটা কাজের ছেলে। একদিনেই কাচটা লাগিয়ে এনেছে। দামি টাইটান কোয়ার্জ। একেবারে অরিজিন্যাল কাচ। এখন বাজে আটটা দশ।

—সোহিনী।

—বলুন স্যার।

—আমাদের বোধহয় একবার ফোরেনসিকে যাওয়া দরকার। আজ রিপোর্টটা পাবার কথা।

—ডোন্ট ওয়ারি। সুবীর ইজ ভেরি মাচ রেসপনসিবল বয়। যব সুবীর রেসপন্সিবিলিটি লে লিয়া, আপনি কুছ চিন্তা করবেন না।

—তুমি কি বাড়ি যেতে চাইছ?

—ইয়েস স্যার। ইটিজ অলসো ভেরী এসেনসিয়াল। কিঁউ কি আজ মেরা এক দোস্তকা সাদি হ্যায়। অলরেডি আয়াম লেট।

—ওহ্ সোহিনী আয়াম রিয়্যালি স্যরি। চল, আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে, ফোরেনসিক ল্যাবে যাব। আরো দু একটা কাজ সারব। দেন—

ঘরে তালা লাগিয়ে ওরা বেরিয়ে এল। তিনতলার বাকি ঘরগুলো তখন বন্ধ হয়ে গেছে। সম্ভবত মেয়েগুলো ইভনিং পার্টনার পেয়ে গেছে। হঠাৎ গোলাপ দাঁড়িয়ে পড়ল। সোহিনীর দিকে তাকালো। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। এই চাহনীতে মেয়েদের ভেতরটা শিরশির করে ওঠে। তায় গোলাপসুন্দর গোলাপের মতোই রক্তিম সুন্দর এক যুবক।

—স্যার। আপনি কি কিছু বলবেন?

—ইমিডিয়েট উই শ্যুড লিভ দিস প্লেস। ভেরি নটোরিয়াস প্লেস।

—সো হোয়াট? উস্‌মে হাম লোগোকা কেয়া? উই আর ইনভেস্টিগেটিং অফিসারস্।

—ইয়েট, নাইট ইজ ট্যু ইয়াং অ্যান্ড উই আর বোথ ইয়াং ইনাফ।

যৌবনকে একেবারেই বিশ্বাস করা উচিত নয়। লেটস্ মুভ অন, ও হ্যাঁ গ্লাভসটা আমায় দিয়ে দাও।

সোহিনীর হাত থেকে গ্লাভসের মোড়কটা নিয়ে নিজের হিপ্‌পকেটে ঢুকিয়ে নিল গোলাপসুন্দর।

—সুবীর। ইউ সুবীর! ডোণ্ড্ হিয়ার মি?

গলা শুনেই চিনতে পেরেছিল। সোহিনী পিছন থেকে চেঁচাচ্ছে। কাছে আসতেই সুবীর বলল,—সেদিন তো বড়সাহেবকে নিয়ে তোমরা গিয়েছিলে। পেলে কিছু নতুন, আই মিন

—হ্যাঁ। মার্ডার স্পটে গিয়েছিলাম। এক নয়া চিজ মিলি, বাট,

—বাট ?

ওখানে আউর এক চীজ রহেনেকো জরুরত ছিল।

—আচ্ছা সোহিনী।

—বলো।

—তুমি বাংলাটা ভালো করে শিখছ না কেন? অনেকদিন তো হয়ে গেলো এ দেশে। বলতে গেলে এখানেই তোমার ম্যাক্সিসাম বয়সটা কেটে গেছে।

—শিখবে বাবা শিখবে। বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ বহুত শক্‌ত্‌ আছে। টাইম লাগ যায়েগা।

—লাগুক। অন্তত আমার সঙ্গে যখন কথা বলবে বাংলায় বলবে।

—আচ্ছা বাবা আচ্ছা। হাম ট্রাই করেগা। লেকিন বহুত ভুল হোবে।

—তা হোক এবার বলো কী বলছিলে?

—এখোন তোমার ডিউটি অফ্ আছে তো?

—এই মুহূর্তে তেমন কোন আর্জেন্সির ব্যাপার নেই।

—চলো একটু কোথাও বসি। উইথ সাম স্ন্যাক্স্ অ্যান্ড কফি।

—খুব রোম্যান্টিক মনে হচ্ছে।

—নেহি বাবা। কোই রোমান্স কা বাত নহি। তাছাড়া তুমি হামার জুনিয়ার আছ। ছোটভাইয়ের মতো।

—ফের ?

—কেয়া! ওহ্...কহা না ম্যায় কৌশিস করুঙ্গি। তো তুমি কি এখান আমার সাথে কোফি হাউসে যাবে। আমার খুব আর্জেন্ট বাত আছে। স্রেফ তুমহার সাথে।

—তুমি কি প্রেম করার কথা বলবে?

—সাটাপ! আভি আভি তুমাকে বললাম না তুমি আমার ভাইয়ের মতো আছো। আউর তোম বাঙালি লোগোকা মগজমে প্রেম ছোড়কর দুসরা কোই মতলব নেহি আতা?

—দেখ বাঙালির নামে আলতুং ফালতুং বদনাম দেবে না। তাছাড়া প্রেম একটা অন্য ফিলিংস। তুমি কেঠেল সুন্দরী। তোমার মাথায় ওসব ঢুকবে না। তখন সাপের ছুঁচো গেলা হয়ে যাবে।

—মতলব ?

—সাপের ছুঁচো গেলা। বুঝতে পারছ না। সাপ ইঁদুর খায় বেশ মেজাজে। কিন্তু মুখে ছুঁচো পড়লেই। ছুঁচোর গায়ে তো দুর্গন্ধ। তখন না পারে ওগরাতে না পারে গিলতে। কিছু বুঝলে?

—নাথিং।

—ওই জন্যেই তো বললাম, রোজ একঘণ্টা করে আমার সঙ্গে কাটাবে। বাংলা শিখিয়ে দোব।

—শাটাপ। চল ঐ কফি হাউসে।

—এই রয়্যাল ড্রেসে?

—সো হোয়াট ?

—একে তো জনসাধারণের মনে পুলিস সম্বন্ধে ধারণা খুব খারাপ। তারপর যদি দেখে একটা ছেলে পুলিস আর একটা মেয়ে পুলিস জমিয়ে ডিউটি ছেড়ে কফি হাউসে আড্ডা মারছে।

—ইউ ননসেন্স। তোম বেঙ্গলি পিপ্‌ল্‌, কাম করেগা কোয়াটার ইন্‌চ। থিঙ্ক্‌ করেগা এক ফুট। লেকচার দেগা সাড়ে পাঁচ ফুট।

সিগারেট ধরিয়ে সুবীর বলল,—এক কাজ করো, ইমপর্ট্যান্ট্‌ কথা তো, চলো আমার বাড়ি চলো। কাছেই। আমি একাই থাকি। ব্যাচেলরস ডেন। অবশ্য তোমার যদি অসুবিধা থাকে এবং আমার ফিয়াসেঁ যদি না ফোন করে।

—তাই বলো। সিংকিং সিংকিং ড্রিংকিং ওয়াটার? মেয়েটা থাকে কোথায়?

—বোলব না।

—নো প্রবলেম। ও আমি জেনে নিব।

মিনিট দশেকের মধ্যে ওরা চলে এল। একমাত্র পুলিসি পোশাক ছাড়া সরকারি কোন কিছুই ওদের কাছে ছিল না। অবশ্য সোহিনীর কাছে সেল ফোনটা ছিল, যেটা সরকারিভাবে ব্যবহারের জন্যে দেওয়া হয়েছে।

সুবীর নিজের হাতে কফি বানালো। ফ্রিজে ডিম ছিল। ওমলেটও হল। খেতে খেতেই সুবীর সিগারেট ধরালো। খোলা প্যাকেটটা সোহিনীর দিকে এগিয়ে ধরে বলল—চলবে নাকি? লজ্জা করার কিছু নেই। এখন তো মেয়েরা খাচ্ছে।

—সাটাপ! তোম বাঙালি লোক বহুৎ ম্লেচ্ছ বনগিয়া। হামলোগ সিগারেট নেহি পিতা। উই ডোন্ট স্মোক! ফারদার অ্যায়সা অফার করেগা তো মার দুঙ্গি।

—আচ্ছা বাবা আচ্ছা! এবার বলতো কী তোমার জরুরী কথা।

কয়েক সেকেন্ড আনমনে কিছু একটা ভেবেটেবে সোহিনী বলল,—উয়ো রিপোর্ট, আই মিন ফোরেনসিক রিপোর্ট অব সতী, তুমি দেখেছ?

মুখটা সামান্য গম্ভীর হল সুবীরের। সিগারেটে একটা বিড়ি টান দিতে দিতে বলল,—হ্যাঁ দেখেছি।

—কুছ মালুম হুয়া?

—মালুম মানে, ব্যাপারটা একটু গোলমেলে।

—কী রকম?

—আরে বাবা তুমিই তো আমায় কিছু বলবে বলে তোড়জোড় করে এখানে এলাম, এখন আমার মুখ থেকে কথা বার করার ধান্দা কেন?

—না বাবা না। ইস্‌মে কুছ ধান্দা কি বাত্‌ নেহি, ওই রিপোর্টটা দেখার পর আমার কুছ শক্‌ হয়েছে। আই মিন ডাউট।

—হ্যাঁ। সেটাই বল। আমারও কিছু ধন্দ আছে! তোমারটা শুনে তারপর বলব। নাউ স্টার্ট।

—সতীকা ডেথ হুয়া ক্যায়সে? অ্যাট দ্য টাইম অব ইন্টারকোর্স। ঠিক হ্যায় তো?

—বলে যাও।

—তো ইয়ে জরুর কোই স্যাডিস্ট কা কাম। সেকস্‌ পারভার্টেড ম্যান।

—হ্যাঁ। রিপোর্ট তাই বলছে, সঙ্গমরত অবস্থায় মুখে বালিশ চাপা দিয়া মারা হয়। মেয়েটি যাতে ধস্তাধস্তি করতে না পারে সেই জন্যে তারই নাইটি দিয়ে তার পা বাঁধা হয়।

—অ্যান্ড হোয়াট্‌স্‌ অ্যাবাউট দ্যাট উন্ড? লেড়কির বডিতে অনেক জায়গায় বাইটিংসকা দাগ মিলা হ্যায়। এ বেপারে তোমার কী বক্তব্য আছে বল।

—ইটস্‌ অলসো আ পারভারসান। কিছু কিছু পারভার্টেড ম্যান আছে যারা পার্টনারকে

টবচার করে সেক্স এনজয় করে। বললাম তো লোকটা পারভারটেড। স্যাডিজম্ এর শিকার।

—এনিথিং মোর?

—তুমি বল,

—ঐ বাড়িটা মোটামুটি, আই থিঙ্ক, নামকরা রেণ্ডিকোঠি। সেই কোঠিতে একজন জাঁদরেল মউসি আছে। সাম টাউট অ্যান্ড মাস্তান লোক ভি আছে। একঠো ছোকরা আছে ফাই ফরমাস কে লিয়ে। এতো আদমি থাকতে কোই লোক দেখলো না সতীর ঘরে ওতো রাতে কে ঘুষলো? হামি একবার শান্তা মউসিকে কুছ্ ইন্টারোগেট করতে চাই।

—বেশ তো। কবে যাবে বল। আমিও যেতে পারি।

—অলরাইট। আওর একঠো পয়েন্ট। দ্যাট ব্রোকেন গ্লাস। উয়ো শিশা আই থিংক কোন ব্রোকেন গ্লাসের নয়।

—দেন?

—সুবীর, একঠো বেপার তুমি নিশ্চয় রিপোর্টে দেখেছ কি সতীর রাইট পামে শিশার টুকরা ছিল। তো উয়ো শিশা আয়া কেইসে? ইট ওয়াজ আ সাইন অব স্ট্রাগলিং। স্ট্রাগলিং টু সেভ হারসেলফ্।

—হ্যাঁ, এই ব্যাপারে আমিও মনে মনে একটা স্টোরি তৈরি করেছি। লোকটা ড্রাঙ্ক ছিল।

—হোয়াই? রিজন্ বল।

—সাধারণত একটু রঙিন মগজ না নিয়ে চট করে কেউ ও পাড়ায় যায় না। তায় লোকটি গিয়েছিল রাত বারোটার পর। ঘরে কিছু মদের বোতল পাওয়া গিয়েছিল। অবশ্য সেগুলো আলমারির মধ্যেই ছিল। এবং সে রাতে সেগুলো ব্যবহার করা হয়েছিল এমন কোন প্রমাণ আমরা পাইনি। আরও একটা গ্লাস থাকা উচিত ছিল, সেটা নেই। মানে মিসিং।

—রাইট ইউ আর, দেন?

—গদির নিচ থেকে একটা গ্লাভ্ পাওয়া যাবে কেন? আর একটা কোথায়? সাধারণত আমরা মানে পুলিসের লোকেরা যে ধরনের গ্লাভ্ ব্যবহার করি আমাদের পাওয়া গ্লাভ্স্টা সেই রকমই।

—ইসকা মতলব ইয়ে নেই যে ওই গ্লাভসটাও পুলিসের হবে। বাজারে তুমি ঐ রকম গ্লাভ্স্ হরবখ্ত পাবে।

—কিন্তু সেটা ওই খানে ওইভাবে খাটের নিচে থাকবে কেন? গ্লাভ্স কী দরকার হতে পারে?

—বেশ! আউর কুছ?

—ভাঙা কাচের টুকরোটা ইনটারেস্টিং। এখন মনে হচ্ছে একটা জিনিস আমি কালেক্ট করে ঠিকই করেছি। গোলাপদার ঘড়ির কাচের টুকরোগুলো রেখে দিয়েছি। ঘড়িঅলা বেশ অবাক হয়ে কাচগুলো আমায় ফেরত দিয়েছিল। এর একটাই কারণ। গোলাপদার রিস্টে নখের ডিপ আঁচড় দেখেছি।

ভ্রূ কুঁচকে সুবীরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সোহিনী বলল,—আচানক তুমি গোলাপদার ঘড়ির কাচ কালেক্ট করলে কেনো? তুমি কি বিশেষ কিছু বলতে চাইছ সুবীর?

—নাহ! তেমন কিছু নয়। ব্যাপারটা কেন মনে এল বুঝতে পারছি না। একটা লোক

যৌনতাড়িত হয়ে একটু বেশি রাতে সতী নামে এক গণিকার কাছে গিয়েছিল। সে একটু বেশি পরিমাণ ড্রিঙ্ক্ করেছিল। সতীও খেয়েছিল। তার ভিসেরায় মদ পাওয়া গেছে। লোকটা কোন কিছু দিয়ে মেয়েটির পা দুটি বাঁধে এবং সহবাসে লিপ্ত হয়। সম্ভবত পা বাঁধার ব্যাপারে সতীর তেমন আপত্তি ছিল না। অথবা সিরিয়াসলি নেয়নি। সহবাস চলাকালীন সতীর মুখে বালিশ চাপা দিয়া লোকটি তাকে হত্যা করে। মৃত্যুর পূর্বে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে সে আততায়ীর ডান হাত খামচে ধরে। কিম্বা ধস্তাধস্তির ফলে লোকটির রিস্টওয়াচের কাচ ভেঙে যায়। তার কিছু অংশ মেয়েটির হাতের তালুতে ঢুকে যায়। যেতেই পারে। সূক্ষ্মকাচ। এবং সেই ধস্তাধস্তির ফলে আততায়ীর কব্জিতে মেয়েটির লম্বা নখের আঁচড়ের দাগ পড়ে। এরপর আততায়ী পলাতক। পুলিস এখনও তার টিকির সন্ধান পায়নি। ঠিক আছে স্টোরিটা?

—হ্যাঁ, বিলকুল ঠিক আছে। গোলাপজিও ঠিক এই রকম একটা স্টোরি ন্যারেট করেছেন. লেকিন, তুমি একটা বহুৎ ডেঞ্জারাস কথা বলে ফেলেছ তোমার স্টোরির মধ্যে।

—না সোহিনী। আমি এখনও কোন কিছুই বলিনি। আয়াম জাস্ট থিঙ্কিং। অ্যান্ড ট্রাইং টু রিচ দ্য নিয়ারেস্ট প্লেস অব দ্য মার্ডার স্পট্। আমি কেবল ভাবছিলাম, যদিও এ ভাবনার কোন মানে হয় না, কিন্তু ভাবনাটা স্ট্রাইক করেছিল যে মুহূর্তে সতীর বিছানায় কাচের টুকরো দেখেছি আর দেখেছি গোলাপদার রিস্টওয়াচের ভাঙা কাচ। কোন কারণ নেই। তবু মনে স্ট্রাইক করেছিল। আর সেই কারণেই ঘড়ির দোকানে গিয়ে সবটা না হলেও কিছুটা কাচ সংগ্রহ করেছি। জানি না কোন কাজে লাগবে কি না। চল রাত হয়ে যাচ্ছে। তোমাকে একটু এগিয়ে দিই।

সোহিনী হাসে। ওর ফায়ার আর্মসটা বার করে বলে,—আন্ডার এস্টিমেট মাত্ করো ভাই। ম্যায় পুলিস কা লেড়কি হুঁ। ম্যায় সবকুছ ট্রেনিং লে চুকি হ্যায়। হাতমে হ্যায় এক লোডেড রিভলবার। আমি একাই যাব। ডোন্ট কাম উইথ মি।

দরজা পর্যন্ত ওকে এগিয়ে দিল সুবীর। রাস্তায় নামতেই জিগ্যেস করল,—শান্তামাসির সঙ্গে দেখা হওয়া খুব দরকার।

—আই নো ম্যান, আই নো। ডোন্ট ওয়ারি।

ফ্ল্যাট সংলগ্ন ছোট্ট ঘেরা বারান্দায় বসে একা একাই মদ্যপান করে চলেছে গোলাপসুন্দর। নয়নতারা চলে যাবার পর সে বড় একা। অন ডিউটিতে মোটামুটি ব্যস্ত থাকে। কিন্তু রাতে বাড়ি ফিরে সর্বত্রই একাকীত্ব। যদিও তাদের প্রেমের বয়েস পাঁচ বছর। বিয়ে পনেরো দিনের এবং মিলনরাত দুদিনের। তবু গোলাপসুন্দর নয়নকে ভুলিতে পারেনি। নয়নের হঠকারিতা সত্ত্বেও। একবারও চেষ্টা করেনি তাকে খুঁজে বার করতে। তার বাবা সমানে বলে চলেছেন নয়ন সুদূর লন্ডনে বসে আছে তার মাসির কাছে। গোলাপ খুব ভালোভাবেই জানে লন্ডনের

কোথাও নয়নের মাসি বলে কেউ থাকে না। থাকলে সে আগেই জানতে পারতো। এ সবই নয়নের প্যাঁচ।

বিয়ের আগে মাঝে মাঝেই তাদের মধ্যে ঝগড়া বা খুনসুটি লেগেই থাকতো। আসলে নয়নের খামখেয়ালিপনাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঝগড়ার ঘুঁটি সাজিয়ে দিত। এবং গোলাপই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার দোষ না থাকা সত্ত্বেও সে নয়নের দাবি মেনে নিয়ে শান্তি বজায় রাখতো।

কিছু একটা নয়নের নিশ্চয়ই হয়েছে। মাত্র দু রাতের মধ্যেই এমন কিছু ঘটতে পারে না যার জন্যে কোন মেয়ে তার স্বামীকে ছেড়ে চলে যেতে পারে। কোন রকম কোন কারণ না দেখিয়ে।

রয়্যাল স্ট্যাগের মাত্রা ক্রমশ চড়ছিল। কম করে হলেও পেগ পাঁচেক তো হয়েই গেছে। মদ খেতে বসলে ওর মাত্রাজ্ঞান প্রায়শই লোপ পেয়ে যায়। এবং নেশা বেশি চড়লেই ওর মধ্যে এক অন্যধরনের চাহিদা মাথা তুলতে আরম্ভ করে। চৌত্রিশ বছরের এক যুবকের রক্তে আদিম কিছু আলোড়ন শুরু হয়। একটি নারীদেহের জন্যে ভেতরটা আকুলিবিকুলি করতে থাকে। সেই মুহূর্তে ও ভুলে যায় ওর স্টেটাস। ওর সামাজিক অবস্থান। নারী দেহের তীব্র আকর্ষণ ওকে অশান্ত আর দুর্বার করে তোলে। সেদিনও কমলের বাড়িতে বসেই ওর মাথায় কয়েকশো ওয়াটের একটা ল্যাম্প জ্বলে উঠেছিল।

কমল আর বনানীর প্রথম বিবাহ বার্ষিকী। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে থাকলে ও ওর উর্দি খুলে আসে। পেগের পর পেগ মদে ডুবে যায়। শালীনতা ছাড়িয়ে অশালীন গ্রাম্য গালাগালি, যাকে 'কাঁচা খিস্তি' বলা যেতে পারে, নির্বিকার বিক্রমে সে সব আউড়ে যায়।

যদিও কমল আর বনানী তখন প্রমাদ গুণছে। বিশেষ করে বনানী। তাদের বাবা মা ভাই বোন শ্বশুর শাশুড়ির উপস্থিতে তারা তখন কোণঠাসা ভিজে সপসপে বেড়ালের মতো গুটি মেরে গেছে। মুখের ওপর গোলাপকে বেরিয়ে যেতেও বলতে পারছিল না। আবার গোলাপকে নিয়ে কোন আদিখ্যেতাও দেখাতে পারছিল না।

তবু একসময় রাত প্রায় সাড়ে এগারোটায় কমল বাধ্য হয়েছিল গোলাপকে বাড়ি চলে যাওয়ার কথা বলতে।

হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে কমলের কথা। কমল বলেছিল—প্লিজ গোলাপ। অনেক রাত বেড়ে গিয়েছে। তুই যাবিও অনেক দূর। অ্যান্ড নাউ ইউ আর টোট্যালি ড্রাঙ্ক। যাদব ট্যাক্সি ডেকে এনেছে। একবারে সোজা বাড়ি চলে যাবি। ড্রাইভারকে আমি অ্যাড্রেস দিয়ে দিয়েছি।

নাহ, গোলাপ কোন প্রতিবাদ করেনি। বনানীকে সে যতই দেখছিল ততই তার ভেতরের এক শ্বাপদ জেগে জেগে উঠছিল। আসলে সুখী কোন দম্পতি দেখলেই তার চোখ জ্বলে ওঠে। মাথা টিপ টিপ করতে থাকে। আর শরীরের মধ্যে একটা দানব তাকে খোঁচাতে থাকে। সে ভুলে যায় সে একজন ডিগনিফায়েড সি আই ডি চিফ অফিসার। ভুলে যায় তার সুন্দরী বউয়ের মুখটা। ভুলে যায় আরো অনেক কিছু। আর এই ভুলে যাওয়াটাই সে আর মনে রাখতে পারে না।

কমলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে তার যেটুকু মনে আছে সেটাও খুব স্বচ্ছ নয়। কেবল মনে পড়ছে সেই মুহূর্তে তার নয়নতারাকে খুব পেতে ইচ্ছে করছিল। তারপর ড্রাইভারকে সে কিছু একটা বলেছিল। একটা ঘোর একটা আবছা তন্দ্রায় তার মাঝে মাঝে মনে পড়ছে সে

একটা বড়ো বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ড্রাইভার ভাড়া চেয়েছিল। কিন্তু সে তাকে দাঁড়াতে বলেছিল। লোকটা আপত্তি জানাতে সে পকেট থেকে তার আইডি কার্ডটা দেখিয়েছিল। তারপর টোট্যাল ব্ল্যাঙ্ক। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। মাকড়সার জালের মতো অন্ধকারটা তার স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। এরপর তার স্মৃতিতে উজ্জ্বল আলোর মতো ভোর উঁকি দিচ্ছে। তামান্না এসে তাকে ডেকে তুলেছে। তার নাস্তা সাজিয়ে দিয়েছে। তারও আগে তার ফোন বেজেছে। থানা থেকে কনস্টেবল রামানন্দ ফোন করে সতী হত্যার খবর জানিয়েছে। সে বেরিয়ে পড়েছে তদন্তে।

এর অর্থ প্রায় রাত সাড়ে এগারোটা থেকে তার মাথায় কিছু ছিল না। আর এই মাথায় না থাকার সময়টাও কিছু একটা কম নয়। পরদিন ঘুম থেকে না ওঠা পর্যন্ত।

এটা কি একটা রোগ? একটা দীর্ঘ সময় নিজের মধ্যে নিজে না থাকা। নাকি কেউ তাকে হিপনোটাইজ করেছিল। অসম্ভব। সে একটা শক্ত-সমর্থ পুলিস অফিসার। তার মনের জোর দেদার। অন্তত দুর্বল তো নয়ই। দশ বারোজন গুণ্ডা বা ডাকাতের মোকাবিলা করতে তার বুক কাঁপে না। তাকে হিপনোটাইজ করা অত সোজা নয়। তাছাড়া করবেই বা কে? আর কেনই বা করবে?

ইদানীং মাঝে মাঝেই তার মনে হয় সে কি কোন নতুন রোগের কবলে পড়ল? বিস্মরণের রোগ? তার ছোটবেলার বন্ধু নিখিলেশ। অভিনেতা নিখিলেশ রায় । প্রায়ই বলতো স্টেজে উঠে অতি চেনা নাটকেও কোন না কোন সময়ে অন্তত একবারের জন্যে হলেও তার সব কিছু ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যায়। চোখের সামনে সব কিছুই হচ্ছে। সব কিছুই সে দেখতে আর বুঝতে পারছে কিন্তু ঠিক সময় ঠিক ডায়ালগটি তার মনে পড়ছে না। অথচ সেই সব ডায়ালগ তার কণ্ঠস্থ। বহু ডাক্তার দেখিয়েও তার এই রোগটা আজও সারেনি। অবশ্য ফিল্মের ক্ষেত্রে এটা খুব একটা প্রবলেম হয় না। কোথাও ডায়লগ আটকে গেলে বা মনে না পড়লে 'কাট' শব্দটি তার মুশকিল আসান করে।

কিন্তু গোলাপসুন্দর তার ব্ল্যাঙ্কনেসের কোন মুশকিল আসান এখনও খুঁজে পায়নি।

হঠাৎ ডোর বেলটা বেজে উঠল। ঘোর কাটতে না কাটতেই তামান্না এসে ঘরে ঢুকল,—জি কোই মেমসাব আপকা বুলাতা।

—কে, সোহিনী?

—নেহি। দোসরা কোই হোগা। ম্যায় তো পয়ছন্‌তা নেহি।

—ঠিক আছে। ডেকে নিয়ে আয়।

একটু পরে ঘরে এসে ঢুকল নন্দিতা দত্ত।

—আরে আসুন। আজ একা। আপনার ফোটোগ্রাফার বন্ধু কোথায়?

—আজ তো কোন কভারেজের জন্যে আসিনি।

—দ্যেন?

—একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে।

—বলুন।

—সতী নামে এক বারাঙ্গনা খুন হয়েছিল। পেপার তাই বলছে।

—ঠিকই বলছে। আপনিও তো 'খবর সত্য' পত্রিকায় সেই রিপোর্টই দিয়েছেন।

—হ্যাঁ দিয়েছি। তা পোস্টমর্টেম রিপোর্টও আপনারা পেয়ে গেছেন। হত্যার মোটিভ কিছু

জানতে পেরেছেন?

—এই যে বললেন কোন নিউজ কভারেজে আসেননি।

—ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে। আমরাও তাই। বিয়ে বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে গিয়েও আমরা স্টোরি খোঁজার চেষ্টা করি।

—তাহলে বলুন সেটাই আপনার এখানে আসার উদ্দেশ্য?

—পুরোপুরি না হলেও খানিকটা তো বটেই।

—পুরোপুরি নয় কেন?

—আসলে কি জানেন, আমার বন্ধু বা বান্ধবীর সংখ্যা খুবই কম। মাঝে মাঝে বড় একা লাগে। যদিও আপনি আমার বন্ধু নন। কিন্তু—

—কিন্তু?

—এই পথ দিয়েই ফিরছিলাম। একা একা। হঠাৎ বাইরে নেমপ্লেট দেখে বেল টিপে ফেললাম।

—খুব এমোশন্যাল তো?

—হ্যাঁ। বেশ খানিকটা। স্যরি। আপনাকে ডিসর্টাব করলাম। আপনার মিসেস হয়তো

—আমার তো মিসেস নেই।

—সেকী? তাহলে আপনার দেখভাল—

—তামান্না আছে। চলে যায়।

—তাহলে মিসেস করে ফেলুন। নইলে একা একা, বিশেষ করে ছেলেরা থাকতে পারে না।

—স্টোরি কভার করছেন? আমার লাইফ দিয়ে?

—নাহ্। প্লেন লাইফ। নো ডাইনামিক এক্স্সাইটমেন্ট। স্টোরি হবে না।

—হবে। আপনি আমার লাইফ জানেন না।

—বলুন। আপত্তি না থাকলে।

—সে অনেক ফ্যাকড়া। পরে বলব।

—এখন কী করছেন?

—আমি ঠিক করেছি লিভ টোগেদার করব।

—ইজ ইট? অবশ্য এখন চলটা বাড়ছে। ব্যাপারটা খুব খারাপ নয়। করে ফেলুন।

—আপনার সাপোর্ট আছে?

—ওটা ব্যক্তিগত প্রশ্নে চলে যাচ্ছে।

—স্যরি। তা আপনার কথা বলুন কিছু।

—রোমাঞ্চকর কিছু নয়। ছোটবেলায় বাবামাকে হারিয়েছি। কাকার কাছে মানুষ। গ্র্যাজুয়েশানের পর জার্নালিজম্ পড়ি। তারপর নিউজ রিপোর্টার। কোম্পানি মোটামুটি মাইনে দেয়। অ্যালাওয়েন্স দেয়। একটা মোবাইল দিয়েছে। রির্পোটারদের, বিশেষ করে যারা মোবাইল রিপোর্টার তাদের কাছে সেলফোন ইজ আ মাস্ট্। অতএব চলে যায়।

—আপনার কাকা?

—মারা গেছেন। উনি অবিবাহিত ছিলেন। আমি এখন সেই বাড়িতেই থাকি। বলতে গেলে ফ্ল্যাটের মালিক আমিই। নো আদার ওয়ারিশ।

—তার মানে নো বার্ডেন, নো দায় দায়িত্ব?

—নিজের দায়িত্ব কি কম? নিজের হাতে রান্না, জলখাবার, ঘর পরিষ্কার, সবই করতে হয়। আপনার তামান্না আছে। আমার আবার সেটাও নেই। অবশ্য আমি স্বল্পাহারী, এবং বাড়িতে খুবই আটপৌরে।

—এখন আপনি জিন্‌স্ পরেছেন। ঢাউস একটা জামা চড়িয়েছেন। সম্ভবত পিটার ইংল্যান্ড। কাঁধে একটা সাইড ব্যাগ। ব্যাগটার ওজন আছে। দেখে যা মনে হয়। এটাই কি আপনার আটপৌরে ড্রেস?

—যদিও আমি বোরডম কাটাতে এসেছিলাম, তখনও পর্যন্ত জানি না আপনি কতটা সহজ মানুষ হবেন। পুলিস ডিপার্টের বড় হর্তাকর্তা। আসলে পাত্তাই বা দেবেন কেন?

—তাহলে? কোন্ ভরসায় বাঘের ঘরে?

—ঘোগের বাসা তো বাঘের ঘরেই হয়।

গোলাপ হোহো করে হেসে ওঠে। তামান্নাকে ডাকে। তামান্না এসে দাঁড়ালে বলে, এখন সবে সন্ধে। কী খাবেন বলুন, এনি হাড অর সফ্‌ট? লজ্জার কোন ব্যাপার নেই। আপনার বয়ফ্রেন্ড আবার কিছু ভাববেন না তো?

—বললাম না আমি খুব একা। নো বয়ফ্রেন্ড।

—আই সি!

—তাবলে মিস্টার বোস। লজ্জা ঘৃণা ভয় তিনটেই আমি প্লাস্টিক ফয়েলে মুড়ে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছি এমন ভেবে নেবেন না। প্রথম দিনই আপনার সঙ্গে বসে, আই মিন ভালো করে আপনাকে চিনলামই না, হার্ড ড্রিঙ্ক নিয়ে বসে পড়ব?

—সেই জন্যেই তো হার্ড ড্রিঙ্ক্। খুব সহজেই অচেনাকে আপন করে নেওয়া যায়। আসলে রঙিন বুদবুদ দুটি মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ ঘুচিয়ে দেয়। দরাজ করে। নিমেষেই তাদেরকে কাছে আসতে সাহায্য করে।

—বেশ। তাই হোক। তবে খুব কম। আমি কিন্তু বেশি স্ট্যান্ড করতে পারি না।

দুজনেরই মস্তকতন্ত্রী তখন টং টং শব্দে বাজছে। প্রায় অপরিচিত দুই যুবক-যুবতী অচেনার দূরত্ব কাটিয়ে বেশ কাছাকাছি ঘনিষ্ঠতায় চলে এসেছে। মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে নন্দিতা একসময় প্রশ্ন করে,—আচ্ছা গোলাপসুন্দর, আপনি বললেন না তো সতী মার্ডারের মোটিভ কী?

নন্দিতার মতো অতোটা না হলেও গোলাপের মাথাও ঝিমঝিম করছে। সে বলল,—কিসের মোটিভ? কোন এক কামতাড়িত যুবক, পকেটে ভালো রেস্ত ছিল, নইলে সতীদের ঘরে ঢোকা যায় না। ছেলেটি টাকার আস্ফালনে বেশ গভীর রাতে সতীর ঘরে যায়।

—রাত কটা হতে পারে?

—পোস্টমর্টেম বলছে, সতীর মৃত্যু হয়েছে রাত দেড়টা থেকে আড়াইটের মধ্যে।

—এর অর্থ সেই ছেলেটিই, আই মিন, হত্যাকারী?

বাধা দেয় গোলাপ,—নো মিস্ নন্দিতা, আমরা এখনও সেই ছেলেটিকে হত্যাকারী সাব্যস্ত করতে পারি না। প্রথমত ছেলেটিকে আইডিন্টিফাই করা যায়নি। সে কে? কোথায় থাকে? কিছুই জানা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়ত, অন্য কেউও তাকে মার্ডার করতে পারে। কারো পার্সোন্যাল গ্রাজও থাকতে পারে। লালবাবু নামে একজন লোক সতীকে রক্ষিতা করতে চেয়েছিল। পারেনি। র‍্যাদার অপমানিত হয়েছে সতীর কাছে। সে লোকটাও খুন করতে পারে।

একজন বেশ্যার কাছে অপমানিত হওয়ার জ্বালা খুব তীব্র হয়। অবশ্য সে লোকটা সেদিন নাকি সে বাড়িতেই ঢোকেনি। তাও অত রাত্রে। আসলে পুরো ব্যাপারটাই গোলমেলে। খড়ের গাদায় হারানো আলপিন খোঁজার মতো।

—গোলাপ, আপনার কি মনে হয় আপনারা খুনিকে ধরতে পারবেন? একে এই বিশাল শহর। রেডজোনে একটি মেয়েকে খুন করে খুনি ফেরার হয়ে গেল। অথবা সে সবার সামনেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। সম্ভব কি তাকে ধরা? আপনার পুলিস কুকুরও বোধহয় পারবে না। মিসিং লিঙ্ক হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে টাইম ইজ আ গ্রেট ফ্যাক্টর।

শেষ চুমুকটা দিয়ে গ্লাস নাবিয়ে রাখতে রাখতে গোলাপ বলল,—নন্দিতা, আপনি সাংবাদিকের চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমার সঙ্গে চলে আসুন।

—হোয়াট ডু ইউ মিন?

—আপনার ভালো ইনট্যুইশান আছে, বিশ্লেষণের পদ্ধতিও ভালো। আমি রেকমেন্ড করলে আর ট্রেনিং পিরিয়ডটা শেষ করে নিতে পারলে নন্দিতা দত্তকে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট্ করে নোব। নন্দিতা, আপনি বলুন, আপনাকে সহকারী পেলে—

—ডিটেকটিভ বই পড়েন, তাই না? অথবা ইদানীং হিন্দি ক্রাইম সিরিয়াল দেখেন!

—কেন?

—ওখানে দেখেছি। একজন শক্তসমর্থ পুরুষ গোয়েন্দা অফিসারের সঙ্গে ভিড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সুন্দরী তন্বী এক কুমারী পুলিস অফিসারকে, অ্যাসিস্ট্যান্ট করে।

—ব্যাপারটা তো খারাপ নয়।

—ওরা চোর-ছ্যাঁচোড় ধরবে না রোম্যান্টিক লুকোচুরি খেলবে?

—আজকাল রোমান্স অতো সস্তা নয়। ছেলে-মেয়ে বোথ এখন অনেক বেশি সজাগ!

—কিসে সজাগ?

—দুম করে মন দেওয়া নেওয়া করার মতো বোকামি না করার।

—কিন্তু লিভ টোগেদারের মধ্যেও মনের ভূমিকা বিশাল। দেওয়া-নেওয়ার বোকামিটা সেখানেও আছে। তা নইলে সমস্ত ব্যাপারটাকে পাশবিক বলা যেতো।

—তা যেতো। কিন্তু কটা বাজে খেয়াল আছে?

একবার বাঁ হাত উল্টে দেখেই নন্দিতা হাইজাম্প করে ওঠে—কী হবে এখন?

—মানে?

—রাতে, সাড়ে এগারোটা। বাড়ি ফিরব কী করে? যতই জার্নালিস্ট হই না কেন, নির্জন অন্ধকার রাত একটি মেয়ের পক্ষে।

—ব্যস ব্যস, হাত তুলে গোলাপ বলে, আফটার অল ইউ আর মাই ফ্রেন্ড।

—উহুঁ। ফ্রেন্ডশিপ ইজ নট সো চিপ। মুখে বন্ধু বললেই বন্ধু বলা বা হওয়া যায় না। ওটা সময় এবং সিনসিয়ারিটির ব্যাপার। হ্যাঁ, গোলাপ, আপনি বলতে পারেন, আমরা বেশ পরিচিত। পরে বন্ধুত্বটা হলেও হতে পারে।

—বেশ বাবা বেশ, চলুন আমি পৌঁছে দিয়ে আসছি।

—আমাকে নাবালিকা প্রমাণ করার জন্যে?

—একটু আগেই বলেছেন নির্জন অন্ধকার রাতে একটি মেয়ে, পেশীশক্তির হ্যান্ডিক্যাপটা রয়ে গেছে না?

—এনিওয়ে, গোলাপ, উঠে পড়ুন। আপনাকেও তো আবার ফিরতে হবে।
—ভুলে যাবেন না আমার পেশার কথাটা তবে আপনার বাড়ি খোলা পাওয়া যাবে?
—যেতে পারে। নইলে পেছনের খিড়কি দিয়ে ইন্ করার ব্যবস্থা আছে।
—ওয়েল। তামান্না দরজা দিয়ে শুয়ে পড়। আমি আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব।

—আমি জানি তুই খুব আবেগপ্রবণ, খামখেয়ালি। কিন্তু তোর এই ব্যাপারটা আমি ঠিক মেনে নিতে পারছি না।

রেডিশ অরেঞ্জ রঙের দিগন্তের সূর্য তখন সামনের স্কাই স্ক্র্যাপারের পাশ দিয়ে নিচের ঢালে গড়িয়ে চলেছে। পশ্চিমের কিছুটা আকাশ জুড়ে সেই রেডিশ অরেঞ্জ যতটা পারছে তার রঙ ছড়িয়ে দিচ্ছে। এত উজ্জ্বল আলোর মধ্যেও কোথাও যেন একটা বিষাদসুর লুকিয়ে আছে।

টিয়ার কথায় নয়নতারা একবার ওর দিকে মুখ ঘুরিয়ে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে তাকাল। তারপর ফের দিনান্তের দিনেশকে দেখতে দেখতে বলল,—কাউকেই আমি কিছু মানতে বলিনি। তাছাড়া এটা সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

—সমস্যা! বল!
—নাহ, ঠিক সমস্যা বলব না। গোলাপকে আমি ভালবাসতাম।
—ভালবাসাটা কি শেষ হয়ে গেছে?
—ভালবাসার ব্যাপারটাই তো বোঝা গেল না।
—তাহলে পাঁচবছরের কোর্টশিপটা কি নিতান্তই লোকদেখানো?
—তুই তো জানিস কোন লোক দেখানো ভড়ং করে না নয়নতারা ব্যানার্জি।
—গোলাপের পদবিটাও ছেঁটে ফেলতে চাস?
—প্রথমত, এই সিস্টেমটাই খুব খারাপ। দাসত্বের নমুনা। বিয়ের পর কেবল মেয়েরাই তাদের পদবি খোয়াবে? হোয়াই নট ছেলেরা?

সাততলার ফ্ল্যাটের পশ্চিমমুখো ঝুলবারান্দায় টিয়া আর নয়নতারা মুখোমুখি বসেছিল। গোল বেতের টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম। এখন শেষ বিকেল। আজ ছমাস হ'ল নয়নতারা টিয়ার বাড়িতেই রয়েছে। মানালি হোটেলের ম্যানেজারের সহায়তায় ও সকাল নটার বাসেই চড়ে বসেছিল। নিজের জিনিসপত্রে ঠাসা ভি আই পি নিয়ে। একটু রিস্ক্ হয়ে গিয়েছিল।

নগদটাকা আর সোনার গয়নার বেশ কিছু সম্পদ তার সঙ্গে ছিল। কেউ যদি কোন ভাবে আন্দাজ করতো বিয়ের পর মাত্র দু রাত একসঙ্গে থাকার পর নববধূ হোটেল ছেড়ে পালাচ্ছে। এবং সঙ্গে বেশ বড়সড়ো একটা ভি আই পি। রাস্তায় যে কোন বিপদ হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু হয়নি। দিল্লী ফিরেও উঠেছিল অজন্তা বিশ্বাস নামে এক বন্ধুর বাড়ি। ঠিকানাটা ওর কাছে ছিল। অজন্তা অবশ্য জানতো না ওদের বিয়ের ব্যাপারটা। তবে অজন্তা বেশ ভালো

করেই জানতো তার কলেজ জীবনের এই সুন্দরী বান্ধবীটির মাথায় কিছু পোকা আছে। সেগুলো কিলবিল করে উঠলে এ মেয়েকে বাগে রাখা যায় না। তেমনি একটা কিছু ঘটেছে ভেবেই সে নয়নকে নিজের বাড়িতে তুলেছিল। পথে আসতে আসতে সিঁথির সিদুঁর তুলে দিয়েছিল। ওতে অনেক হ্যাপা। সিঁদুর থাকলেই অনেক লোকের অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হোত। অজন্তাতও কোন প্রশ্ন করেনি। তবে একবার বলেছিল তাকে নাকি খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। অনেকটা নতুন বউয়ের মতো।

বাবা-মা আর ছোটবোন রঞ্জনার আপ্যায়নের জেরে পড়ে তাকে প্রায় একসপ্তাহ ওদের বাড়িতেই কাটাতে হয়েছিল। অবশ্য তার আগেই চন্দ্রমাধব ব্যানার্জির কাছে এস টি ডি তে জানিয়েছিল কিছু কথা, কিছু আভাস। এবং জানিয়ে দিয়েছিল গোলাপ খোঁজ নিতে এলে তাকে যেন বলা হয় নয়নতারা দেশ থেকে বিদেশে পাড়ি দিয়েছে।

সপ্তাহখানেকের মধ্যে অজন্তার বাবা প্লেনের টিকিটের জোগাড় করে দিয়েছিলেন। নয়ন ফিরে এসে উঠেছিল নিজের বাড়িতে। এবং দিন পনেরোর মধ্যেই টিয়ার বাড়ি। টিয়া তার বাল্যবন্ধু।

নয়নের কথার জের টেনে টিয়া বলল—ছেলেরা যদি বিয়ের পর মেয়েদের পদবি নিজের পদবি করতে যায় তাহলে একটা টোটালি হচ্‌পচ শুরু হয়ে যাবে। বংশলতিকা ফতিকা বলে কিছু থাকবে না। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা তো আজকের নয়। সেই থেকে চলে আসছে একটা সিস্টেম। চট্ করে পাল্টানো যাবে না। তবে কিছু কিছু প্রভিন্সে পদবি ব্যাপারটাই আস্তে আস্তে উবে যেতে চাইছে। বম্বেতে একজন ফিল্ম অ্যাকটর আছে যার নাম দীপক রমন। এর কোনটাই কিন্তু পদবি নয়। তার ভাইয়ের নাম সম্পূর্ণ অন্য কিছু। তার বোনের নাম দিয়ে তাদের সম্পর্কের কোন আন্দাজই পাওয়া যাবে না। অতএব, হয়তো এমন একটা দিন আসবে, সত্যিই কারো পরিচয়ের জন্যে পদবির প্রয়োজন নাও হতে পারে। তবে চিন্তা করিস না, অতদিন আমরা কেউই বাঁচব না। অনেক সিস্টেমই এক এক করে পাল্টে যাবে। সামাজিক অনুশাসনগুলো মানুষই তৈরি করে তার জীবনধারণের কারণে। আবার সেই জীবনধারণের প্রয়োজনেই একটু একটু করে অনুশাসন পাল্টাতে থাকে। যাই হোক না কেন একদিনে পরিবর্তন কিছু হবার কথা নয়। এমনটা আশাও করিস না।

—টিয়া, আমি জানি তুই কলেজের প্রফেসর। তোর স্পেশাল সাবজেক্ট সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস। কিন্তু দোহাই, এই কচকচানি আমার একেবারেই ভালো লাগে না। লেট আস কাম টু আদার টপিক্‌স্।

—হ্যাঁ সেই ভালো। আমার বাবা-মাও কিন্তু অনেকদিন ধরেই প্রশ্নটা তুলছেন।

—আমার এখানে থাকা নিয়ে?

—অবভিয়াসলি। একটা মেয়ে বিয়ের পর প্রায় ছমাস স্বামী ছেড়ে তার বন্ধুর বাড়ি পড়ে থাকবে এটা হয় না। তুই যতই মডার্ন হোস না কেন, তোর মেয়ের ক্ষেত্র হলেও তাকেও তুই প্রশ্নটা করতিস।

নয়নতারা কয়েক মিনিট চুপ করে রইল। তারপর বলল,—তুই ঠিকই বলেছিস। আমারও ভাবা উচিত ছিল। ঠিক আছে আমাকে আর দুদিন থাকতে দে। আমি চলে যাব।

—কোথায় যাবি?

—নিজের বাড়িতে যাবার ইচ্ছে নেই। চন্দ্রমাধব ব্যানার্জিকে আমি বিব্রত করতে চাই না।

তবে বাবা আমার সব থেকে বড়ো ওয়েল উইসার। তিনি যা বলবেন হয় তো তাই হবে।

—তবু তুই আমাকে বলবি না। তোর সঙ্গে গোলাপের ঝগড়া কী নিয়ে?

—বলব। সুযোগ পেলে তোকে একদিন সব খুলে বলব। হোল তো?

—আর হোল! আমি অনেক ভেবেছি। কোন কুলকিনারা পাইনি। কি এমন কারণ যার জন্যে—

ওকে থামিয়ে নয়নতারা বলল—এই একটাই প্রশ্ন তুই হাজারবার আমাকে জিগ্যেস করেছিস।

—কী করব বল। চোর তো ধর্মের গপ্পো শুনতে ভালোবাসে না। যাক গে, যেদিন ইচ্ছে হবে বলিস। কাল আমার অনেকগুলো খাতা দেখা শেষ করতে হবে। আমি যাই। কেউ আসবে না। আপন মনে যত পারিস ভেবে যা।

টিয়া চলে যাবার পর বেতের ইজি চেয়ারটায় ও ঘাড় এলিয়ে দিল। টিয়া ঠিকই বলেছে। এভাবে কারো বাড়িতে দিনের পর দিন পড়ে থাকা বড্ড বেমানান। সে আশ্রিতা নয়। তার বাবার যা সম্পত্তি আছে তা অঢেল। এবং সে সম্পত্তির একচ্ছত্র অধিকারিনী সেই। এমন মেয়েকে কারো আশ্রিতা সাজানো যেতে পারে না। অপেক্ষাকৃত দীনদরিদ্র হলে কাজের লোক রাখার অছিলায় রাখা যেতো। কিন্তু এক ধনী আধুনিকাকে রাখা সত্যিই সমস্যা। নয়ন অবশ্য একেবারে চুপচাপ বসে ছিল না। ভেতরে ভেতরে কয়েকটা হস্টেলে থাকার জন্যে তদ্বির তদারকি এবং দরখাস্ত পাঠানো কোনটাই থেমে ছিল না। কিন্তু সব খানেই গার্জেন বলে একজন শিখণ্ডীকে দাঁড় করাতে হবে। সে বাবাই হোক বা স্বামীই হোক। মাঝে মাঝে নয়নতারা খেপে যায়। নারী পুরুষের সমান অধিকার নিয়ে যতই লাফালাফি, হাঁকডাক চলুক না কেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে মেয়েরা এখনও পুরুষমুখাপেক্ষী। একজন ছেলে এই সমস্যায় পড়লে যে কোন মেস টেসে উঠে যাওয়া তেমন কোন সমস্যার ব্যাপারই ছিল না। অথচ—

টিয়ার কাছ থেকে না থাকতে পারার হিন্ট্ পাবার পরই ও ঠিক করে নিল ও ডাইরেক্ট মুখোমুখি হবে সুপারিনটেন্ডেন্টের। জিগ্যেস করবে একজন সাতাশ-আটাশ বছরের মহিলাকে কেন পুরুষ অভিভাবকের সইয়ের অপেক্ষায় থাকতে হবে? নিজের ভালোমন্দ বোঝার বয়েস তার হয়েছে।

আজকাল নয়নতারা একা থাকলেই কিছু না কিছু ভাবনা মাথায় ঢুকে পড়ে। নিজেই সওয়াল জবাবে নিজেকেই একবার কাঠগড়ায় একবার বিচারকের আসনে নিয়ে বসায়।

গোলাপসুন্দরকে নিয়ে নিজের মনে অনেক তর্কবিতর্ক করেছে। কিন্তু বিভৎস সেই দুটো রাতের কথা চিন্তা করলেই তার ভেতরে অদ্ভুত এক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। পৃথিবীর তাবৎ ছেলেদের ওপর বাগ আর বিতৃষ্ণায় মন কুঁচকে যায়। পাঁচ বছর ধরে একটি মানুষের ওপর ধীরে ধীরে তৈরি হওয়া মায়া, মমতা, ভালোবাসা আর বিশ্বাস নিমেষে খান খান হয়ে গেল!

পাঁচবছর ধরে সুন্দর মুখের মানুষটাকে একান্ত আপন করে পাবার পর ও সত্যিই নিজেকে সুখী ভাবতে শুরু করেছিল। একটা গর্বিত ভাব। সে নিজে সুন্দরী। তার পাশে দাঁড়াবার মতো পাত্র গোলাপসুন্দর। চন্দ্রমাধব ব্যানার্জি প্রথমে আপত্তি করলেও গোলাপকে দেখার পর সকলের সঙ্গে তার নির্বাচনের প্রশংসা করেছিলেন। চন্দ্রমাধববাবু নিজে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলেন সি আই ডি অফিসার গোলাপসুন্দরের ভবিষ্যত খুবই উজ্জ্বল।

বিয়ের দিনে টিয়া কানের কাছে মুখ নিয়ে এক সময়ে বলছিল—দারুণ লোভ হচ্ছে।

ভ্রূকুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে নয়না বলেছিল—আমার বরকে নাকি?

—ঠিক তাই। দারুণ স্মার্ট, অ্যান্ড হ্যান্ডসাম। আমি মাইরি কিছুতেই এ রকম কাউকে খুঁজে পাচ্ছি না। সো লাকি ইউ আর।

অথচ গোলাপ? মানালির শীতোষ্ণ বিছানায় ও তখন গোলাপের আদরে অস্থির। নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিয়েছিল তার ভালবাসার মানুষের আদর আর সোহাগের উষ্ণতায়। বাইরের ঠাণ্ডা তখন অনেক কেটে গেছে। হৃদয়ের পরতে পরতে যখন কামনারা উষ্ণবীর্য ছড়াতে শুরু করে তখন কোন শীতই শীত নয়।

প্রথম রাতের লজ্জা কাটাতে নয়ন নিজেই বেডল্যাম্পটা নিভিয়ে দিয়েছিল। অন্ধকারে কামনাসাগরের গভীরে ডুব দিয়ে ও যখন মৎসকন্যা, ঠিক তখনই যেন বঁড়শির টান। প্রথমটা সে বুঝতে পারেনি। হঠাৎ মনে হোল গলায় যেন কিসের টান। ধীরে ধীরে শ্বাসকষ্ট বাড়ছে। অথচ গোলাপ তখন রোমাঞ্চকর পারিণতির চরম পর্যায় চলে গেছে। কিন্তু, অন্ধকারে শরীরী মিলনের স্বাদে সে যেমন আবেগ বিহ্বল ঠিক তেমনি কণ্ঠনালীতে এক অবরূদ্ধ অস্বস্তি। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। কোনরকমে সে উচ্চারণ করতে পেরেছিল, আহ্ গোলাপ, ছাড়, লাগছে আমার।

কিন্তু সেই চাপ যখন মরণ অনুভূতির কাছে এসে গেছে, কি যেন হোল, সঙ্গমরত অবস্থায় নিজের পা দুটো জোড়বদ্ধ করে সজোরে ছুড়ে দিল গোলাপের বুকে। একটা সশব্দ পতন আর আর্তধ্বনি।

হাতের কাছেই ছিল বেড ল্যাম্পের সুইচ। ঘর আলোকিত হলে সে দেখতে পেল আর এক অন্য গোলাপকে। সে ছিট্‌কে পড়ে আছে মেঝেয়। তার মুখাকৃতি দেখে আঁতকে উঠেছিল নয়ন। অস্বাভাবিক রক্তিমবর্ণ। খোলা চোখে বীভৎস শয়তানের চাহনী। জিভের ডগা দিয়ে কষের গা বেয়ে নেমে আসছে ফেনিল লালা জাতীয় কিছু। সম্পূর্ণ নগ্ন এবং জ্ঞানহীন।

স্থাণুর মতো কিছুক্ষণ বসে ছিল সে। প্রথম উত্তেজনা কাটার পর প্রকৃতির ঠাণ্ডা চেপে ধরতে শুরু করল। পাশেই পড়ে থাকা নাইটিখানা পরে নিল। ভালো করে শালটা জড়িয়ে নিতেই মনে পড়ল তার হঠাৎ শ্বাসরোধের কারণটা কী? গলায় হাত দিতেই বুঝতে পারলো সাপের মতো কিছু একটা জড়িয়ে আছে তার গলায়। টানতেই দেখল, দড়ি। গোলাপের পাজামার দড়ি।

সেই মুহূর্তে তার মাথায় অনেক কিছু ভাবনা ক্যারামের ঘুঁটির মতো এদিক ওদিক ছোটা শুরু করেছিল। অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে চেয়েছিল, প্রথম পুরুষ-মিলনের রাতে এ তার কোন্ অভিজ্ঞতা? গোলাপ তখনও অচৈতন্য। যে ভাবে পড়েছিল সেই ভাবেই পড়ে আছে। ধীরে ধীরে তার মুখ চোখের চেহারা স্বাভাবিক হয়ে আসছিল। অনেক চেনা মুখটা আবার কমনীয় হয়ে উঠছিল। দানবীয় বীভৎসতার বদলে ফিরে আসছিল সৌম্যসুন্দর সেই গোলাপসুন্দর।

কিন্তু, তার গলায় জড়ানো দড়িটা তো গোলাপের পাজামার দড়ি, সেটা খুললই বা কেন? আর তার গলায় প্যাঁচই বা দিচ্ছিল কে? গোলাপ? কিন্তু কেন? গোলাপ তো তাকে ভালবাসে। সেই ভালোবাসার নারী তার প্রথম সোহাগরাতের সহবাসী। তার গলায় দড়ির ফাঁস দেবার মতো নৃশংস তো গোলাপ নয়। তাহলে? তার মনের ভুল? কিন্তু দড়িটা বা দড়ির চাপটা তো কোন ভুল অনুভূতি নয়।

তবে কি অন্য কেউ? অন্য কেউ গোলাপের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে তার গলায় ফাঁস

দিতে চেয়েছিল?

দুর! এসব সে কী ভাবছে। সমস্ত জানলা দরজা বন্ধ। কাচের জানলার এপাশে দামি মোটা পর্দা ঝুলছে। নয়ন আবার ভালো করে তাকালো। দরজার ছিটিকিনি যেমনকার তেমনিই আছে। জানলার পর্দায় কারো কোন হাত পড়েছে বলে মনে হয় না। তাহলে?

কে তাকে মারতে চেয়েছিল? গোলাপসুন্দর? কিন্তু কেন? নাকি এ সবই তার হ্যালুসিনেসান? তার কষ্টকল্পনা?

সে রাতে সে আর গোলাপকে ডাকে নি। কেবল উঠে গিয়ে একবার নাকের কাছে হাত রেখেছিল। নাহ্! নিশ্বাসপ্রশ্বাস ঠিকই চলছে। অনেকক্ষণ মুখটার দিকে তাকিয়ে ছিলো। অজ্ঞানতা নাকি ঘুম? নাকি ঘুমের ছলনা? ঠিক বোঝা যায়নি। নয়ন একটা কম্বল চাপা দিয়ে দেয় নগ্ন যুবকের দেহে। তারপর একগ্লাস জল খেয়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ে।

এক সময় রাত ভোর হয়েছে। নয়ন আগেভাগে গিয়ে তার বাথরুম পর্ব সেরে একেবারে গীজার খুলে স্নান সেরে বেরিয়ে এসে দেখে গোলাপ সেই অবস্থাতেই মেঝেয় কার্পেটে শুয়ে রাত কাটিয়ে দিয়েছে।

নয়নই ঠেলা দিয়ে ঘুম ভাঙায়। সেদিন রোটাং যাবার প্রোগ্র্যাম। গোলাপকে জাগিয়ে দিয়ে সে বেল বাজিয়ে সকালের নাস্তা আর চায়ের অর্ডার দিয়ে আয়নার সামনে বসে। বসে বটে কিন্তু গভীর মনোযোগ দিয়ে গোলাপকে দেখতে থাকে।

আশ্চর্য! সেই দানবটা আর নেই। সেই উজ্জ্বল সকালে, কেননা কাচ ভেঙে রোদ ঢুকে ঘর ভাসিয়ে দিচ্ছিল। গোলাপকে দেখলে মনে হবে সরলমতি এক দেবযুবক। অনাবিল শান্ত নিষ্পাপ পবিত্রতা ছড়িয়ে আছে। এখনও মনে আছে গোলাপের কথাগুলো, হাই, নয়ন, গুড মর্নিং। উঠলে কখন?

প্রথমটা নয়ন থতমত খেয়ে গিয়েছিল। এই মানুষটা গতরাতে তার সঙ্গে দেহমিলন পর্বে প্রায় পশু হয়ে উঠেছিল। শুধু পশু নয়। দানব। দানবীয় হিংসায় সে বোধহয় তাকে খুনই করে ফেলতো যদি না....। অথচ এখন? আশ্চর্য সাবলীল বাচনভঙ্গি। গতরাতে কোন ঘটনা ঘটেছিল এমন কোন অভিব্যক্তিই নেই গোলাপের মুখে চোখে। অথবা শরীরের অন্যকোন উপাঙ্গে।—অত গভীর মনোযোগ দিয়ে আমার মধ্যে কি দেখছ?

আবার বিস্ময় লাগে নয়নের। গোলাপ কি নির্লজ্জ, নাকি শয়তান, নাকি গভীর কোন অসুখে অসুস্থ? যেন কিছুই হয়নি এমন একটা মুখ নিয়ে তাকে সুস্থ সাধারণ মানুষের মতো প্রশ্ন করেছে!

ব্রাশে পেস্ট নিতে নিতে গোলাপ আবার জিজ্ঞেস করে,—নয়ন, এনিথিং রং? কী হয়েছে তোমার? অফ্‌মুড? দেন টেল মি হোয়াটস্ দ্য রং উইথ ইউ?

নাহ, গোলাপ কোন নাটক করছে না। নাটকের কোন অভিব্যক্তিই ওর মুখে নেই। বড় দোনামোনায় ফেলে দিল নয়নকে। কোন কিছুই হয়নি এমন একটা ভাব নিয়ে নয়ন বলল, —ও কিছু নয়। মাথাটা বড্ড ধরেছে। তুমি রেডি হয়ে নাও। বাস কিন্তু নটায় ছাড়বে।

—ডোন্ট ওয়ারি, বলে গোলাপ বাথরুমে ঢুকে গেল। তারপর সারাদিনের বাসজার্নি। ধীরে ধীরে নয়ন রাতের সব কিছুকেই দুঃস্বপ্ন ভেবে প্রকৃতিকে গায়ে মেখে অনমনস্ক হতে চেয়েছিল। ধীরে ধীরে নয়ন স্বাভাবিক হয়েও গিয়েছিল। এবং গোলাপের মনে কোন অস্বাভাবিকতাই ছিল না।

তবু একটা আতঙ্ক নিয়ে সে দ্বিতীয় রাতে শুয়ে পড়েছিল মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণার কথা জানিয়ে। কিন্তু সদ্য বিবাহিত দুই নরনারী। একই উষ্ণ বিছানায় কতক্ষণই বা সুশীল বালক বালিকা হয়ে থাকতে পারে।

এবং, তারপর আরো অনেক, অনেক পরে সেই দানবীয় নৃশংস হাত দুটো গত রাতের মত মরণ খেলায় লিপ্ত হতে চাইছিল। নয়ন ছিল সজাগ। ঘরে আজ আলো জ্বালানোই ছিল। নয়ন স্পষ্ট দেখলো রতিক্রিয়া শুরুর কয়েক মিনিট পরই শান্ত সুন্দর মানুষটা কেমন যেন পাল্টে যাচ্ছে। তার চুলগুলো সব খাড়া হয়ে গেছে। মুখে কে যেন গরম উত্তাপ ছড়িয়ে দিয়েছে। চোখদুটো আগুনের ভাটা। প্রেমদংশনের নামে যে দংশন শুরু হয়েছিল সেগুলো একজন মহিলাকে রক্তাক্ত করার পক্ষে যথেষ্ট। দ্বিতীয় রাত্রে নয়ন সজাগ ছিল। তার মনে হচ্ছিল গোলাপের তাৎক্ষণিক আচরণ একেবারেই স্বাভাবিক নয়। শৃঙ্গার মুহূর্তে নরনারী উভয়ের মধ্যে চাঞ্চল্য আসে। আসবেই। তাৎক্ষণিক ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া সাধারণ অবস্থা ছাপিয়ে অন্য কোন জায়গায় পৌঁছয়। কিন্তু সে অস্বাভাবিকতা খুবই স্বাভাবিক। সেটা কামোন্মাদনা। নয়নের অভিজ্ঞতা না থাকলেও সেক্স এডুকেশান ছিল। প্রথম রাতে তার মনে হয়েছিল গোলাপ নিশ্চয় এমন কিছু নেশা করেছে যা তাকে সহবাসকালে উন্মাদ করে তুলেছে। সেই মুহূর্তে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলেছে। তারপর মাত্র একটি ধাক্কাতেই গোলাপ তার জ্ঞান হারায়। এর অর্থ কী? তার কি সেই মুহূর্তে মস্তিষ্কের কোষে জড়িয়ে থাকা নেশার কাজ শেষ হয়ে গেছে। এবং মজার কথা ঐ ধাক্কার পরেই সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়েছে। এবং পরদিন সকালে সে একেবারেই নরম্যাল। তবু তার কিছু সন্দেহ ছিল নিজের ডিডাকশানে।

পরীক্ষা ছিল দ্বিতীয় রাতে। ঠিক গতরাতের পুনরাবৃত্তি। একসময় অর্থাৎ উত্তেজনার পারা যত চড়তে শুরু করছিল মানুষটা ততই হিংস্র হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছিল। এবং শেষ পর্যন্ত গত রাতের মত কোন একসময় তার নিজের পাজামার দড়ি খুলে নয়নের গলায় প্যাঁচ জড়াতে চেয়েছিল। এবং, সজাগ নয়নের, আগের রাতের মতোই সজোরে জোড়পায়ে বুকে লাথি এবং সেই অবস্থায় গোলাপের জ্ঞানহারানো। ঠিক গতরাতের প্রতিচ্ছবি।

মানালির ঐ শীতের রাতেই যদি সম্ভব হোত নয়ন হোটেল রুম ছেড়ে বেরিয়ে আসতো। কিন্তু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে, রাত সবে বারোটা পাঁচ। লম্বা শীতের রাত, শেষ হতে তখনও অনেক বাকি।

একবার তাকিয়ে গোলাপকে দেখেছিল। গুটিশুটি মেরে বিছানার এককোণে। বোঝা যায় সে তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। যেন কারো ডাকই তখন তার কানে যাবে না।

আজ এখন টিয়ার বাড়ির ছ'তলার ঝুলবারান্দায় বসে নিচের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল কর্মব্যস্ত শহর কলকাতা। বিশাল একটা জনপ্রবাহ ছুটছে। ঐ ছোটা বাঁচার কারণেই। কে কত সুখে বাঁচতে পারে তার জন্যে ইঁদুর দৌড়ের খেলায় মেতেছে এই ব্যস্ততম শহরটা।

সে রাত্রে নয়ন আর কিছু ভাবতে চায়নি। তার মনে তখন ছিল একটাই প্রশ্ন, গোলাপের কাছ থেকে পালাতে পারবে তো? যেমন করেই হোক, গোলাপের ঘুম ভাঙার আগেই তাকে মানালি ছেড়ে চলে যেতে হবে। যত শীঘ্র সম্ভব পৌঁছতে হবে চণ্ডীগড় অথবা আম্বালা। সেখান থেকে দিল্লি।

হ্যাঁ এক সময় সে ফিরে গিয়েছে দিল্লি। গোলাপকে একটা চিঠি লিখে। কোনরকম দোষারোপ না করেই সে গোলাপকে মুক্তি দিতে চেয়েছে।

কিন্তু ছমাস সময়টা একেবারে কম সময় নয়। এই ছমাসে, মনে রাখবো না ভেবেও গোলাপকে ভোলেনি। আরো অনেক চিন্তার পর তার মনে হয়েছে, গোলাপ নিশ্চয়ই অসুস্থ। হয়তো কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। আচ্ছা কোন ভালো সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে আলোচনা করলে কেমন হয়। ওতো ভালোও হয়ে যেতে পারে। কোন অসুস্থ স্বামীকে কোন স্ত্রীরই কি এ ভাবে ত্যাগ করা উচিত?

হ্যাঁ সে তাই করবে। আর এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে পারে তার সাইকিয়াট্রিস্ট বন্ধু অম্লান সেনগুপ্ত। অবশ্য অম্লান ঠিক তার বন্ধু নয়। ও গোলাপের সঙ্গে একসঙ্গে প্রেসিডেন্সিতে পড়েছে। এবং বিয়ের অনেক আগে থেকেই গোলাপই নয়নতারার সঙ্গে অম্লানের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। নয়নতারা ভাবল একমাত্র অম্লানকেই সব কিছু খুলে বলা যেতে পারে।

গোলাপকে ছেড়ে আসতে তার প্রথম দিন তেমন কষ্ট হয়নি। তখন মনে হয়েছিল, এই নরপশুটির হাত থেকে সে কী ভাবে বাঁচবে। একমাত্র নিজেকে বাঁচানো ছাড়া তার আর কোন চিন্তাই ছিল না। কিন্তু তার পর ছমাস কেটে গেছে। সময় সব জ্বালাই একসময় প্রশমিত করে।

গত ছমাস একা একা থাকতে থাকতে নয়নের মনে হয়েছে, তার কোথাও ভুল হচ্ছে না তো? এমনিতে মানুষটা ভালো। খুবই ভাল। কথাবার্তা চালচলন, সবেতেই ও রোম্যান্টিক। অথচ সেই মানুষটাই। নয়নের এখন মনে হয় ও অসুস্থ। এবং সেই অসুস্থতা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। এ কী অসুখ সেটা তার জানা নেই। অম্লান নিশ্চয়ই বলতে পারবে গোলাপ আদপেই কোন অসুখে ভুগছে কি না। আর এটা যদি কোন অসুখ হয় তাহলে নিশ্চয়ই তার কোন ওষুধ আছে। নিরাময়ের রাস্তা আছে।

গত ছমাসে নয়ন ইচ্ছে করেই তার কোন খবর রাখেনি। সম্ভবত গোলাপ তার বাবার কাছ থেকে জেনেছে নয়ন এখন লন্ডনে তার মাসির কাছে। সম্ভবত গোলাপ তা বিশ্বাস করেনি। কারণ লন্ডনে তার কোন মাসির কথা সে কখনোই গোলাপকে জানায়নি। আর গোলাপ যা সেন্টিমেন্টাল ও কিছুতেই চেষ্টা করবে না নয়ন কোথায় আছে সেটুকু খুঁজে বার করতে। নয়ন এখন বড় দোটানায়। ঠিক কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। তবে এটা ঠিক সে কিছুতেই গোলাপের সঙ্গে মেলবন্ধনে যাবে না। যতক্ষণ না জানা যাচ্ছে ও ঠিক কোন্ অসুখে ভুগছে।

—তুমি খুব ভালো করেই জানো শান্তা মউসি, পুলিশের কাছে ঝুট বোলনেসে আখেরে রেজাল্ট আচ্ছা হয় না। আমায় সাচ্ সাচ্ বাতাও, উস্ রাত মে কেয়া হুয়া।

সাধারণত দুপুরের দিকে নিষিদ্ধ পল্লী একটু ঝিমিয়ে থাকে। এই ঝিমুনিটা শুরু হয় সকাল থেকে। গত রাতের উচ্ছৃখলতা আর প্রেমহীন সহবাসে এবং নিষ্ফল রতিতে এখানকার মেয়েরা শরীরে এবং মনে ক্লান্ত হয়ে থাকে। এও এক ধরনের খোয়ারি। যেটা ভাঙতে ভাঙতে দুপুর

গড়িয়ে যায়। অবশ্য যারা একেবারেই রাস্তায় দাঁড়ানো মেয়ে, তাদের সকাল থেকেই শুরু হয়ে যায় সেজেগুজে ছোট ছোট গলির মুখে দাঁড়িয়ে যাওয়া। এরা যে প্রতিদিনই তাদের একরাতের খদ্দের পায় তা ঠিক নয়। এ এক আজব জায়গা। সতীর মতো মেয়েদের জন্যে ধনী যুবকেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। কেউ কেউ চায় তাদের সব রূপযৌবনকে সম্পূর্ণ নিজের জন্যে কিনে রাখতে। সতীদের কখনও কখনও তিনচারজনকেও মনোরঞ্জন করতে হয়। আবাব বাস্তার দাঁড়ানো চামেলি কি শেফালিদের কোন কোন দিন ঠ্যালা বা রিকশাওলাও জোটে না। ক্লান্ত অবসন্ন দেহটা নিয়ে তারা অসুখী ঘুমে রাত কাটায় পরের দিন ভোরের আশায়।

ফুল ইউনিফর্মে সুবীর আর সোহিনী তাই দুপুরটাকেই বেছে নিয়েছে। ওদের দুজনেরই মনে হয়েছে শান্তামাসি নিশ্চয়ই কিছু লুকোচ্ছে। সতী খুনের রাতের সব ঘটনা না হলেও কিছু কিছু প্রয়োজনীয় ঘটনা সে জানে। সম্ভবত পুলিসি হ্যাপায় জড়াতে চায় না বলেই হয়তো না জানার ভান করে চলেছে। তাদের একান্ত করে জানা দরকার সতী খুনের রাতে সতীর শেষ নাগর কে ছিল? তার পরিচয় কী? সে থাকে কোথায়? আগে সে কোনদিন এসেছে কি না? অন্তত কিছু একটা সূত্র যা দিয়ে খুনির কাছাকাছি পৌঁছনো যায়।

—ইন্সপেক্টর দিদি আমি তো সেইদিনই আপনাদেব জানিয়েছিলুম সেদিন সন্ধেবেলা থেকেই আমার তবিয়ত ভালো ছিল না। তাই, রাতে একটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়েছিলুম। তারপর কী হয়েছে তা বলতে পারব না।

সুবীরের চাপা চিৎকার, যেটা বেশ কর্কশই শোনালো—শান্তাজি, তুমি মিথ্যে কথা বলছ।

—না বাবু। ঝুটমুট্ কেনো মিথ্যে কথা বলব? এতে আমার কী লাভ আছে বলুন?

—তুমি ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলে? সেদিন তো বলনি। কই দেখি কী ওষুধ?

—সে প্যাকেট কি রেখে দিয়েছি? খাবার পর ফেলে দিয়েছি।

—কে দিয়েছিল ঘুমের ট্যাবলেট?

—ডাক্তারবাবু।

—ইউ আর লায়িং, প্রায় ধমকের সুরে সোহিনী ওকে বাগে আনতে চাইল, তোম ঝুট বোলতা। তোমাদের এখানকার ডাক্তার সাহেবকে আমি চিনি। ডাক্তার বাদল সেন তো?

—হ্যাঁ দিদি।

—এখানে আসার আগে উনার সঙ্গে আমি দেখা করে এসেছি। সে রাতে তুমার কিছুই হয়নি। কোন ডাগদারকেই তুমি দেখাওনি। তাছাড়া উনি বললেন তোমার শরীরে কি সব ট্রাবল আছে। যখন তখন নিদ্‌কা গোলি দেওয়া যাবে না।

—কিন্তু দিদি—

ওর কিন্তু কিন্তু স্বরটাকে থামিয়ে দিয়ে সোহিনী বলে,—আমরা জানি কি সে রাতে লাস্ট যো আদমি সতীর ঘরে এসেছিল তুমি তাকে দেখেছো। আউর তাকে তুমি চিনো। আমাদের কাছে সাচ্‌বাত্ বললে এক কাতিল আইনের কাছে সাজা পেতে পারে। কেয়া তোম ইয়ে নেহি চাতা?

—আর, সুবীর পাশ থেকে বলে উঠল, জেনেও যদি মিথ্যে কথা বল বা কাউকে আড়াল করার চেষ্টা কর, খুনের কেসে তোমাকেও আমরা জড়িয়ে দিতে পারি। সেটা কি তোমার পক্ষে ভালো হবে?

শান্তা কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। একদিকে সেন্টিমেন্ট। অন্যদিকে জেলে

যাবার হুমকি।

—কেয়া শোচ্‌তি হ্যায়?

—না মানে বিশ্বাস করুন, লোকটাকে আমি চিনি না। আগে কোনদিন দেখিনি, তবে

—তবেটা কী?

—আপনারা যদি রেগে যান—

—কেন? রাগবো কেন? তুমি সত্যি কথা বল, তোমার কোন ভয় নেই। আমরা সত্যিটাই জানতে চাই।

সামান্য ইতস্তত করার পর মরিয়া হয়ে বলে ফেলল, —ঐ সাহেব যদি জানতে পারে—

—কোন সাহেব, ধমকে উঠল সুবীর।

খুব করুণ দৃষ্টিতে ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বলে ফেলল—আপনাদের বড়া সাহেব।

—কেয়া বোলা? বড়া সাহেব, ইউ মিন—

—না দিদি, সে কথা নয়, যিনি এসেছিলেন তাকে দেখতে ঠিক আপনাদের ঐ সাহেবের মত। ঐ এক চেহারা। হাবভাব সব একই রকম। জুড়ুয়া ভাই কি না বলতে পারব না।

—জুড়ুয়া ভাই? চালাকি পেয়েছ?

—না সাহেব, চালাকি না। ঠিক আপনাদের বড়োবাবুর মতো দেখতে।

—কথাটা মিথ্যে হলে কী হবে জানো?

—সাহেব, আমি তো কারো নাম বলিনি। তবে একই রকম দেখতে দুজন মানুষ তো আছে পৃথিবীতে।

—এর আগে ঐ লোকটা এখানে এসেছিল কোনদিনও?

—ঠিক বলতে পারব না। তবে আমি দেখিনি।

—সে রাতে আর কে কে তাকে দেখছে?

—তাও বলতে পারব না সাহেব। আপনি আর সবাইকে জিগ্যেস করুন।

—কী জামাকাপড় পড়ে এসেছিল মনে আছে?

—যদ্দুর মনে পড়ে কালো রঙের পাঞ্জাবি আর চোস্তা পড়েছিল। পায়ে সাদা রঙের নাগরা স্লিপার। পাঞ্জাবির ঝুলটা খুব লম্বা ছিল। এখন সবাই যেমন পড়ে। হাই নেক।

—আর?

—খুব মদ খেয়েছিল। পা টলছিল।

—রাত তখন কটা?

—ঠিক কটা বলতে পারব না। সাড়ে বারোটা কি একটা হতে পারে।

—আচ্ছা শান্তাজি, এবার সোহিনী প্রশ্ন করে, খুব ভালো করে ইয়াদ করো, লোকটা কি সিধা সতীর ঘরে গিয়েছিল, নাকি দুসরা কারো ঘরে প্রথমে গিয়েছিল?

—আপনি বিশ্বাস করুন দিদি, সত্যিই আমি সে রাতে ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলুম, তাই অতরাতে আমার চোখেরও ঠিক ছিল না। তবে যদ্দুর মনে পড়ে সতী ছাড়া আর কারো ঘর তখন ফাঁকা ছিল না। লোকটা বোধ হয় ওই ঘরেই ঢুকে পড়ে।

—বোধ হয়?

—বললুম না, চোখে তখন ঘুম থিকথিক করছিল,

—ননসেন্স, বলে সুবীর বলল, আমাদের আসার কথা আপাতত কাউকে জানানোর দরকার নেই। এমনকি বড়সাহেব এলেও তাকে জানাবে না। বুঝেছ?

শান্তার আর ভালো লাগছিল না, পুলিসের হ্যাপা। পুলিস মানেই নানান ঝামেলা আর গ্যাঁটগচ্চা। তাই ভালোমানুষের মতো সবেতেই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে খালাস পেতে চাইল। আর কিছুক্ষণ পর থেকেই খদ্দেরের আসা শুরু হবে। আজকাল আবার বিকেল থেকেই ভদ্রলোকের ছেলেরা উঁকিঝুঁকি মারে। কোনরকমে যদি রটে যায় তার বাড়িতে পুলিস বসে আছে, ব্যস আজকের মতো শেষ। একে তো সতী মরে খদ্দের আসা কমে গেছে। তার ওপর।

সুবীর আর সোহিনী বেশ সংশয় নিয়েই বেরিয়ে এলো।

ওরা দুজনেই বুঝতে পারছিল না এই মুহূর্তে তাদের কি করার আছে। শান্তার সন্দেহের তীর যার উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে তা যেমন ভয়াবহ তেমনি লজ্জাজনক। তারা ভাবতেও পারছে না। ডিটেকটিভ চিফ গোলাপসুন্দর বসু এভাবে একজন পতিতার ঘরে আসতে পারেন। প্রথমত তিনি এমন একটি সম্মানজনক চেয়ারে বসে আছেন, সেখান থেকে বেশ্যাঘরে রাত কাটানো, ভাবা যায় না। তর্কের খাতিরে সত্য বলে মেনে নিলেও প্রোব্যাবিলিটির দিক থেকে তা কেমন করে মানা যায়? সুবীর বা সোহিনী গোলাপসুন্দরকে রেসপেক্ট করে। তাকে বস্ বলে মান্য করে। সৎ, সত্যবাদী এবং অন্যায়কে প্রশ্রয় না দেওয়া অফিসার হিসেবে গোলাপসুন্দর সকলের কাছে প্রিয় ব্যক্তি।

—না, না, সোহিনী আমরা কি সব উল্টোপাল্টা ভাবছি।

ওরা জিপেই ফিরছিল। স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে সুবীর বলল,—তাছাড়া আমার তো জানি, বস্ মাত্র ছমাস হোল বিয়ে করেছেন।

একবার আড়চোখে সুবীরের দিকে তাকিয়ে সোহিনী বলে, —ইয়েস। দ্যাট ইজ ফ্যাক্ট। বাট—

—হোয়াট বাট?

—আমি যতটুকু সংবাদ রাখি, গোলাপজির সাথে ভাবিজির আভি কোই সম্বন্ধ নেহি।

—তার মানে?

—দোনো কা বিচ্‌মে কুছ হুয়া। ইয়েস সামথিং রং। গোলাপজি এখোন একেলাই রহেতো। একটা লেড়কা উনার সব কাম কাজ করে। উস্‌কা নাম হ্যায় তামান্না।

সুবীর চট্ করে কোন উত্তর দিল না। খানিকটা সময় যাবার পর বলল।—স্ত্রীর সঙ্গে অনেকেরই ঝগড়া হতে পারে। হয়ও। ডিভোর্সও হয়। কিন্তু তার মানে এই না, যে তাকে পতিতালয়ে যেতে হবে। এবং সেই মেয়েটিকে খুন করতে হবে! আর আমরা সেটাই ভাবছি। স্ত্রীর বিরহে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গোলাপদা একজন পতিতার ঘরে গিয়ে তাকে উপভোগ করে তাকে খুন করে এসেছেন। হাউ অ্যাবসার্ড। বলতে পার সোহিনী, এতে গোলাপদার মোটিভ কী? একজন পতিতাকে খুন করায় গোলাপদার কোন ব্যক্তিগত লাভ আছে কি? আরো অবিশ্বাস্য কেন জানো? মেয়েটিকে যদি সরানোর উদ্দেশ্যই থাকবে তার জন্যে কিন্তু ঐ পুলিসের উর্দিটাই যথেষ্ট। এর জন্যে এতো ছলচাতুরির দরকার হবে না। না, আই ডোন্ট বিলিভ ইট।

সামান্য কিছু সময় নিয়ে সোহিনী বলল,—দেখো সুবীর, মেরা ভি বিশওয়াস নেহি হোতা। বাট হোয়াট্‌স্ অ্যাবাউট দ্যাট ব্রোকেন গ্লাস। সতীর বিস্তারাসে পুলিস থোড়া ব্রোকেন গ্লাস কালেকট করেছে। একই গ্লাস মিলেছে সতীর হাতমে। আরে হাঁ, গোলাপজির রিস্টওয়াচের

গ্লাস তুমহার পাস হ্যায় না?

—হ্যাঁ আছে।

—ভেরি গুড ওই ব্রোকেন গ্লাস ফোরেনসিকমে পাঠাতে হোবে। যদি একহি গ্লাস হয়, দেন আমাদের তো বস্‌কে শক্ করনাই পড়েগা।

—তুমি কিন্তু জোর করে কিছু মেলাতে চাইছ।

—কিঁউ?

—এখানে একটা ডেডবডির হাতে বা বিছানায় কিছু সূক্ষ্ম কাচের টুকরো পাওয়া গেল। আমাদের বস্ এখানে তদন্তে আসার পর দেখা গেল তাঁর হাতঘড়ির কাচ ভাঙা। এবং তিনি সেটা আমাকে পাল্টে আনতে দিলেন। এর মধ্যে তুমি যোগসূত্র পেয়ে গেলে? স্যরি তোমার যুক্তি এভাবে প্রমাণ করা যায় না। এনিওয়ে, তুমি যখন বলছ তখন ভাঙা কাচের টুকরো আমরা ফোরেনসিকে পাঠাব। কিন্তু—

—আমি বুঝতে পারি সুবীর। তুমার প্রবলেম কোথায় আছে। ঠিক আছে, এক সওয়ালকা জবাব আমায় দিবে?

—কী?

—হামলোগ জরুর উয়ো ব্রোকন গ্লাস, যো তুমহারা পাস হ্যায়, ফোরেনসিকমে পাঠিয়ে দিবে। যদি প্রমাণ হয় দোনো একহি গ্লাস, তব ভি তোম ইনকার কর দেগা? তোম নারাজ হোগা?

—নারাজ মানে?

—সাহেবের এগেনস্টে কোই অ্যালিগেশান স্যুট নেহি করে গা?

চট্ করে কোন জবাব না দিয়ে সুবীর একমনে গাড়ি চালাচ্ছিল।

—কেয়া হুয়া? কুছ তো বলবে?

—তুমি কী চাও বল তো সোহিনী?

—কুছ নেহি। আমি শুধু জানতে চাই আসলি মজুরিম কৌন হ্যায়। আউর চাই উসকা পানিশমেন্ট। রাইট পানিশমেন্ট।

সুবীর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সোহিনীর দিকে তাকালো। সোহিনীর চোখে কিছু সন্দেহের নিশ্চিত ছায়া খেলা করছিল। কিছুটা সময় নিয়ে সে বলল,—ব্রোকেন গ্লাস ইজ নট আ নেগলিজিব্‌ল্ পয়েন্ট। এক খুনি পাকাড়নে কে লিয়ে উয়ো প্রমাণ কাফিই হ্যায়।

অনেক দিন পর নয়নতারা আজ রাস্তায় বের হল। প্রায় ছমাসের কাছাকাছি সময় সে তার বন্ধুর বাড়ির ব্যালকনিতে বসে কাটিয়ে দিয়েছে। নিতান্ত প্রয়োজন না পড়লে সে বাড়ির বাইরে পা দেয় দেয়নি। আসলে সে গোলাপের মুখোমুখি হতে একেবারেই নারাজ ছিল। গোলাপকে

ঘিরে একটা তীব্র ঘৃণা আর আতঙ্ক তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছিল। মানুষের মন বড় বিচিত্র। যে নয়নের মন গোলাপের বিষে নীল হয়ে ছিল সেই নয়নের মনেই আবার নতুন চিন্তা ফিরে এসেছে। আসলে গোলাপকে তো সে ভালবাসতো। আজও ভালোবাসে। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় মন বিরূপ হলেও ছমাসে সেখানে পরিবর্তনের খেলা শুরু হয়েছে।

টেলিফোন ডাইরেক্টরি হাতড়ে ডাক্তার অম্লান দত্তগুপ্তের ফোন নাম্বারে সে ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিয়েছিল।

লেকগার্ডেন্সের মুখেই ওর চেম্বার। অম্লান একাই ছিল। নয়ন ঢুকতেই ডাক্তার হাই হাই করে উঠলো। যদিও ডাক্তারের বয়েস বেশি নয়। নয়নার থেকে হয়তো বয়েসে বছর পাঁচেকের বেশি হবে। ডাক্তার হিসেবে খুবই তরুণ। সুদর্শন। সমীহ জাগানো চেহারা। ছোটখাটো রসিকতাও করে। অবশ্যই সেটা শালীনতা বজায় রেখেই।

—ওহ্, কতদিন যে আমার নয়ন তারাহারা সে তোমায় কী বলব! সেই যে বিয়ে করে ডুব দিলে! হনিমুন মানে এতোদিন? জানো তো হনি বেশি হয়ে গেলে তেতো লাগে! বিটারমুন করে আসেনি তো?

—আমি কি বসব না দাঁড় করিয়ে কথা বলে তাড়িয়ে দেবে?

—নিজের মানুষকে অত আপনি, আজ্ঞে, আসুন, বসুন করা যায় না। তুমি তোমার ইচ্ছে মতো বসবে। তা জোড়ের আর একটি শালিখ কোথায়? বাবু শ্রীযুক্ত গোলাপসুন্দর বসু। দ্য গ্রেট ডিটেকটিভ অফিসার।

সামনের চেয়ারে বসতে বসতে নয়ন বলল, —তার কথা বলব বলেই তো তোমার সময় নষ্ট করতে এলাম।

—নো ম্যাডাম নো। আয়াম অলওয়েজ রেডি টু সার্ভ ইউ। তোমার জন্যে, যাক সে কথা, বল কী বলবে? আজ আমি কোন রুগী রাখিনি।

—তুমি এখনও সেই আগের মতোই আছ। হ্যাংলা রোম্যান্টিক।

—রোমান্স তো খারাপ জিনিস নয়। তাছাড়া সে বয়েসও আমার আছে। এবং আমি এখন ব্যাচেলার। একটু হ্যাংলামি থাকবেই। তবে বিখ্যাত ডাক্তার। আর, গোলাপ না থাকলে,

—অম্লান—

—স্যরি ম্যাডাম। এবার বলো।

সামান্য সময় নীরব রইল নয়নতারা। সেই অবসরে অম্লান চা আনিয়ে নিয়েছিল। সারাদিনেও অনেকবার চা খায়। ফলে ওর চেম্বারে ফরমাস খাটার জন্যে একটি ছেলে আছে। সেই ফ্লাস্কভর্তি চা করে রাখে। সেই ছেলেটাই দু কাপ চা দিয়ে গিয়েছিল। চায়ে চুমুক দিতে দিতে নয়ন শুরু করল তার বিয়ের রাতের পর থেকে মানালি পর্বে পালিয়ে আসার বিস্তারিত বিবরণ। কোথাও এতোটুকু কোন তথ্য বাদ না দিয়ে। একটাও কথা না বলে গভীর মনোযোগ দিয়ে নয়নের সব কথা শুনলো অম্লান। এর মধ্যে ওর গোটা দুই সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল। তৃতীয় সিগারেট ধরিয়ে ও সরাসরি নয়নের দিকে তাকাল, তারপর বলল,—এতোদিন আমায় এসব কথা জানাওনি কেন নয়ন? তুমি কি আমায় তোমার বন্ধুও ভাবতে পার না?

—তা যদি না ভাবব তাহলে তোমার কাছে ছুটে আসব কেন? এবার বল তো, গোলাপ ঠিক কী চাইছে? এমনিতে কোথাও কোন গণ্ডগোল নেই। বরং পরিপূর্ণ স্বাভাবিক। তাহলে?

—তাহলে তোমায় খুলে বলি নয়ন। ইটস্ আর ডিজিজ, স্যাডিজ্‌ম বলতে পার। আ

কাইন্ড অব পারভারসান। সেকসুয়াল পারভারসান। সেক্স পারভারসান অনেক রকম হয়। এসব লোকেরা নানান ভাবে যৌন আনন্দ পেতে চায়। আর সেই আনন্দ পেতে গিয়ে সেক্স পার্টনারকে নানানভাবে টরচার করে। এদের মধ্যে কেউ কেউ আছে যারা চরম আনন্দ পাবার জন্যে সহবাসরত অবস্থায় তার সঙ্গিনীকে খুন করে।

—তার মানে, গোলাপ আমায় ঐ দুটো রাতে খুন করতে চেয়েছিল? অর্থাৎ আমার অনুমান ঠিক?

—হ্যাঁ। সেই মুহূর্তে তুমি যদি ওকে ধাক্কা দিয়ে না ফেলে দিতে তাহলে তুমি খুনই হতে।

—গোলাপের রক্তে খুনি বাসা বেঁধে আছে? এটাই তোমার সিদ্ধান্ত?

—বললাম তো, ঠিক ঐ মুহূর্তের গোলাপ কুড ডু এনিথিং। আর মজাটা কি জানো, সেই মুহূর্তের ফ্রেন্‌জিনেশটা কেটে গেলে ও কিন্তু তোমার আমার মতো স্বাভাবিক।

—হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়েছিল। সকালে ঘুম ভেঙে ওঠার পর ও কিন্তু নরম্যাল।

—তুমি কিন্তু বিরাট ভুল করেছ নয়ন। এভাবে তোমার গোলাপকে একা ছেড়ে চলে আসা উচিত হয়নি।

—এ তুমি কি বলছ অম্লান? সেই সময় আমি কী করতে পারতাম? ওর রাতের তাগিদকে আমি অস্বীকার করতে পারতাম না। তেমন কোন ইচ্ছেও আমার ছিল না। পরিণামে কি হোত বুঝতে পারছ? তাছাড়া ওখানে আমাকে বাঁচাবার মতো কেউ ছিল না। আচ্ছা অম্লান—

—হ্যাঁ বল।

—গোলাপের সন্তানও কি ঐ একই রোগের রোগী হবে?

—তেমন কোন সম্ভাবনা কি তৈরি হয়েছে?

—না।

—তাহলে ও ব্যাপারে এখন কোন চিন্তার দরকার নেই। আপাতত গোলাপকে আমার দরকার।

—তুমি কি আমাকে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলছ?

—গোলাপ কেমন আছে, কী করছে কোন খবর রেখেছ?

—নাহ। আসলে আমি এতো বেশি—

—ঠিক আছে নয়ন। এখন থাক। গোলাপের সঙ্গে আমিই যোগাযোগ করছি।

—কিন্তু অম্লান, আমার পক্ষে তো আর বন্ধুর বাড়ি থাকা সম্ভব হচ্ছে না। অনেকেই এখন অনেক কিছু প্রশ্ন তুলছে।

—কেন তুমি অন্যের বাড়ি পড়ে থাকবে এটাই আমার মাথায় ঢুকছে না। তোমার অনেক আগেই উচিত ছিল নিজের বাড়ি ফিরে যাওয়া। এনিওয়ে, তুমি তোমার বাবার কাছে ফিরে যাও।

—কিন্তু বাবা বা মাকে কী উত্তর দোব? এ সব কথা তো বলা যায় না।

—নয়ন, এককালের অনেক ছেলের হার্ট থ্রব, কলেজকাঁপানো সুন্দরী এবং শিক্ষিতা নয়নতারা ব্যানার্জির মুখে এসব কথা শুনতে হবে ভাবিনি। এটা কোন লজ্জার কথা নয়। তোমার হাজব্যান্ড একটা অসুখে ভুগছে। তাকে সারিয়ে তুলতে হবে। তাকে সুস্থ করতে হবে। আর এ কাজে তোমার সহযোগিতাই প্রধান ব্যাপার। মাকে না হোক বাবাকে সব খুলে বলবে। উনিও বিচক্ষণ মানুষ। ডোন্ট গেট নারভাস। আমি তোমার পাশে আছি।

—স্যার এগেন আ মার্ডার।

নিজের টেবিলে বসে অন্যমনস্ক হয়ে একটা পেপারওয়েট ঘোরাচ্ছিল গোলাপসুন্দর। কদিন ধরে রাতে তার ভালো ঘুম হচ্ছে না। বিছানায় শুলে তার ঘুম আসে। কিছুক্ষণের জন্যে সে ঘুমিয়েও পড়ে। কিন্তু, বড়ো জোর একঘণ্টা। অদ্ভুত অস্বস্তিতে তার ঘুম ভেঙে যায়। সারা শরীর কাঁপিয়ে সেই অস্বস্তিটা দাপাদাপি শুরু করে। মাথার মধ্যে তখন আগুন ছুটতে থাকে। এটা তার কেন হয় সে বুঝতে পারে। আর এই ভাবটা প্রবল হয়ে উঠছে দিন দিন। নয়ন যাবার পর থেকে প্রথমে তার নয়নের ওপর প্রচণ্ড রাগ হতো। রাগ থেকে ঘৃণা। উপায় থাকলেও প্রচণ্ড অভিমানে সে নয়নের কোন খোঁজ রাখেনি। কিন্তু নয়ন চলে গিয়ে, মাত্র দু রাতের আনন্দ সুধা তাকে ক্রমাগত পাগল করে তুলেছে। আর তার পরিণামেই গভীর রাতে তার সারাশরীর কাঁপিয়ে দুর্বোধ্য ঝড় ওঠে। যার নাম কামনা। যার নাম সেক্স।

হ্যাঁ। সেক্স। যৌনতা। মনে করিয়ে দিচ্ছে দিন তিনেক আগের একটা রাতের কথা। তুমুল উত্তেজনায় তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। নিঃশব্দে বেডসুইচটা জ্বালিয়ে দিয়েছিল। ঘড়িতে তখন রাত একটা দশ। গোলাপ জানে আর তার সারারাতেও ঘুম হবে না। মাঝে দু একদিন এমন হওয়াতে সে ঘুমের ওষুধ খেয়েছিল। কিন্তু পরিণামে আধাঘুম আধা জাগরণে সারারাত অদ্ভুত হ্যালুসিনেশান। একেবারে ঘুম না হওয়ার থেকেও সে অস্বস্তি আরো বেশি। পাগলের মতো পায়চারী করে রাত কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত ভোর রাতে শিথিল শরীরটাকে সে বিছানায় ছেড়ে দিয়েছে। এবং একসময় তামান্নার ডাকে ঘুম থেকে উঠে দেখেছে ঘড়ি তখন প্রায় দুপুর বারোটার কাছাকাছি। বকাবকি করেছে তামান্নাকে। পরে বুঝেছে ওকে বকাঝকা করে কোন লাভ নেই। ছেলেটা ভালো। চোর ছ্যাঁচোড় নয়। মনিবকে যত্ন করে। আসলে সব দোষ তার স্ত্রীর। যার নাম নয়নতারা। অদ্ভুত এক হঠকারী সিদ্ধান্তে তার শান্তিটাই অপহরণ করে নিয়ে গেছে।

দিন তিনেক আগের রাতে, নিজেকে সে আর সামলাতে পারেনি। নিঃশব্দে ঘরের লক খুলে, গ্রিলের দরজায় তালা লাগিয়ে বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। বাড়িটা তো চেনাই ছিল। 'খবর সত্য'-র রিপোর্টার নন্দিতা দত্ত। অল্প কয়েকদিনের পরিচিত মহিলা। তাদের দুজনের জীবনে অনেক মিল আছে। নন্দিতা একা থাকে। বাবা-মা-ভাই-বোন। তারা কেউ নেই। এক কাকা ছিল। তিনিও মৃত। একটু আপস্টার্ট মড্ মেয়ে হওয়ার জন্যে গোঁড়া পরিবারের দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয়ের সঙ্গেই মিল হয়নি। কাকার ফ্ল্যাটেই থাকে। অতরাতে সামনের দরজা বন্ধ হয়ে যাবার কথা। গিয়েও ছিল। পিছনের দিকে খানিকটা জংলা মত জায়গা। বাইক রেখে সে সোজা স্পাইডার সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গিয়েছিল। নন্দিতা ঘরে তখনও আলো জ্বলছিল। অনেক রাত পর্যন্ত ও পড়াশুনো করে। টুকটুক করে দরজায় টোকা দিতেই নন্দিতা

এসে দরজা খুলে ওকে দেখে খানিকটা বিস্ময় , খানিকটা পুলক, খানিকটা ভয় সমেত তাকে টেনে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে পিছনের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। সেই রাতে নন্দিতার বিস্ময়াবিষ্ট কথাগুলো সব মনে আছে,—একী, আপনি, এতো রাতে? আমি তো কোন ক্রিমিন্যাল নই। রিসেন্টলি কোন ক্রাইমও করিনি। সো?

—আমি জানি আপনি একজন জার্নালিস্ট।

—কিন্তু আমি তো আপনাকে এই মুহূর্তে কোন খবর দিতে পারব না।

—আমি দিতে পারি। একটি ইমপর্ট্যান্ট নিউজ।

—আপনি? যদিও এতো রাতে মেয়েরা খবর সংগ্রহ করতে কোথাও যায় না। তা আমায় এখন কোথায় যেতে হবে? কোন খুন জখম? নাকি ব্যাঙ্ক রবারি?

—কোনটাই নয়।

—তাহলে?

—আপনি এই মুহূর্তে নিজের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন?

নিজের দিকে না তাকিয়েই নন্দিতা বলে,—শরীরের কথা বলছেন? আমায় দুচোক্ষে দেখতে পারে না এমন বন্ধুরাও বলে আমার শরীরে সেক্সের প্রাবল্য বেশি।

—আপনি কী বলেন?

—আয়নায় নিজেকে দেখি। ওরা খুব একটা ভুল বলে না।

—আপনি কি আর একটা কথা জানেন?

—কী বলুন তো?

—যার অনেক আছে তাকে কৃপণ হতে নেই।

—আপনার মতলবটা কী বলুন তো মশাই? এটা ভদ্রলোকের বাড়ি। বাড়িওলা বলে যদিও কেউ নেই। ওন ইওর ওন ফ্ল্যাট স্কিমে এখানে সবই নিজের নিজের ফ্ল্যাটের মালিক। আমার ঘরে একজন পুরুষ বন্ধু আসতেই পারে। আসেও। তাই বলে রাত দেড়টায় এসে আমার শরীরী প্রশংসায় উদ্বেল হয়ে আমাকে কৃপণ বলবে, এটা তো—

—তার অর্থ আপনি কৃপণ নন্।

—তার অর্থ আমি কথার প্যাঁচে পড়তে রাজি নই। তার ওপর ইউ আর হট নাউ। কাল এনিটাইম আমাদের দেখা হওয়াটাই সম্ভবত দুজনের পক্ষেই ওয়াইজ হবে।

গোলাপের মনে আছে, পকেট থেকে চ্যাপ্টা শিশিটা বার করে টেবিলে রাখতে রাখতে নন্দিতার হাত দুটো চেপে ধরে বলেছিল,—প্লিজ নন্দিতা, হেল্প মি।

—বাট, আই ডু নট লাভ ইউ।

—বাট আই লাইক টু লিভ টোগেদার, অ্যাট লিস্ট ফর দিস নাইট।

—ডু ইউ থিংক দ্যাট আই অ্যাম আ হোর?

—ওহ্ নো, নো, নট অ্যাটল। তুমি জান আমার স্ত্রী আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। আয়াম অ্যালোন। আই নিড সেক্স। আই অলসো থিঙ্ক ইউ আর অলসো অ্যালোন বোথ মেন্টালি অ্যান্ড ফিজিক্যালি। দেন হোয়াই নট উই এনজয় আওয়ার লিভ টোগেদার?

কথা শেষ করেই ও প্রবল ঝটকায় নন্দিতাকে নিজের দিকে টেনে নিয়েছিল। মাত্র কয়েক সেকেন্ড গভীর দৃষ্টিতে গোলাপের চোখে চোখ রেখে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে নন্দিতা বলেছিল,—সেক্স সম্বন্ধে আমার তেমন কোন কনজারভেটিভনেশ নেই। এবং তোমাকে

আমার খুব খারাপ লাগে না। এর অর্থ কিন্তু এই নয় যে তোমাকে আমি ভালোবাসি। দিস ইজ জাস্ট্ আ ফিজিক্যাল প্লেজার।

—হ্যাঁ তাই। শরীর এবং আত্মার তৃপ্তির সাধন।

—দেন আই হ্যাভ টু প্রিপেয়ার মিসেল্ফ্।

—তুমি কি প্রিকশানের কথা বলছ?

—অফকোর্স। এখনও কুমারী মায়ের এ সমাজে রমরমা ব্যাপারটা আসেনি।

—ডোন্ট ওরি। আয়াম প্রিপেয়ার। বরং তুমি মানসিক বেস্ তৈরি করে নাও। নিজের চ্যাপ্টা বোতলটা এগিয়ে দিয়ে বলল,—কটা চুমুক দিয়ে দাও। স্টিমুলেট করবে। শরীরে হিল্লোল আনবে।

কয়েক সেকেন্ড গোলাপের দিকে তাকিয়ে চ্যাপ্টা বোতলের সবটুকুই এক চুমুকে উড়িয়ে দিল। অর্থাৎ মদ্যপানে নন্দিতা রীতিমত অভ্যস্ত।

তারপর। দুজনেই দুজনকে নিয়ে শরীরী খেলায় মেতেছিল। কিন্তু,

—স্যার, কেয়া আপকো তবিয়ত আচ্ছা নেহি?

অনেকদূর কোন অচেনা দেশ থেকে যেন ফিরে এলো গোলাপ। তার চোখের কোন লাল। চোখে মুখে সামান্য ক্লান্তির ছাপ।

—না, মানে, তুমি কিছু বলছিলে নাকি সোহিনী?

—হা সাব। আভি আভি খবর মিলি এক লেডি রিপোর্টার কা খুন হো গয়ি।

—সেকি? কোথায়?

—আপনি লেড়কিকে চেনেন।

—আমি? চিনি? কি নাম বল তো?

—নন্দিতা দত্ত। আ রিপোর্টার অব 'খবর-সত্য'।

—ওহ্ মাই গড। কয়েকদিন আগেই তো ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

—কিধার? উনকা কোঠি মে?

চকিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছড়ালো গোলাপ,—তুমি কী বলতে চাইছ সোহিনী?

—নো স্যার। নাথিং সিরিয়াস। তো আভি তো উধার যানাই হোগা না?

—মার্ডারটা হয়েছে কোথায়? পলিটিক্যাল মার্ডার নয় তো?

—নাহি সাব। নন্দিতাজি উনার ঘরেই খুন হয়েছেন।

—ঠিক আছে। আমাদের ফোটোগ্রাফারকে খবর দাও। তুমি আর সুবীর যাবে আমার সঙ্গে। দুজন কনস্টেবলকেও নিয়ে নিও।

স্যালুট জানিয়ে সোহিনী চলে গেল। ওর যাবার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গোলাপের খুব আশ্চর্য লাগল, তিন দিন আগের রাতে তো সে নন্দিতার বাড়ি গিয়েছিল রাত প্রায় দেড়টার সময়। অথচ সোহিনী বলছে, নন্দিতা খুন হয়েছে তিন দিন আগে। তা কেমন করে সম্ভব?

—স্যার উই আর রেডি।

—হ্যাঁ চল।

আর পিছনের রাস্তা দিয়ে নয়। ওদের জিপটা গিয়ে থামলো মণিকা অ্যাপার্টমেন্টের গেটে। একজন গেটম্যানও ছিল। পুলিস টুলিস দেখে সে সেলাম ঠুকে সরে দাঁড়ালো। গোলাপ বেশ ভারিক্কি গলায় প্রশ্ন করল,—মার্ডারটা হয়েছে কোনদিকে?

—পেছন দিকের ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাট নাম্বার জে ২১৭।

—ওখানে আর কে কে আছেন?

—নন্দিতাদির ফ্ল্যাটে?

—হ্যাঁ।

—উনি একলাই থাকতেন।

আর কোন কথা না বলে গোলাপ এগিয়ে গেল জে ২১৭এর দিকে। পিছনে সুবীর, সোহিনী আর ফোটোগ্রাফার বীরেশ হালদার। সঙ্গে গেটম্যানও ছিল। সুধীরই গেটম্যানকে প্রশ্ন করল—নন্দিতা দেবী তো একলা থাকতেন বললে?

—হ্যাঁ সাহেব।

—তা তোমরা জানলে কী করে যে উনি মারা গেছেন?

—কিছু মনে করবেন না সাহেব। দিদিমণির খুব স্টাইল ছিল। ওই যাকে বলে নাক উঁচু। ভালো করে কারো সঙ্গে কথাই বলতেন না। নিজের খুশি মতো আসা যাওয়া করতেন। এই নিয়ে অনেকে ওনার নামে কমপ্লেন করেছেন। উনি একটা অন্যায় কাজ করতেন। যেটা আমি ছাড়া আর কেউ জানতো না।

—সেটা কি?

—না সাহেব। আমি আর কিছু জানি না।

—তোমার নাম কী?

—আজ্ঞে নন্দলাল গলুই।

—তুমি কি জানো পুলিসের কাছে সত্য কথা না বললে তার ফল কী হয়?

—জানি সাহেব।

—তাহলে যা বলতে চাইছ না সেটা বলে ফেলো।

একটু দোনামোনা করে নন্দলাল বলল,—নন্দিতা দিদি কোন কোন দিন রাত করে বাড়ি ফিরতেন। তো, পেছন দিকে একটা ছোট গেট আছে। সেখান দিয়েই দিদি নিজের ফ্ল্যাটে চলে যেতেন।

—ঐ দরজার চাবি কার কাছে থাকতো?

—আমার কাছে। কোন কোন রাতে চাবি লাগাতাম না। দিদি বারণ করতেন তো।

—কাজটা তো বেআইনি? কত টাকা পেতে?

—আজ্ঞে, বেশি না। মাসে দুশো।

—হু। পরশু রাতে দরজা খোলা ছিল?

—হ্যাঁ সাহেব। দিদি সেদিন রাত করেই ফিরেছিলেন।

—তখন কটা হবে?

—সেটা ঠিক বলতে পারব না।

—তার মানে যে রাতে তুমি দরজা খুলে রাখো, সে রাতে আর তালা পড়ে না।

—তালা না পড়লেও ওদিকটা তো পগার। দিদি ছাড়া আর কেউ যাতায়াত করে না।

ওরা কথা বলতে বলতে নন্দিতার ফ্ল্যাটের সামনে চলে এসেছিল। দুজন কনস্টেবল নাকে রুমাল চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। টানা বারান্দায় ভর রেখে এক মধ্যবয়েসী ভদ্রলোক বেশ অস্বস্তি নিয়েই দাঁড়িয়ে ছিলেন। গোলাপরা গিয়ে পৌঁছতেই ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। ভদ্রলোকই জিগ্যেস করলেন,—স্যার, আপনারা কি পুলিসের লোক?

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে গোলাপ পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল,—আপনি?

—আজ্ঞে আমি এখানকার কো-অপারেটিভেব সেক্রেটারি। নিমাই রায়।

—থানায় খবর আপনিই দিয়েছেন?

—হ্যাঁ স্যার।

—ঘরটা তো ভেতর থেকে লক করা ছিল?

—হ্যাঁ স্যার।

—আপনি বুঝলেন কেমন করে যে নন্দিতা দেবী খুন হয়েছেন?

—আমি স্যার খুনের কথাই বলিনি। আমি বলেছিলাম, ঘর থেকে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। মানুষ পচা গন্ধ। দরজায় নক করেও কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছি না। খুন হয়েছে, না এমনিই মরে গেছে, না সুইসাইড করেছে সেটা আমি কেমন করে জানবো বলুন?

—দরজা খুলেছিলেন?

—মাথা খারাপ। তারপর মরি আর কি?

—খুলুন দরজা।

নিমাই রায় পকেট থেকে 'মাস্টার কি' বার করেন। দরজা খোলেন বটে, কিন্তু ঘরে ঢোকেন না। 'ওয়াক' শব্দ তুলে বারান্দার দিকে পিছিয়ে গিয়ে নাকে রুমাল চেপে ধরেন। সত্যিই দাঁড়ানো যাচ্ছিল না। সোহিনী আর সুবীর দুজনেই নাকে রুমাল চেপে নিয়েছে। গোলাপও তাই করে ভেতরে ঢুকে যায়। পিছনে সোহিনী আর সুবীর।

বিশ্রী বেঢপ একটা শরীর। ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ নগ্ন এক মহিলা। পরনের নাইটি দলামলা অবস্থায় একধারে পড়ে আছে। সুবীর আর সোহিনী একবার পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নিল। তাকাবার একটাই কারণ, পতিতা পল্লীতে খুন হওয়া মেয়ে সতীর মৃতদেহের অবস্থান আর নন্দিতা নামের এই মেয়েটির শয়ন ভঙ্গিমা একই রকম। যে কেউ দেখলেই বলে দিতে পারবে মেয়েটির সঙ্গমরত অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। সতীরও দেহে কোন বস্ত্র ছিল না। শক্ত কিছু দিয়ে পা বাঁধার দাগ ছিল। এই মেয়েটির দুটি হাত বাঁধা আছে সবুজকালো ডোরাকাটা মজবুত ইলাসটিক কর্ড দিয়ে। সাধারণত জামা-কাপড় মেলার জন্যে এই ধরনের ইলাসটিক কর্ড ব্যবহৃত হয়। কর্ডটির দুপাশে দুটি প্লাস্টিক কভারে মোড়া আংটা বা হুক

লাগানো আছে। যতদূর মনে হয় মেয়েটির জ্ঞান থাকা অবস্থায় হাত বাঁধা হয়, সম্ভবত তার অনুমতি নিয়েই। মনে একটা প্রশ্ন জাগে, তাহলে কি মেয়েটি পুরুষ সঙ্গীকে অ্যালাও করেছিল তার হাত দুটো বাঁধা অবস্থায় সহবাসে লিপ্ত হতে? অর্থাৎ আ কাইন্ড অব পারভারসান ফর সেক্সুয়াল প্লেজার? মুখে কিছু প্রকাশ না করে এদিক ওদিক সর্বত্রই লক্ষ করছিল সোহিনী।

বীরেশ হালদারকে ফটো তোলার ফরমায়েশ করে গোলাপও মৃতদেহটি যতটা সম্ভব খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করে। কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়ানো কারো পক্ষেই সম্ভব হচ্ছিল না। নিমাই রায় আর গেটের দারোয়ান নন্দলাল আগেই বাইরে চলে গিয়েছিল।

—সুবীর মোবাইলে পুলিস মর্গে খবর দিয়ে দাও, বডি পোস্টমর্টেমে পাঠিয়ে দাও। আর কনস্টেবল কে আছে?

সোহিনী বললো,—সহদেব আর চতুর্ভুজ।

—সহদেবকে ডাকো।

সোহিনী বেরিয়ে যায়। সহদেব ঢুকে কয়েকবার হিক্কা তোলার মতো শব্দ করে।

—অনেকদিন পুলিসে চাকরি করছ সহদেব। এর আগেও অনেক বাসি মড়া ফেস করেছ। অত 'ওয়াক' তুলতে হবে না। ঘরটায় আপাদমস্তক স্প্রে করে দেবে। কোথাও কোন জিনিসে হাত দেবে না। যেখানকার জিনিস সেখানেই থাকবে। তারপর ঘর তালা দিয়ে আমাকে চাবি দিয়ে আসবে। এখানে থাকলে প্রত্যেকেরই শরীর খারাপ করবে। বাইরে চল।

—স্যার।

গোলাপ বেরিয়ে যাচ্ছিল, সুবীরের ডাকে দাঁড়ালো,—একটা মদের বোতল, পাঁইট সাইজ। খাটের নিচে পড়ে আছে।

—ওইভাবেই থাকবে। সব কিছু ফোরেনসিকে যাবে। আমরা বিকেলের দিকে আবার আসছি।

ঘরের বাইরে তখন এক জটলা। খবর কানে হাঁটে। সামনের ফ্ল্যাটের লোকেরাও ততক্ষণে হুজুগে বাঙালি হয়ে রীতিমত নিজের নিজের মতো তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। সোহিনী বারান্দার রেলিং-এ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার দুই ভ্রূর ওপরে ভাবনার কুয়াশা জমেছে। গোলাপকে বাইরে আসতে দেখে সে এগিয়ে যায়। প্রশ্ন করে,—স্যার, দোজ আর অল ফ্ল্যাটওনারস্। কেয়া আপ ইন লোগোকো কুছ পুছতাছ করেঙ্গে?

গোলাপ উপস্থিত ভারী জনতার দিকে তাকালো। এবং সেই তাকানোর দৌলতেই ভিড় পিছন থেকে রোগা হতে শুরু করল। হঠাৎই মধ্যবয়েসি এক ভদ্রলোকের দিকে চোখ পড়তেই গোলাপ হাত নাড়িয়ে তাকে কাছে ডাকল। ভদ্রলোক খুবই সাধারণ চেহারার মানুষ। বিত্ত হয়তো আছে। নইলে, এই বাজারে, এই এরিয়ায় ফ্ল্যাট ওনার হওয়া তো চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু ভদ্রলোক নিতান্তই আটপৌরে। পরনে ডোরাকাটা লুঙ্গি। আর গায়ে গেঞ্জি। পায়ে দুপাশে নাকে-ফুটোঅলা কালো রবারের চটি।

—আমায় ডাকছেন স্যার?

—হ্যাঁ স্যার। আপনার নামটা যেন কী?

—নবকেতন হালদার মজুমদার।

—ভারি সুন্দর নাম। দুটো টাইটেলঅলা নাম চট্ করে পাওয়া যায় না।

—কেন স্যার? সামনের দিকে একজন আছেন, মানকুমার সেনবর্মা। আর একজন আছেন

তিন পদবিঅলা। শ্যামাদাস সাহারায়।

—বেশ বেশ। আপনি তো মণিকা অ্যাপার্টমেন্টেই থাকেন।

—হ্যাঁ স্যার। তবে সামনের দিকে। পুব-দক্ষিণ খোলা ফ্ল্যাট। লটারিতে উঠেছিল।

—আপনি লাকি ম্যান। যা জিগ্যেস করছিলাম, এই মেয়েটিকে চিনতেন?

—কে স্যার?

—যিনি খুন হয়েছেন?

—ওরে বাবা খুন? তবে যে সবাই বলছে আত্মহত্যা।

—মেয়েটির কী আত্মহত্যা করার প্রবণতা ছিল?

—কেমন করে বলব বলুন? কার মনে কী আছে সে আর কে বলতে পারে? এইতো ধরুন না আমার স্ত্রী—

—নন্দিতা মেয়েটি কেমন?

—কে নন্দিতা?

—যিনি মারা গেছেন। আপনি চিনতেন না?

—চেনা যাকে বলে তা নয়। আমার সঙ্গে তেমন আলাপই ছিল না। কোনদিন কথাও বলিনি। ক্বচিৎ কখনো যাতায়াতের পথে দেখা হয়েছে বটে কিন্তু ভ্রূ নাচানোর অবকাশই পাইনি। খুব ডাঁটিয়াল ছিল তো।

—আপনি কী করে জানলেন? এই তো বলছেন তেমন চেনেনই না।

—বছরে একবার কো-অপারেটিভের জেনারেল বডি মিটিং হয়। তখনই দেখেছি। খুব চোখা চোখা কথা বলতে পারতো। কিছু কিছু জেনারেল প্রবলেম নিয়ে এমন সব পয়েন্টে কথা বলতো মনে হতো মেয়েটা শুধুই ডাঁটিয়াল নয়, পেটে কিছু বিদ্যে আছে।

—ডাঁটিয়াল বুঝলেন কী করে?

—আমাদের পাত্তাই দিত না। গরু-ছাগল মনে করতো। শুনেছি নাকি মেয়ে জার্নালিস্ট। এই কি বাবা জার্নালিস্টের নমুনা। ছ্যা-ছ্যা।

—কারো সঙ্গে আলাপ ছিল কি না জানেন? আই মিন বয়ফ্রেন্ড?

—পর্দানসীন তো নয়। পুরুষ বন্ধু থাকতেই পারে। তার ওপর হেভি মড। সিগ্রেট খায়। মদ খায়।

—তাহলে আপনি বলছেন বয় ফ্রেন্ড আছে। তারা কি কেউ যাতায়াত করতো নন্দিতা দেবীর কাছে?

—মিথ্যে কথা বলতে পারব না। লোকমুখে শুনেছি। তবে নিজের চোখে আমি কিছুই দেখিনি। শুনেছি কেউ কেউ আসতো। অনেক রাত পর্যন্ত থাকতো।

—আপনারা কেউ আপত্তি করেননি?

—বোধহয় কেউ কেউ করেছে। তবে আমি করিনি।

—কেন?

—একেই তো ফ্ল্যাট বাড়ি। দরজা বন্ধ করে দিলেই যে যার সে তার। ঘরে বসে কে মাল খাচ্ছে, কে পুরুষ বন্ধু নিয়ে ফুর্তি করছে এসব খবর রাখার কিই বা দরকার বুঝি না।

—এখন কি বুঝতে পারছেন প্রতিবেশীদের সম্বন্ধ কিছু খোঁজখবর রাখার কত প্রয়োজন।

—না স্যার এখনও বুঝতে পারছি না। ঐ মেয়েটির সঙ্গে যদি আলাপ থাকতো তাহলে

এখন যতগুলো প্রশ্ন করেছেন, তখন করতেন দশগুণ বেশি। আর উল্টোপাল্টা কিছু উত্তর দিলেই প্যাঁদানি এবং হাজতবাস।

ভ্রূ কুঁচকে গোলাপ সামান্য হাসলো। তারপর বলল, —পুলিস সম্বন্ধে জেনারেল পিপল্-এর আইডিয়াটা খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে। বোধহয় এর জন্যে দায়ী আমরাই। এনিওয়ে, আপনি এখন আসতে পারেন।

—তাহলে কি স্যার এটা খুন, নবকেতনবাবুকে বেশ উৎসাহী দেখালো।

—আপনি তো কোন খবর রাখতে ভালোবাসেন না। তাহলে?

—না, মানে যতই হোক পড়শি তো...তাই।

—সেটা বলবে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট।

সুবীর আর সোহিনীকে নিয়ে গোলাপসুন্দর থানার দিকে রওনা হল।

জিপে যেতে যেতে সোহিনীই প্রশ্নটা করল,—স্যার, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস কেস? হোয়েদার দিস ইজ হোমিসাইড অর—

গাড়ি চালাচ্ছিল গোলাপ নিজেই। সোহিনীর কথার জের টেনে বলল,—অর? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই অর? দিস ইজ আ ক্লিয়ার কেস অব মার্ডার। তোমার কি অন্য কিছু মনে হচ্ছে?

—সুইসাইড হো নহি সকতা?

—সুইসাইড? সুবীর, তুমি কী বলছ?

—না স্যার। সুইসাইড নয়। সতীর কেসটার সঙ্গে এই কেসের কিছু মিল খুঁজে পাচ্ছি।

—কারেক্ট। আমার ধারণা, দুটো মার্ডারের প্রসেস একই। অ্যাট দ্য টাইম অব ফিজিক্যাল মিটিং, মেয়ে দুটি খুন হয়েছে।

—তার মানে আপনি কি বলতে চাইছেন দুটো খুন একই লোকের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে?

—গণ্ডগোলটা এইখানেই হয়ে যাচ্ছে। প্রথম খুনটা হয়েছিল পতিতালয়ে। যে খুন হয় সে একজন সুন্দরী বারবনিতা। ঐ মেয়েটিকে কোন একজন বাবু সম্পূর্ণ নিজের করে রাখতে চেয়েছিল। মেয়েটি রাজি না হওয়ায় লোকটির রাগ হতে পারে। কিন্তু এটাই জোরালো মোটিভ বলে ধরা যাচ্ছে না।

—কিঁউ স্যার! ইয়ে ভি এক মোটিভ হো সকতা।

—হো সক্‌তা। নেহি ভি হো সক্‌তা। কারণ, যে লোকটা মেয়েটিকে রক্ষিতা করতে চেয়েছিল, তার কাছে একটি মেয়েমানুষের শরীরের দাম কতটুকু? তার কাছে একজন যাবে আর একজন আসবে। যে এলো না তার জন্যে বড় জোর কয়েকটা আফসোস। এর বেশি কিছু নয়। অবশ্য তোমরা এখানে বলতে পার জেদ থেকে রাগ, রাগ থেকে খুন।

—ইয়ে ভি হো সক্‌তা।

—নেহি হো সক্‌তা। কিসের জেদ? আগের দিনে জমিদারদের মধ্যে এটা ছিল। নীলরক্তের অহংকার। যেটা পাবার ইচ্ছে হয় সেটা সে যেমন করেই হোক পেতে চাইবে। সে সব আভিজাত্যের বড়াই। দিন পাল্টেছে। সময় এখন অন্য কথা বলছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মেন্টালিটিও পাল্টাচ্ছে। একটি বারবনিতাকে খুন করার চেয়ে ঐ নাগর অন্য কোন বারবনিতার সঙ্গে রাত কাটানোর আমেজ অনুভব করাকেই প্রাধান্য দেবে বেশি।

—তার অর্থ আপনি বলতে চাইছেন বিনা মোটিভে, অথবা হঠাৎ রাগে কেউ সতীকে

খুন করেছিল। এ ক্ষেত্রে কী বলবেন? যতদূর মনে হয় নন্দিতাকেও দেহমিলনের সময়ে তার পুরুষসঙ্গী তাকে খুন করেছে।

—হ্যাঁ। তাই-ই হয়েছে। পোস্টমর্টেম রিপোর্টও একই কথা বলবে।

—স্যার, ইস্‌কা মতলব দোনো খুন একই আদমি কিয়া?

—আগেই বলেছি। কনফিউশান সেখানেই। বেশ্যা বাড়ি গিয়ে সেক্স এনজয় করে যে, তার মেন্টালিটি আর, একজন জার্নালিস্টের কাছে গিয়ে রাত কাটায় যে লোক, তার মেন্টালিটি কি এক হতে পারে?

—হো ভি সক্‌তা।

—কেন?

—কোই দুঃশ্চরিত আদমি, হি ওনলি ওয়ান্টস্ ওম্যান ফ্লেশ। ইস্‌কা আলাবা উসকা দুসরা কোই মতলব হোতাহি নেহি। হ্যাঁ সার, আমার মালুম হচ্ছে কি, হি ইজ পারভারটেড ওয়ান।

সুবীর সাধারণত কম কথা বলে। এক্ষেত্রে ও বলল,—স্যার আমার মনে হয়, খুনি যেই হোক, যদি একজন হয় তাহলে তাকে সেক্স ভায়োলেন্ট ছাড়া আর কিছু বলা যাচ্ছে না। দুটো খুনের চেহারা তাই বলছে।

গোলাপসুন্দর কিছু বলে না। থানাও প্রায় এসে গিয়েছিল। একসময় ও গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল। সোহিনী আর সুবীর লক্ষ করল গোলাপের মুখে চিন্তার অজস্র কুটিল রেখা। একটু গিয়েই হঠাৎ ফিরে এলো। একবার দুজনের মুখের দিকে তাকালো। তারপর বলল,—ঘড়ির কাচের ফোরেনসিক রিপোর্ট কবে আসবে? এলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। গোলাপ নিজস্ব ভঙ্গিমায় সামনের রাস্তায় এগিয়ে গেল। সুবীর আর সোহিনী বোকার মত নিজেদের দিকে তাকিয়ে দুজনেই ঠোঁট উল্টে কাঁধ স্রাগ করল।

দুপুরে ঠেসে ঘুমোবার ফলে তামান্নার কিছুতেই ঘুম আসছিল না। সাধারণত এই বয়েসের ছেলেদের ঘুমটুম না আসার ব্যাপারটা তেমন কব্জা করতে পারে না। আসলে এদের চিন্তাভাবনার জগৎটা খুব একটা জটিল নয়। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা চিন্তার কুটিল সমাবেশ ঘুমকে প্রতারণা করে। নার্ভকে উত্তেজিত করে। অতএব ঘুম পালিয়ে বাঁচে। তামান্নার সে সমস্যা ছিল না। কিন্তু দিন কয়েক যাবৎ তার মনিবের বিশেষ কিছু আচরণ তাকে বেশ ভাবাচ্ছে। অতটুকু ছেলে। সে ভাবে তার বাবু, প্রায় দিনই গভীর রাতে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে চোরের মত দরজায় চাবি দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। নিশ্চয়ই তেমন কোন কাজ নয়। তাহলে পোশাকটাও সে রকম হোত। বাবু রাতে শোবার সময় পাজামা আর পাঞ্জাবি পরেন। সেই অবস্থাতেই কোথায় যে বের হন তা তামান্না কিছুতেই বুঝতে পারে না। একদিন তার বাবু বেরিয়ে গেলে সে চুপিচুপি দরজা পর্যন্ত গিয়ে দেখেছিল তার বাবু যায় কোথায়? কিন্তু কিছুই

সে বুঝতে পারেনি। তারপর অনেকক্ষণ শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে করতে একসময় সে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম ভাঙলে সে দেখে তার বাবু যেমনকার তেমনি ঘাটে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে।

তামান্না ভাবে তাহলে সে বোধহয় রাতে কোন স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু একটা ব্যাপার সে লক্ষ করছে, তার অমন সুন্দর দেখতে বাবুটা কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। চোখ মুখেও সেই উজ্জ্বল আর চকচকে ভাবটাই নেই।

শুধু তামান্না নয় গোলাপসুন্দর নিজেই নিজেকে আয়নায় দেখতে গিয়ে কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়। সে বরাবরই তার নিজের মুখের প্রেমিক। নার্সিসাসের মতো। একটা চাপা অহংকারও ছিল। নয়ন যতদিন ছিল ততদিন তার এই চাপা গুমর নিয়ে কখনও ঠাট্টা করতো কখনো রাগ করতো, কখনও খ্যাপাতো।

হ্যাঁ, তার এই নামটা রেখেছিলেন তার দাদামশাই। মায়ের বাবা। গোলাপসুন্দর। মুখখানা সত্যিই ছিল গোলাপের মতো সুন্দর। গোলাপের সৌন্দর্যে একটা পুরুষালি সৌন্দর্য আছে। যেটা চাঁপায় নেই। রজনীগন্ধায় নেই। হাসনুহানায় নেই। এদের গন্ধে বা চেহারায় বড় মিষ্টি মেয়েলি ব্যাপার জড়িয়ে আছে। কিন্তু গোলাপ। সর্বদাই উদ্ধত। আচরণে, রক্তিম সুবাসে পুরুষের মতো। প্রখর আর ঘোর লাগানো।

গোলাপসুন্দর নিজেও তাই। তার সংস্পর্শে যে আসে, ঔদ্ধত্যের বেড়াটপকে মনের কাছাকাছি এলেই বুঝতে পারে একটা সম্মোহিনী গন্ধ যাদুতে সে কখন বাঁধা পড়ে গেছে। যেমন একদিন নয়নতারা। ধনী বাপের নাক উঁচু মেয়েটাও তার সর্বনাশা আলিঙ্গনের হাত থেকে মুক্তি পায়নি। গোলাপের কাঁটা ডিঙিয়ে যে ফুলটাকে বুকে টেনে নিতে পারে সে আজন্ম গোলাপ প্রেমী হয়ে ওঠে।

নন্দিতা দত্তের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট না পেলেও আন্দাজ করা যায় সেক্সুয়াল মিটিং-এর সময়ে তাকে খুন করা হয়েছে। খুনি সম্ভবত তার চেনা ছিল। নন্দিতার দুটো হাত খাটের বাজুর সঙ্গে বাঁধা ছিল। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে ইলাসটিক কাপড় মেলা দড়িটা নন্দিতার নিজেরই। হাত বাঁধা অবস্থায় মিলনসঙ্গম নাকি আ কাইন্ড অব সেক্স গেম। আর সহবাস চলাকালীনই তাকে গলা টিপে মারা হয়েছে। গলায় দাগ আছে, কিন্তু কোন আঙুলের ছাপ নেই, অর্থাৎ খুন করার সময়ে হয় গ্লাভস্ অথবা হাতে কোন কাপড় জড়িয়ে নেওয়া হয়েছিল। স্টমাকে অনেকটা অ্যালকোহল পাওয়া যায়। খাটের নিচে চ্যাপ্টা মদের পাঁইট বট্‌ল্ পাওয়া যায়। সেখানেও ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যায়নি। এইখানেই ধন্দে পড়েছে গোলাপসুন্দর। রাত একটা নাগাদ তার ঘুম ভেঙে যায়। সমস্ত শরীর গরম হতে থাকে। সেই মুহূর্তে একটি মহিলাশরীর তার খুব পেতে ইচ্ছে করে। অত রাত্রে বাইক নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে। রাস্তায় বেরিয়ে তার প্রথমেই মনে পড়ে নন্দিতার কথা। কদিন ধরে নন্দিতা তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করে চলেছে এমন একটা আইডিয়া তার মাথায় খেলা করে চলছিল।

তার মনে পড়ছে পেছনের দরজা ঠেলে, দরজা খোলাই ছিল, সে নন্দিতার ঘরে গিয়েছিল। কিছু রোম্যান্টিক কথা হয়েছিল। তারপর?

তার কাছে মদের পাঁইট ছিল। নন্দিতা অনেক মদ খেয়েছিল। কিন্তু তারপর? এই তারপরের ঘটনাটাই তার বিস্মৃতির অতলে চলে গেছে। এরপর আর কিছুই তার মনে নেই। কুচকুচে কালো রঙের একটা চাদর তাকে কেউ চাপা দিয়ে দিয়েছিল। সে যেন কোন অন্ধকারের দেশে হারিয়ে গিয়েছিল। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। তারপর জ্ঞান ফেরে

তামান্নার ডাকে।

নন্দিতা খুন হয়েছে সেই রাতেই। তাহলে কে করল? খুনি কি ওৎ পেতে ছিল? সে চলে আসার পর নন্দিতাকে খুন করা হয়েছে। অর্থাৎ তারপর নন্দিতা কোন একজনের সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হয়েছিল? এবং সে তাকে খুন করে চলে যায়?

সে কে? কোথায় থাকে? অত রাতে তাকে ফ্ল্যাটের দরজাই বা কে খুলল? নিশ্চয়ই নন্দিতা। এবং সে নন্দিতার ইনটিমেট বয়ফ্রেন্ড। এখন এই বয়ফ্রেন্ডটিকে খুঁজে বার করার প্রয়োজন। তাকে না পাওয়া গেলে নন্দিতা মার্ডার কেস সল্‌ভ হবে না। সতী হত্যার সঙ্গে নন্দিতা হত্যার আপাতদৃষ্টিতে কিছু মিল পাওয়া গেছে। বলা যায় না কেঁচো খুঁড়তে অনেক সময়ে সাপের লেজের হদিশ পাওয়া যায়।

কিন্তু একটা ব্যাপার গোলাপের কাছে কিছুতেই পরিষ্কার হচ্ছিল না। প্রায় একটা থেকে দেড়টার মধ্যে সে নন্দিতার ঘরে গিয়েছিল। তার সঙ্গে একসঙ্গে বসে মদ্যপান করেছে। তাও কিছু না হলেও প্রায় দুটো বেজেছে। তারপরে তার আবছা মনে আছে, তার নেশা হয়েছে, নন্দিতা তার একেবারে কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। আবেগে তাকে কাছে টেনে নিয়েছিল। তাকে গভীর আবেগে চুম্বনও করেছিল। তারপর...

তারপর, যদিও এখন তার কিছুই মনে নেই। সে কিন্তু বাড়ি ফিরেছিল। ধরা যাক, আরও আধঘণ্টা কি একঘণ্টা পরে। সে বাইকেই ফিরেছিল। নইলে বাইকটা তার বাড়িতে পৌঁছল কেমন করে? কিন্তু তার পরে যে এসেছিল সে এলো কখন? খুনই বা করল কখন? অবশ্য খুনের এগজ্যাক্ট টাইম জানা যাবে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আসার পর।

মোবাইল নয়। হোম সেটটা বেজে উঠল। চিন্তা মাথায় নিয়েই ও ফোনটা তুলল,—হ্যালো, কে বলছেন?

ও পাশ থেকে বেশ ভারি আর মিষ্টি একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এল। মাত্র দু সেকেন্ড সময় নিয়ে গোলাপসুন্দর বলল,—খুব একটা ভুল না করলে বলতে পারি ওপাশে কে আছে?

—বেশ বলুন।

—অম্লান দত্তগুপ্ত। অ্যাম আই রং?

—নো স্যার। হান্ড্রেড পার্সেন্টি কারেক্ট ইউ আর। কেমন আছো গোলাপ?

—সে কথা পরে। তার আগে একটা কথা বলি। মনে মনে তোমাকে আমি ভীষণভাবে খুঁজছিলাম।

—নিশ্চয়ই ঠ্যাকায় পড়েছো?

—ঠ্যাকাটা খুবই ব্যক্তিগত।

—চলে এসো।

—কিন্তু তুমি খুব বিজি।

—ড্যাম ইট। তোমার প্রবলেমটা আমার কাছে আরো জরুরি।

—ইজ ইট?

—তুমি যোগাযোগ না রাখলেও আমরা কয়েকজন তোমাকে ভুলিনি।

—আর কে কে আমায় ভোলেনি?

—এসো, বলব সব।

—কখন যাব?

—তোমার যখন সুবিধে হবে। কেবল একটা ফোন করে আসবে।

—বেশ তাই হবে। এবার বলতো বাবা হঠাৎ কেন ফোন করলে? এনিথিং রঙ্?

কয়েক সেকেন্ড নীরব থাকার পর অম্লান বলল,—তোমার যেমন আমাকে কিছু প্রশ্ন করার আছে বা কোন পরামর্শ নেবার আছে, ঠিক আমারও তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে।

—কী ব্যাপারে?

—দেখা হলেই বলব।

—বেশ তাই হবে। যত তাড়াতাড়ি পারি চলে আসব।

ফোনটা নামিয়ে রাখতে না রাখতে আবার বাজা শুরু করল।

—হ্যাঁলো, গোলাপসুন্দর স্পিকিং।

—স্যার, আমি সুবীর বলছি। ফোরেনসিক ডিপার্টমেন্ট থেকে এই মাত্র নন্দিতার পি এম রিপোর্ট পেলাম।

—কী লিখছে?

—মোটামুটি আমরা যা আন্দাজ করেছিলাম প্রায় তাই।

—কী রকম?

—মেয়েটিকে সঙ্গমরত অবস্থায় গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। স্ট্র্যাঙ্গুলেশন। বাঁচার জন্যে বেশ ছটফট করে। কিন্তু প্রতিপক্ষ বেশ বলশালী। হাত দুটো বাঁধা থাকার জন্যে সে হাত খুলতে পারেনি। কিন্তু হাতে দড়ির দাগ খুবই প্রকট। পা ছোঁড়ার চেষ্টা করে। কিন্তু পেরে ওঠেনি। মেয়েটির উরুতে গভীর জমাট রক্তের দাগ। ডাক্তারের অনুমান মেয়েটির জানুর ওপব ছেলেটি হাঁটু-চাপে তাকে প্রায় অবশ করে ফেলেছিল। এবং তখনই প্রচণ্ড জোরে গলা টিপে শ্বাসনালী চোক্ড় কবে দেয়। কয়েক মিনিটেব মধ্যেই নন্দিতার মৃত্যু হয়।

—আর কিছু?

—গলায় গভীর দাগ থাকলেও, ফিঙ্গার প্রিন্ট কিছুই পাওয়া যায়নি। কারণ খুনি সম্ভবত নাইলন গ্লাভ্স্ অথবা কোন তোয়ালে জাতীয় কিছু হাতে জড়িয়ে নিয়ে প্রাণপণে চেপে ধরে মেয়েটির গলা। মেয়েটির নাক দিয়ে কিছু রক্ত বেরিয়েছিল। কিন্তু সেগুলো মুছে দেওয়া হয়েছিল।

—ছেলেটির কোন হোয়ার অ্যাবাউট্স্ পাওয়া গেছে?

—না স্যার। তবে মেয়েটির সঙ্গে ছেলেটির গভীর যোগাযোগ ছিল।

—সে তো বটেই। নইলে অত রাতে ঘরে ঢোকে কেমন করে? মৃত্যুর সময় কিছু জানিয়েছে?

—হ্যাঁ স্যার। রাত দেড়টা থেকে তিনটের মধ্যে।

—দেড়টা?

ধাক্কা খেল গোলাপসুন্দর।

—কেন স্যাব? আপনি কি কিছু সন্দেহ করছেন?

—কী ব্যাপাবে?

—না মানে, দেড়টা শুনে আপনি যেন একটু থমকে গেলেন।

—নাহ্, তেমন কিছু নয়। ঠিক আছে। আমি একবার নন্দিতার ফ্ল্যাটে যেতে চাই। ইচ্ছে হলে তুমিও আসতে পার। ও হ্যাঁ, ভাঙা কাচের ফোরেনসিক রিপোর্ট কী বলছে?

—দেখা হলে বলব স্যার।

ডাক্তার অম্লান দত্তগুপ্ত রবিবারে কোন চেম্বার অ্যাটেন্ড করে না। ওই দিনটা সম্পূর্ণ নিজের করে রেখে দেয়। অজানিত কারণে অম্লান এখনও বিয়ে করেনি। তার সংসার মানে তার বৃদ্ধা মা আর বছর চল্লিশের এক বিধবা মহিলা যাকে ও স্বপ্নাদি বলে ডাকে। মহিলা বিধবা হবার পর থেকেই অম্লানদের বাড়িতে রয়ে গেছেন। আত্মীয়া না হলেও প্রায় আত্মীয়া। অম্লানের সংসারে বলতে গেলে প্রায় গৃহকর্ত্রীর আসন নিয়ে নিয়েছেন। অম্লানের মা রাজলক্ষ্মী দেবী আর স্বপ্নাদি অনেক চেষ্টা করেও অম্লানের বিয়ে দিতে পারেননি। এ সংসারে এই দুই মহিলার একটাই দুঃখ বাড়িতে কোন বধূমাতার পদার্পণ ঘটেনি।

স্বপ্নাদির সঙ্গে অম্লানের সম্পর্কটা বেশ মধুর। আসলে দুজনের মধ্যে বয়েসের কিছুটা ফারাক হলেও স্বপ্নাদিকে চল্লিশ বলে মনেই হয় না। মুখ বা শরীরের বাঁধুনি দেখে বয়স বলে দেওয়ার পটুত্ব যাঁদের আছে তারাও কিন্তু কোনমতেই স্বপ্নাদিকে তেত্রিশ চৌত্রিশের বেশি টানতে পারবেন না।

অম্লান চেম্বার শেষ করে বাড়ি ফিরলে ওর যা কিছু আড্ডা বা গল্প সব ওই স্বপ্নাদি। অম্লান যে সব সময়ে স্বপ্নাদি বলে ডাকে তা নয়। সেটা ওর ইচ্ছে বা খুশি বা মুড। মুড ভালো থাকলে শুধু স্বপ্না এবং তুই তোকারি এবং স্বপ্নাদির হাতের চড়চাপড়। সবটাই মজার কাঠামোয় এগিয়ে যায়। রাজলক্ষ্মী দেবী অনেকবারই স্বপ্নাকে আবার বিয়ে করার কথা বলেছেন। এখন আর বলেন না। তবে আফসোস করে মাঝে মাঝে বলেন,—অম্লানের বউ এলে তুই খুব দুরবস্থায় পড়বি স্বপ্না। তার হয়তো তোকে পছন্দ হবে না। একদিন বলবে বেরিয়ে যেতে। তখন যাবি কোথায়?

হাসতে হাসতেই স্বপ্না বলতো,—মাসিমা, আমায় কিছু টাকাকড়ি দিয়ে দিও। কোন আশ্রমটাশ্রম দেখে চলে যাব। অবশ্য যদি অম্লানের বউ তাড়িয়ে না দেয় তাহলে ওর সংসারেই থেকে যাব। কিরে অমু, তোর এই দিদিটাকে তাড়িয়ে দিবি না তো?

এমনি করেই কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু বিচিত্র এই মানুষ আর বিচিত্রগামী তার মনের ফ্যাঁকড়া।

সকালের কাগজটা হাতে নিয়ে বসেছিল অম্লান। কয়েকদিন হোল নন্দিতা দত্ত নামে এক জার্নালিস্ট খুনের খবরে পাতা সরগরম। মেয়েটি নৃশংসভাবে খুন হয়েছে তার নিজের ফ্ল্যাটে। গভীর রাতে। আর খুনের সঙ্গে পুলিস আরো একটা খুনের সাদৃশ্য পেয়ে গেছে। সে এক বারবনিতা। সেও তার ঘরে খুন হয়েছে। এরা দুজনেই খুন হয়েছে কোন পুরুষের সঙ্গে সঙ্গমরত অবস্থায়। বারবনিতা খুনের ঘটনাটি হয়তো একসময়ে থিতিয়ে যেতো। কিন্তু মিডিয়ার এক মহিলার একই প্রক্রিয়ায় খুন হওয়াটা মিডিয়া সহজভাবে নিচ্ছে না। অতএব পাতা সরগরম।

খবরটা পড়তে পড়তে অম্লান অন্যমনস্ক হয়ে গেল। কিছুদিন আগেই নয়নতারার কাছে

সে গোলাপের অসুস্থতার কথা শুনেছিল। নয়নতারার ঘটনা শোনার পরই তার মনে হয়েছিল গোলাপসুন্দর স্যাডিজমে ভুগছে। যারা যৌনসুখের তাড়সে সঙ্গিনীকে দৈহিক যন্ত্রণা দিতে পারে। এমন কি তাকে খুন পর্যন্ত করে তাদের মানসিক তৃপ্তি খুঁজে পায়। সেই জন্যেই সে গোলাপকে আসতে বলেছিল। তার রোগটা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছে সেটাও জানা দরকার। কাগজ পড়ে তার মনে হচ্ছে দুটি মেয়ের খুনি কিন্তু মানসিক রোগী। খুনি এক্ষেত্রে একজনও হতে পারে। দুজনও হতে পারে। দুজন হলে ভয়ের ব্যাপার। এই ধরনের রোগীরা সমাজে বেশি থাকলে সেটা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর।

কলিংবেলের আওয়াজ পেতেই অম্লানের ইন্দ্রিয় সজাগ হোল। গোলাপ আসবে বলেছিল, কে জানে হয়তো ওই এসেছে। ওঠার আগেই স্বপ্নাদি এসে হাজির,—অমু, এক ভদ্রলোক তোকে ডাকছেন।

—কেমন দেখতে?

—খুব সুপুরুষ। এই নে তার কার্ড।

কার্ডটা দেখতে দেখতে অম্লান বলল,—বুঝলে স্বপ্নাদি, আমার ইনট্যুইশান ভীষণ কাজ করে। বেলের আওয়াজটা শুনেই আমার মনে হয়েছিল গোলাপসুন্দর হতে পারে। এবং সেই।

—কী নাম বললে? গোলাপসুন্দর?

—হ্যাঁ। কেন নামটা খারাপ?

—পদ্মলোচনও হতে পারতো। চোখ দুটো ভারি সুন্দর।

—লাভ হবে না দিদি। ম্যারেড।

—তুই একটা যাচ্ছেতাই। দিদির আর সম্মান রাখলি না।

—স্যরি। তুমি একটু চা আর স্ন্যাক্স করো। ওকে ডেকে নিয়ে আসি।

নিচে নেমে অম্লান দেখল গোলাপ তখনও বাইকে বসে আছে। রসিকতা করে অম্লান বলল,—তুমি কি বাইক নিয়েই ওপরে চলে আসবে?

—পারলে যেতাম। কিন্তু সিস্টেমই তো নেই। হোত। যদি হিন্দী সিনেমার কোন শুটিং চলতো।

—গাড়িতে চাবি দিয়ে ওরা দুজনে ওপরে চলে এলো। ছোট্ট ঝুলবারান্দাটা এমনভাবে তৈরি যাতে মুখোমুখি দুজন বসে খাওয়া এবং গল্প দুটোই একযোগে চালাতে পারে। এখন মেঘলা দিন। প্রখর রোদের তাপ নেই। আবার বৃষ্টি হলেও ক্ষতি নেই। মাথায় শেলটার আছে। চারদিকে কাচের ফ্রেম। রঙিন কাচ বসানো। মোটামুটি বারান্দাটা বেশ উপভোগ্য।

বেতের চেয়ারে বসতে বসতে গোলাপ বলল,—একজন মহিলাকে দেখলাম। তুমি তো বিয়ে করনি। এবং আমার যতদূর জানা সংসারে তুমি আর তোমার মা। উনি কে?

—হিস্ট্রি আছে। বছর পঁচিশ বয়েসে উনি বিধবা হন। আমার মায়ের সম্পর্কিত বোনের মেয়ে। সংসারে ওঁর যাবার কোন জায়গা নেই। অতএব—

—মাসিমার পোষ্য কন্যা?

—খানিকটা। আমার স্বপ্নাদি।

—দি কেন?

—উনি আমার থেকে বয়েসে বড় তাই। দু একবছরের নয়। কম করেও পাঁচ ছয় তো হবেই।

—দেখে মনে হয় না। সে যাক। তুমি আমায় ডেকেছিলে কেন বলতো? এবং হঠাৎই? আরে, খবরটা আজকের কাগজেও ইমপর্ট্যান্স পেয়ে গেছে।

—কোনটা?

—নন্দিতা দত্তের হত্যাকাণ্ড। গত তিনচারদিন দরে মিডিয়া উঠেপড়ে লেগেছে।

—কেসটা বোধহয় তোমার হাতে?

—আমি এমন একটা পোস্টে চাকরি করি, পুলিসের হোমিসাইড ডিপার্টের গোয়েন্দা অফিসার। অপরাধ বা ঐ সংক্রান্ত কোন ঘটনা ঘটলেই গোয়েন্দা ডিপার্টমেন্টকে তৎপর হয়ে উঠতে হয়। অবশ্য তার আগে পুলিসই যা করার করে।

—পড়েছ খবরটা?

—হ্যাঁ। ইভ্ন্ দেখেও এসেছি। পার্সোন্যালি। সঙ্গে অবশ্য পুলিসের দুই অফিসারও ছিল।

—কী বুঝলে?

—তোমাকে খুব উৎসাহী মনে হচ্ছে। তুমি তো সাইকিয়াট্রিস্ট। খুন জখম তোমার মাথায় আবার কবে থেকে ঢুকল?

—তেমন কিছু নয়। তবে কেসটা ইনটারেস্টিং।

—কী রকম?

—তুমি তো গোয়েন্দা। গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিয়ে সব কিছু দেখ। এবং কেসটা তোমার কথা অনুসারে তোমারই হাতে এসেছে। তোমার কি মনে হয় না কেসটার মধ্যে ইন্টারেস্ট ক্রিয়েট করার মতো মেটিরিয়াল আছে?

—তা আছে। কেসটা সিম্পল্ মার্ডার নয়।

—এবং এই ধরনের খুন কয়েকদিন আগে আরো একটা ঘটে গেছে।

—হ্যাঁ। সতী নামে এক প্রস্‌টিটিউট। তুমি তো সাইকিয়াট্রিস্ট। তোমার চোখে ঘটনাটা কী হতে পারে?

—মুশকিল হচ্ছে যে দুজন খুন হয়েছে তারা সমাজের দুটি ভিন্ন গোত্রের মানুষ। একজন বারবনিতা। যে দেহের ব্যবসা করে সোনাগাছিতে। সেখানে কারা যায়? উঠতি বড়লোকের ছেলেরা। পড়তি পয়সাওলারা। আর কিছু লোয়ার ডেপ্‌থ-এর মানুষ। কাগজের বিবরণ অনুসারে সতীর স্টেটাস ছিল। তার কাছে একেবারে নগণ্য লোকেরা যেতো না। আবার খুব হাইফাই কেউ নয়। কোন সেলিব্রিটিও কেউ নয়।

অম্লানের কথাগুলো শুনতে শুনতে গোলাপসুন্দরের কান দুটো গরম হয়ে উঠছিল। কমলের বিবাহবার্ষিকীর নেমন্তন্ন খেয়ে এবং এক পেট মদে চুর হয়ে সে একটা ট্যাক্সি নিয়েছিল। প্রথমে মনে না পড়লেও পরে ধীরে ধীরে রুপোলি সুতোর মতো একটা ফ্ল্যাশিং। সেদিন রাতে সতীর ঘরে সেই গিয়েছিল। প্রমাণস্বরূপ, তার ঘরে সে খুঁজে পেয়েছে সেদিনের শান্তাবালার বর্ণনামত একটা কালো হাইনেক পাঞ্জাবি আর সাদা নাগরা। যেগুলো তারই। তারপর অবশ্য আর কিছু মনে নেই। হাজার চেষ্টা করেও মনে আসছে না। তখন সে জেগে না ঘুমিয়ে কোনটাই মনে নেই। কিন্তু অম্লান যা বলছে সেটা তার কানে গরম মোম ঢালার মতো। পতিতালয়ে যারা যায় তারা নেহাৎই নগণ্য শ্রেণীর। সেও কি নগণ্য শ্রেণীর? কিন্তু তার যাবার পেছনে যুক্তি আছে। রাতে অসহ্য যন্ত্রণা যদি তাকে বেশিদিন ফেস্ করতে হয় তাহলে তাকে পাগল হয়ে যেতে হবে। নন্দিতার ঘটনাও তাই। না গিয়ে তার উপায় ছিল

না। কিন্তু সমাজে তার একটা পজিশান আছে। সে হেঁজিপেঁজি নয়। তার মতো দেহের খিদে আপামর জীবজন্তু এবং মানুষের আছে।

—কী ভাবছ গোলাপ?

—ভাবছি অনেক কিছুই। গণ্ডগোল করে দিচ্ছে দুটো হত্যার প্রক্রিয়া এক। অথচ তারা সমাজের দুই শ্রেণীর মানুষ। বুঝতে পারছি না লোকটা একজন না দু'জন?

—কোন কমন কিছু সিমটম পাওনি?

—একটা জিনিস পেয়েছি। কাচ। একজায়গায় রিস্টওয়াচের ভাঙা কাচ। অন্য জায়গায় ভাঙা মদের পাঁইট বোতল।

—ফিঙ্গার প্রিন্ট?

—নাহ্! দুটি ক্ষেত্রেই নো ফিঙ্গার প্রিন্ট্। সম্ভবত খুনি খুবই সজাগ। গ্লাভ্স্ ব্যবহার করেছে।

—মদের বোতলের ব্র্যান্ড নেম কি?

—রয়্যাল স্ট্যাগ।

—সেখানেও কোন ফিঙ্গার প্রিন্ট পাওনি?

—নাহ্।

—এবার বল আমাকে কী জিজ্ঞাসা করবে?

কিছু বলার আগেই স্বপ্নাদি হাতে ট্রে নিয়ে ঢুকল। স্ন্যাক্স আর চা। টেবিলে রেখে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। গোলাপই ডাকল,—আপনার সব কথা শুনলাম অম্লানের মুখে।

—ও ওই রকমই। বানিয়ে বানিয়ে অনেক কিছু বলে।

—সবটা বানানো যায় না। কিছু সত্যির ওপর রঙচড়ানো হয়। বসুন না।

—নাহ্ গোলাপবাবু, এখন আমার অনেক কাজ।

—আমার নাম আপনি জানলেন কেমন করে?

—কেন? আমার ভাইয়ের কি আপনার নাম উচ্চারণ করা মানা?

—না না সেকী কথা! তাহলে আমি আসার আগে তোমাদের আলোচ্য বিষয় ছিলাম।

—হ্যাঁ ওর মুখেই শুনেছি। আপনারা চা খান। আমি আসছি।

স্বপ্নাদি চলে যায়। ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গোলাপ বলে,—খুব অন্যায়, বুঝলে অম্লান। মহিলার এখনও রূপ যৌবন যথেষ্ট। তোমরা ওর বিয়ে দিলে পারতে।

—চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ওর বিয়েতে মত নেই।

—সে ভাবে চেপে ধরতে পারনি তাই। আচ্ছা আমি একবার চেষ্টা করব?

দুটো ভ্রূ যতটা সম্ভব কাছাকাছি এনে অম্লান বলে,—কেন, তুমি চেষ্টা করবে কেন?

—মনে হোল মহিলার কোন গতি না হলে পরে বিপদে পড়তে পারেন।

—মনে হয় না স্বপ্নাদি আর বিয়ে করবেন। তবে চেষ্টা করে দেখতে পার। এবার আমি আসল কথায় আসব।

—হ্যাঁ, সেই জন্যেই আমি অপেক্ষা করছি।

একটা সিগারেট ধরাল অম্লান। গোলাপকেও একটা এগিয়ে দিল। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জিজ্ঞেস করল,—গোলাপ, একটা প্রশ্নের সোজা উত্তর দেবে?

—বল?

—নয়নতারাকে তুমি বিয়ে করেছিলে। সে এখন কোথায়?

—সেটা সেই জানে।

—আশ্চর্য! তুমি তার হাজব্যান্ড। তার খোঁজ তোমার কাছে পাবো না?

—নাহ্। পাবে না।

—কেন?

—কারণ সে ইচ্ছাকৃত নিখোঁজ। আমি তাকে খুঁজিনি। খোঁজার চেষ্টা করলে অবশ্য ঐ রকম সুন্দরী একটা মেয়েকে খুঁজে বের করা অসম্ভব হোত না।

—কেন খুঁজলে না কেন?

—পাঁচ বছর কোর্টশিপ চালাবার পর, মাত্র দুদিনের দাম্পত্যজীবনকে ঠকিয়ে যে মেয়ে নিরুদ্দেশে চলে যেতে পারে, গোলাপসুন্দর বসু তার কোন খোঁজ নেয় না।

—কোনদিন কি ভেবে দেখেছ কেন সে তোমায় ফেলে চলে গেছে?

—প্রেম করলেও, যে বিনা অপরাধে আমাকে ফেলে রেখে চলে যায়, আমি তার পেছনে ছুটতে রাজি নই।

—আমি কারো চলে যাওয়া বা কাউকে দিয়ে কাউকে ফিরিয়ে আনার কথা বলছি না। আমি বলছি, কার্যকারণ সম্বন্ধের ব্যাপারটা কি তুমি মাথায় এনেছ? পুলিস ডিপার্টের গোয়েন্দা বিভাগে তুমি অনেক উঁচু সারির অফিসার। তুমি কি কোনদিন ছাঁকনিতে নিজেকে ছেঁকেছে? কেন নয়নতারা, সম্পূর্ণ সুস্থ এক মহিলা হয়েও, মাত্র দু'টো রাতের শেষে তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে। কার্যকারণ ছাড়া কিছুই ঘটে না।

—কী বলতে চাইছ তুমি অম্লান?

—যা বলতে চাইছি সেটা তুমি কি কোনদিনও ভাবনি বলতে চাও!

—প্রথমত আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। মাত্র দুটি রাত আমার সঙ্গে কাটাবার পর আমাকে কিছু না জানিয়ে সে কোথাও চলে যায়। তার বাড়িতে যোগাযোগ করে জানতে পারি সে নাকি ভারতের বাহিরে কোথাও গিয়েছে। সম্ভবত লন্ডন।

—ঘটনাটাকে তোমার কি খুব স্বাভাবিক বলে মনে হয়?

—নয়নতারা হারসেল্ফ্ একটি মিসটেরিয়াস চরিত্র। বরাবরের খামখেয়ালি। তবে এবারের খামখেয়ালিপনাটা তার ম্যাক্সিমাম। তুমি কি জানো অম্লান, আজ প্রায় ছমাস অতিক্রান্ত, সে যেখানেই যাক তার কি আমাকে একটা চিঠি লেখা উচিত ছিল না? সে তো আমায় ভালবেসে বিয়ে করেছিল। এই কি ভালবাসার নমুনা?

—হ্যাঁ স্বীকার করি নয়ন কাজটা ঠিক করেনি। তার উচিত ছিল তোমার খবর নেওয়া অথবা তার খবর দেওয়া। আচ্ছা তোমার কি মনে হয় না এর পেছনে অন্য কোন কারণ থাকতে পারে?

—তোমার মতো আমি মনস্তত্ত্বের ছাত্র নই। আমি কেঠেল পুলিস ডিপার্টমেন্টের একজন গোয়েন্দা অফিসার। যদিও অপরাধী ধরার ব্যাপারে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করা দরকার, কিন্তু নয়নতারার অ্যাকটিভিটিজ রীতিমত অপমানজনক। তাই আমি আর তার খোঁজ নেবার প্রয়োজন মনে করিনি।

—তোমাদের মধ্যে কোন ঝগড়াঝাটির ব্যাপার কি ঘটেছিল? যা থেকে একটা চরম শাস্তির প্রবণতা গ্রো করতে পারে?

—না। কোনরকম কোন ঝগড়া বা মনোমালিন্যের ঘটনা ঘটেনি।

—এবার একটু একান্তই ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব। আপত্তি হবে না তো?

—যদি আপত্তি থাকে উত্তর দোবো না। প্রশ্ন করো।

—বেড পার্টনার হিসেবে নয়নতারা কেমন?

প্রশ্ন শুনে গোলাপসুন্দর দু-তিন সেকেন্ড চুপ করে রইল! তারপর বলল,—সত্যি কথা বলতে গেলে আমাদের কোন কনজুগাল লাইফই তৈরি হয়নি। একটা ভিন্ন পরিবেশে মাত্র দুটো রাত ওকে খুব কাছে পেয়েছিলাম।

—বেশ, তারপর?

—ওকে একেবারেই প্যাসিভ বলে মনে হয়নি। আমার চাওয়া আর ওর চাওয়া মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছিল।

—কোয়ায়েট নরম্যাল। দেন?

—তারপর...সে কতটা দিয়েছিল আমি কতটা পেয়েছিলাম সে ইতিহাস নিষ্প্রভ। মানে সব অন্ধকার।

—একথার মানে?

—মানেটা আমার নিজের কাছেও পরিষ্কার নয়। তাই আমি কাউকে বলতে পারি না। আসলে যে কোন ব্যাপারেই শরীর বা মনে প্রবল উত্তেজনা দেখা দিলেই—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ বল, কী হয় তখন? কোন অসুবিধা?

—বুঝতে পারি না। একটা সময় পর্যন্ত কেবল বুঝতে পারে আমি কোন অন্ধকারের সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছি। ব্যস।

—ব্যস মানে?

—আর আমার কিছুই মনে থাকে না।

—কী করছ না করছ কিছুই না?

—আমার মনে হয় আমি ঘুমিয়ে পড়ি। অথবা অজ্ঞান হয়ে যাই। জ্ঞান ফিরলে দেখি আমি কোন সেফ্ জায়গায় ঘুমচ্ছি।

—সেফ্ জায়গা বলতে?

—নিজের বাড়িই হচ্ছে সব থেকে সেফ্।

—মানালির বিছানায় একই ঘটনা ঘটেছিল?

—মনে নেই। আমার কিছুই মনে নেই। নয়নাকে আমি খুব আদর করেছিলাম।

উত্তেজনা তখন ভেতরে প্রবল উৎপাত শুরু করেছিলো। ব্যস্ তারপর আর আমি কিছুই জানি না। হোটেলের বেয়ারার ডাকে আমার ঘুম ভেঙেছিল পরদিন বেশ বেলায়।

—কোন ডাক্তার দেখিয়েছিলে?

—কেন?

—তোমার এটা একধরনের ব্ল্যাঙ্কনেস। কিছু সময়ের জন্যে রিয়ালিটি থেকে তুমি হারিয়ে যাও। সেই হারানো আর ফিরে আসার মধ্যের সময়টাই তোমার ব্ল্যাঙ্কনেস। তুমি নিজেই জানতে পার না তুমি কী করছ, কোথায় যাচ্ছ।

—তুমি সোমনাবুলিজম্ এর কথা বলছ?

—খানিকটা তো বটেই। ঐ সময়ে সোমনাবুলিজম্-এর পেসেন্ট ঘুমিয়ে থাকে। ঘুমিয়ে

হাঁটে ঘুমিয়ে একবাড়ি থেকে অন্য বাড়ি চলে যেতে পারে। এ একধরনের জীবন্ত জ্ঞানহীন পরিভ্রমণ। এই ঘোর থাকা অবস্থায় তারা কারো দ্বারা আঘাত না পাওয়া পর্যন্ত দে ক্যান ডু এনিথিং। এমনকি কাউকে খুন পর্যন্ত করতে পারে।

—ওহ্ মাই গড। কিন্তু এসব কথা আমাকে শোনাচ্ছ কেন? আয়াম নট আ পেশেন্ট অব সোমনাবুলিজ্‌ম্। অ্যান্ড আই ডিডনট্ মার্ডার এনিওয়ান।

অম্লান একটা সিগারেট ধরালো। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে গোলাপসুন্দরকে বলল,—তোমার কি বিশ্বাস তুমি রতিক্রিয়ায় ব্যস্ত মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়তে?

—পরে ভাবতে গিয়ে তেমনি মনে হয়েছে।

—এটা কি নরম্যাল? মানে তোমার কী মনে হয়?

—যে দুদিন নয়নতারা আমার সঙ্গে ছিল, দুদিনই সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত এ পাহাড় থেকে ও পাহাড় ঘোরাঘুরি করতে করতে ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব টায়ার্ড হয়ে ছিলাম। হয়ত সেই কারণেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

—কিন্তু মেডিক্যাল সায়ান্স বলে উত্তেজনা নার্ভকে সতেজ রাখে। আর অতি সতেজ নার্ভ চট্ করে ঘুমতে পারে না। তুমি ঘুমোওনি।

—না ঘুমলে আমাকে সকালে হোটেল বয় ডেকে তোলে কী করে?

—নিশ্চয় ঘুম এবং জাগরণের মধ্যে অ্যামনেসিয়া তোমায় অ্যাটাক করতো। অ্যামনেসিয়া, এ কাইন্ড অব বিস্মরণ। স্মৃতি বিলোপ। সোমনাবুলিজ্‌ম্-এর সঙ্গে অ্যামনেসিয়ার তফাত আছে। সোমনাবুলিজ্‌ম্ হচ্ছে ঘুম। গভীর ঘুম। অ্যামনেসিয়া হচ্ছে ব্ল্যাঙ্কনেস। বিস্মরণ। তখন তুমি কী করতে সেটাই তোমার অগোচরে রয়ে গেছে।

—কেন? সেরকম কিছু ঘটনা কি ঘটেছে?

—ঘটতেও তো পারে। আর সেই কারণেই নয়ন তোমার কাছে থেকে দূরে থাকছে।

—নয়নার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল?

একটু ইতস্তত করে অম্লান বলে,—ফোনে কথা হয়েছিল। তোমার বিরুদ্ধে তার অনেক অভিযোগ আছে।

—হোয়াট? অভিযোগ? সে কোথায় এখন?

—জানি না। তোমার স্ত্রী। তুমি তাকে খুঁজে বার করো। তাকে জিজ্ঞাসা করো, কেন ওই দুই রাতের পরে সে তোমাকে ছেড়ে চলে এসেছিল।

—তুমি বোধহয় অনেক কিছু জানো?

—কিছু তো জানি।

—নয়ন কী বলেছে?

সে প্রশ্ন এড়িয়ে অম্লান সেদিনের দুটো কাগজ এগিয়ে ধরে। একটা বাঙলা দৈনিক। অন্যটা ইংরেজি,—কলকাতা শহরে কয়েকদিনের ব্যবধানে দুটো খুন হয়ে গেছে। দুজনেই বনিতা। একজন বার একজন ঘর। কিন্তু খুনের প্রক্রিয়া একই রকম। আমি পুলিস মহলে ফোন করেছিলাম। ওখানে আমার বান্ধবী চাকরি করে।

—মহিলা?

—হ্যাঁ। ইন্সপেক্টর সোহিনী সিং। চেনো?

—অফকোর্স। আমার সঙ্গেই কাজ করে।

—হ্যাঁ। ওর মুখেই শুনলাম কেস দুটোই তুমি ডিল করছ। এই ধরনের রেপ অ্যান্ড মার্ডারকে কী বলে জানো?

—আমি সেই কারণেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তবে তুমি যে রেপ বলছ, দুটো কেসই কিন্তু রেপ নয়। দেহ বিক্রি করার জন্যে যে মেয়েটি দেহের পসরা সাজিয়ে বসেছে, তার সঙ্গে সঙ্গম করাটাকে রেপ বলা যায় না।

—বেশ মানলাম। দেন হোয়াট্‌স্ অ্যাবাউট দ্যাট নন্দিতা দত্ত।

—ইট ওয়াজ নট অলসো আ রেপ কেস। কারণ যে রাতে মেয়েটি মার্ডার হয়েছে সে অ্যাবাউট দেড়টা থেকে তিনটের মধ্যে। এত রাতে সে তার কোন বয়ফ্রেন্ডকে নিজের ফ্ল্যাটে ইনভাইট করেছিল। তারপর সেই নিশ্চয় নন্দিতার সঙ্গে ফিজিক্যাল রিলেশানে এনগেজ্‌ড্ হয়ে পড়ে। এবং—

—এবং তাকে খুন করে। তার মানে ছেলেটি পারভারটেড। স্যাডিস্ট্। আর অধিকাংশ স্যাডিস্ট পেসেন্টরাই সঙ্গমরত অবস্থায় খুন করে। সেটাই তাদের পারভারটেড প্লেজার।

ধরানো সিগারেটে মোক্ষম টান দিতে দিতে গোলাপসুন্দর বলল,—ঠিক এই কথাগুলো জানার জন্যেই তোমার কাছে আমার আসার দরকার ছিল। স্যাডিস্টদের কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে তুমি আমার উপকার করেছ। খুনিকে খুঁজে বার করতে এবার সুবিধাই হবে। আমাদের প্রথমে জানা দরকার দুটো খুনের খুনি কি একজন লোকই, নাকি দুজনে দুজনকে খুন করেছে। অবশ্য সারকামস্ট্যানসিয়াল এভিডেন্স বলছে, মার্ডার উইপন্স হিসেবে যা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা উভয় ক্ষেত্রেই এক বরাবর। এক জায়গায় মেয়েটির পা বাঁধা হয়েছিল। অন্য জায়গায় হাত। পি এম রিপোর্ট বলছে আফটার দ্য এন্ড অব ইন্টারকোর্স দুটি মেয়েকেই বাই স্ট্র্যাঙ্গুলেশন মার্ডার করা হয়েছিল। দুজনেরই ভ্যাজাইনার নার্ভ ইরিটেশান পাওয়া গেছে।

—কোন সিমেন?

—নাহ্। সম্ভবত কনডোম ইউজ করা হয়েছিল।—অর্থাৎ ছেলেটি তখন পূর্ণমাত্রায় সজাগ ছিল। এবং সজাগ অবস্থায় আ ডেলিবারেট মার্ডার। তাই তো?

—সেটা ডেফিনিট হয়ে বলার দায়িত্ব তোমার। তোমার কি মনে হয় খুঁজে পাবে? আততায়ী, অথবা আততায়ীদের?

—আগেই বলেছি একটি মেয়ের হাতে প্রতিপক্ষের রিস্টওয়াচের কাচ পাওয়া গিয়েছিল। তাতে আততায়ীর কোন ফিঙ্গারপ্রিন্ট ছিল না। অন্য মেয়ে, আই মিন নন্দিতার ঘরে একটা গ্লাস পাওয়া যায়। সেটায় নন্দিতার হাতের আর ঠোঁটের ছাপ পাওয়া গেছে। সেই সঙ্গে খাটের নিচ থেকে একটা খালি পাঁইট পাওয়া যায়। রয়্যাল স্ট্যাগের বোতল। কিন্তু সেখানেও কোন হাতের ছাপটাপ ছিল না।

—খুনি খুব চালাক। সম্ভবত হাতে গ্লাভ্‌স্ পরা ছিল। অথবা ছাপ ইচ্ছে করেই মুছে দিয়েছে। আর একটা গ্লাস পাওয়া উচিত ছিল।

—নাহ্। স্পটে আর কোন গ্লাস ছিল না। সো, কেসটা জটিল। বেশ কয়েক লক্ষ লোকের বাস এই শহরে। তার মধ্যে থেকে দুই বা এক ব্যক্তিকে খুঁজে বার করা, খুব টাফ্। যে সূত্রগুলো পাওয়া গেছে, এতোই কমন—

—হাল নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবে না?

—পুলিস এবং গোয়েন্দা বিভাগে আমার একটা নাম আছে অম্লান। দরকার পড়লে মাটির নিচ থেকেই তাকে তুলে আনতে পারি। বাট্—

—কেন? বাট কেন?

—আমি খুব টায়ার্ড অম্লান। আমার কিছুই ভালো লাগছে না। এই ডিউটি, ডিউটির বাইরের জীবন।

এই সময় স্বপ্নাদি ঘরে ঢুকল। বোধহয় স্নান সেরে এসেছে। যে কোন মানুষকেই চানটান করার পর বেশ তাজা লাগে। স্বপ্নাদিকেও লাগছিল। অফ্ মুডটা সরে গিয়ে গোলাপের মুখে ঝলমলে ভাবটা ফিরে এলো। সামান্য রসিকতা করে বলল,—বাহ্ ম্যাডামকে তো বেশ পবিত্র পূজারিণীর মতো মনে হচ্ছে। ঠাকুর ঘরে ছিলেন নাকি?

স্বপ্নাদি পর্দানসীনা নয়। অকারণ কোন জড়তাও নেই। চট করে বলে ফেলল, —ঠাকুর বাড়ির কোন পেটেন্ট ড্রেস কি আমি পরেছি? হঠাৎ আপনার এরকম মনে হওয়ার কারণ?

—আমার চোখ চট্ করে ভুল বলে বা দেখে না। কোন একটু কিছু পরিবর্তন ঘটেছে।

—আমি এখুনি স্নান করলাম।

—তাই?

—তাছাড়া ঠাকুর দেবতায় আমার কোন আগ্রহ নেই। আমি কোন মন্দিরে যাই না। পুজোটুজোও করি না।

—মেয়েদের মধ্যে এতো নাস্তিকতা চট্ করে দেখা যায় না। কী বল অম্লান? তা আর এক রাউন্ড চায়ের রিকোয়েস্ট করতে পারি কি?

—বসুন। হয়ে যাবে। রবিবার আমাদের বাড়িতে চা একটু বেশিই হয়।

চা এলো। কথা আর তেমন জমল না। ওঠার মুখে অম্লান কেবল বলল,—নয়নের অভিযোগগুলো মিথ্যে হলে আমিই সব থেকে বেশি আনন্দ পাব। পারলে ওর সঙ্গে দেখা কোরো।

বাইকে উঠে স্টার্ট দেবার আগে গোলাপ বলল,—মিথ্যে প্রমাণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমায় রিং করব।

গোলাপসুন্দর চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ চোখের সামনে খবরের কাগজটা মেলে ধরে চুপচাপ বসে রইল অম্লান। নয়নতারার মুখ থেকে শোনা পর পর দু রাতের ঘটনা, তার বানানো নয়। কোনমতেই নয়। একটি মেয়ে কখনই তার ভালবাসার স্বামীর সম্বন্ধে এসব অলীক রটনা করবে না। গোলাপকে ডেকে জিগ্যেস করা থেকেও বোঝা যায় স্নায়ুর উত্তেজনা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। সে প্রতিক্রিয়া চলাকালীন সে কিছুই জানতে পারে না।

এমন কি সেই অবস্থায় সে যা খুশি তাই করতে পারে।

গোলাপ তাকে খুব ভাবনায় ফেলে দিল। যে দুটো মার্ডার হয়েছে সে দুটো একজন স্যাডিস্টের পক্ষে করা সম্ভব। সম্ভব কেন, সেটাই হয়েছে। আবার গোলাপসুন্দরের কেস হিস্ট্রি পর্যালোচনা করলে তার পক্ষে এই ধরনের মার্ডার করা সম্ভব। নয়নতারা নিজেই হয়তো কোন এক রাতে মার্ডার হয়ে যেত।

তবে কি এই দুটো মার্ডারের সঙ্গে গোলাপের কোন সম্পর্ক আছে? গোলাপই কি মার্ডার করছে? কিন্তু গোলাপ নিজেই তো ইনভেস্টিগেটিং অফিসার।

অবশ্য এ সবই তার অনুমান। গোলাপ যে খুনি তার কোন প্রমাণ নেই। ব্যক্তিগত অনুমান দিয়ে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। এই ধরনের খুনের মোটিভ মোটামুটি ক্লিয়ার। কিন্তু প্রমাণ? তদুপরি গোলাপের পজিশান।

হঠাৎ ওর মনে হল সোহিনীর সঙ্গে আলোচনা করলে যেমন হয়। ওর সন্দেহের কথাগুলো অন্তত জানানোর দরকার। সত্যিই যদি ও অপরাধী হয় তাহলে এই ধরনের পেশেন্টকে বাইরে ছেড়ে রাখা উচিত নয়। কিছু না হলেও তার ট্রিটমেন্ট প্রয়োজন।

সোহিনী সিংয়ের মোবাইল নাম্বার ওর কাছে ছিল। আসলে ও আর সোহিনী বি এসসিতে একই সঙ্গে পড়াশুনা করেছে। সোহিনীর সঙ্গে তার বন্ধুত্বও বেশ ভালো। বি এসসির পর দুজনের প্রফেশান আলাদা হয়ে যায়। কিন্তু দেখা হলে কথাবার্তার শেষ থাকে না। যদিও দুজনেই দুজনের প্রফেশানে ব্যস্ত।

মোবাইলে পেতেই ও জিগ্যেস করল,—মাই ডিয়ারেস্ট সোহিনী, উড ইউ প্লিজ মিট মি অ্যাটওয়ান্স।

—হোয়াই স্যার? তুমি কি বহুত ফ্যাসাদে পড়েছ, এনি ক্রাইম। অর লাভ?

—সোহিনী, তুমি মাইরি কোনদিনও এতো সন্দেহ বাতিক ছিলে না। পুলিসে চাকরি করতে করতে যাকে পাও তাকেই সন্দেহ করে বসো। এ রকম করলে ম্যারেড লাইফে বহুত ঝামেলায় পড়ে যাবে।

—ডোন্ট ওয়ারি মাই ডিয়ার ডক। খুব জলদি জলদি সাদি হচ্ছে না। পুলিস লেড়কিকে কোই আদমি ঘরের বহু বানায় না।

—আমি বানাতে পারতাম। দুটো কারণে হবে না।

—তোমার মনের মধ্যে এতো প্যাঁচ ছিল। আমি ভাবতে ভি পারি না।

—এতে আবার প্যাঁচের কী দেখলে? দেখতে শুনতে তুমি বেশ ইয়ে।

—হোয়াট ইয়ে?

—তাড়াতাড়ি আমার বাড়ি চলে এসো, তখন বলব।

—ইউ আর ভেরি নটি। অলরাইট, আয়াম কামিং।

অফ ডিউটিতে বা সামাজিক কোন গেট টুগেদারে সোহিনী সালোয়ার কামিজই পরে। অফিসিয়াল ডিউটিতে ফুল ইউনিফর্ম। অম্লানের বাড়ি এলো চাঁপা রঙের শালোয়ার কামিজ আর জংলাসবুজ রঙের ওড়নায়। পুলিসে চাকরি করলেও সাজগোজে সে বেশ আধুনিকা। এবং, মোটামুটি অবিবাহিত এক যুবকের মাথা ঘোরানোর মতো চমক নিয়ে হাজির হোল অম্লানের বাড়ি। স্বপ্নাদি তখন রাজলক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে গল্প করছেন। ওর দিকে এক নজর দৃষ্টি দিয়েই অম্লান বলল,—আমার বাড়িতে আমার দুজন অভিভাবিকা আছেন। একজন আমার

মা, অন্যজন নিজের দিদি না হলেও দিদি।

—কাহে ইত্‌না ফিরিস্তি বানাতা। যা বোলবার আছে ক্লিয়ার ইট আউট।

—হ্যাঁ সেটাই তো বলছি। যা চম্‌কি মেরেছ না, বলতে ইচ্ছে করছে, আই লাভ ইউ।

—ইউ নটি বয়।

—কিন্তু বলা যাবে না। একজন পাঞ্জাবি মহিলার হাতে তরকা রোটি আমার মায়ের না পসন্দ।

—আর দুসরা কার কথা বললে যেন? কোই রিলেটিভ?

—স্বপ্নাদি। অসুবিধা হবে না। খুব লিবারেল। কথাটা পাড়ব নাকি?

—অম্লান তুমি কি জানো, আই নো ক্যারাটে। আই ক্যান ইউজ ফায়ার আর্মস?

—সো হোয়াট? প্রেম কোন অস্ত্র বা গুণ্ডাকে ভয় করে না। পুলিসকেও না।

—তুমি কি এইসব আন্‌সান্‌ বাতেলা শোনাবার জন্যে আমাকে কল করেছ?

অম্লান হাসল। সিগারেট ধরালো। তারপর বলল,—ইউ আর মাই ফ্রেন্ড। তোমার সঙ্গে কি একটু ঠাট্টা ইয়ারকি করতে পারি না?

—ওহ্‌ সিওর। ইট ইজ অলএয়েজ ওয়েলকাম টু মি। নাউ টেল মি হোয়াট ইজ ইওর প্রবলেম। মুসিবত কেয়া?

—দাঁড়াও তার আগে চা বলি। কী খাবে বলতো?

—নাথিং বাট ওনলি টি।

সোফায় বসে বসেই হাঁক দিল,—স্বপ্নাদি, স্বপ্নাদি। দু কাপ চা। জলদি।

সিগারেটে মোক্ষম টান দিয়ে মিনিট খানেক কী যেন ভাবলো। তারপর শুরু করল,—সোহিনী, গোলাপসুন্দর বসু তো তোমার বস্‌।

—হ্যাঁ।

—গোলাপ আমাদের থেকে দু ইয়ার সিনিযার ছিল। তবে উই ওয়্যার ভেরি মাচ ইনটিমেট টু ইচাদার। যদিও নয়নতারার ওপর আমার একসময়ে দুর্বলতা ছিল।

কথা কেড়ে নিয়ে সোহিনী বলল,—আমার ওপরও তোমার থোড়া বহুৎ উইকনেশ হ্যায়। আভিতক। তো কিত্‌না লেড়কিসে অ্যায়সা মহববত কি বাহানা চালায়গা?

—তুমি আমার কথা শুনবে না উল্টোপাল্টা ডায়লগ শুরু করবে। শোন, কথাগুলো খুব সিরিয়াস। প্র্যাকটিক্যালি গোলাপ আর নয়নতারা পাঁচবছর ঝুলে ছিল। নানান কারণে ওদের বিয়ে হচ্ছিল না। শেষকালে আমিই ইনিসিয়েটিভ নিয়ে ওদের বিয়েটা দিয়ে দিই।

—স্যাক্রিফাইস?

—নাহ্‌। ওদের প্রেমকে আমি একটু সাহায্য করেছিলাম। স্যাক্রিফাইসের কোন ব্যাপার নেই। দেবদাস হওয়া আমার কোষ্ঠীতে লেখেনি। কোন মেয়েকে ভাললাগা আর কোন মেয়েকে ভালবাসা দুটো আলাদা জিনিস। নয়নকে ভাল লাগাটাই আমার দুর্বলতা।

—আন্ডারস্ট্যান্ড। দেন?

—এবার তোমার বসের বিরুদ্ধে আমার কিছু সন্দেহের কথা তুলব। তোমার রাগ হবে না তো!

—নাহ্‌। হবে না। তুমি বলো।

ইতিমধ্যে সিঙ্গাড়া লাড্ডু এবং চা সমেত স্বপ্নাদি ঘরে ঢোকে। সেগুলো টেবিলে রাখতে

রাখতে তার প্রথম কথা,—একটা মেয়ে পেয়েছি।

—তোমাকে তো বলেইছি স্বপ্নাদি, ইমিডিয়েট আমি মাথা মোড়াবো না।

—এ মেয়ে সে মেয়ে নয়।

—তবে?

—কাজের মেয়ে। দিনরাত আমি তোমাদের ফাইফরমাস খাটতে পারব না।

—আমিও তো সেই কথা বলি। মেয়েটাকে কবে আনবে?

—সত্যিই রাখবে তো?

—সত্যিই আমি তোমার ওপর মাঝে মাঝে অন্যায় করে ফেলি স্বপ্নাদি। যত তাড়াতাড়ি পার মেয়েটিকে আনার ব্যবস্থা করো। তোমার ওপর খুব চাপ পড়ে যাচ্ছে। আয়াম স্যরি।

—ইস্। দরদের আর শেষ নেই।

স্বপ্নাদি বেরিয়ে গেল। ওর দিকে তাকিয়ে সোহিনী বলল,—ভেরি নাইস দিদি। শি লাভ্স্ ইউ লাইক হার ওন ব্রাদার। হ্যাঁ বোলো, কেয়া বোলনে চাতা।

লাড্ডুটায় একটা কামড় বসিয়ে অম্লান মানালির রাতের ঘটনা থেকে শুরু করে আজ সকালের গোলাপের সঙ্গে আলোচনার সবটাই তার কাছে তুলে ধরল।

খাবার আর চা খেতে খেতে সোহিনী খুব মন দিয়ে সব কিছু শুনছিল। আসলে গোলাপসুন্দরকে নিয়ে তার নিজেরও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ ছিল। তবু, সে পুলিস গার্ল। তাকে অনেক রিজাভর্ড থাকতে হয়। সব কথা সবার সামনে বলাও যায় না। উচিতও নয়। তদুপরি গোলাপ তার বস। বসের এগেনস্টে কিছু বলা মানে পুরো দায়িত্ব নিয়েই বলা। যেটা এই মুহূর্তে সে পাচ্ছে না।

—কী ভাবছ সোহিনী? আমার সন্দেহটা কি অমূলক? আমাকেও কিন্তু অনেক ভেবে, অঙ্ক কষে গোলাপের বিরুদ্ধে কিছু কথা তোমার কাছে বলতে হচ্ছে। তোমার মতামত চাইছি সোহিনী।

—কথাটা তুমি যোখন তুললে, দেন আই মাস্ট স্যে, মেরা ভি অ্যায়সা কুছ ডাউট হ্যায়।

—কী রকম?

—তো পহেলে সে শুনো। সোনাগাছি রেড জোনে এক লেড়কি খুন হয়েছিল।

—হ্যাঁ জানি। কাগজে খবর বেরিয়েছে।

—মেরা ফার্স্ট ডাউট উধারসেই হুয়া। এক টুটা হুয়া ওয়াচ গ্লাস। ডেডবডিকা পাশ, উই ফাউন্ড আ পিস অব ফাইন গ্লাস। অলসো, দ্য সেম পিসেস অব গ্লাস ডেডবডির হাতেও ছিল।

—এ দিয়ে কি প্রমাণ হোল?

—নেহি, প্রমাণ কা বাত নেহি। স্রেফ শক্‌কা বাত হোতা হ্যায়। উই অলসো ডিসকভারড্ দ্য ব্রোকন গ্লাস অব মিস্টার গোলাপসুন্দর বাসু। হাঁ জি, বসের হাতের রিস্ট ওয়াচকা শিসা ব্রোকেন থা। আউর ঐ ব্রোকেন শিসা সুবীর কা পাস হ্যায়।

—তুমি বলছ, একই ওয়াচের গ্লাসের একটা টুকরো বিছানায় ছিল, আর এক টুকরো মেয়েটির হাতের মুঠোয়। আর ঐ দুটো যার অংশ সেটা তোমার সুবীরবাবুর কাছে? এটা একটা প্রমাণ হতে পারে। তার মানে তুমি বলতে চাইছ সে রাতে গোলাপ ঐ মেয়েটির কাছে গিয়েছিল?

—মাইট বি।

—নো, নো সোহিনী, গোলাপকে আমি অনেক দিন ধরে চিনি। অবশ্য মাঝের ছ সাত মাস বাদ দিয়ে। এরি মধ্যে, নাহ্ সোহিনী, গোলাপ ব্রথেলগার্ল নিয়ে এনজয় করবে এটা ভাবতে পারছি না।

—বাট, হিউম্যান বিয়িং এটা হওয়া পসিবল নট অ্যাবসার্ড। জাস্ট থিঙ্ক, বস্ এক লেড়কিকে সাদী করেছিল। উসকি বাদ, অ্যাট প্রেজেন্ট দে আর সেপারেটেড।

—সো হোয়াট?

—স্যরি অম্লান, ইসসে জাদা মুঝে কুছ মাত পুছো। তোম মেল পার্সনস আর ভেরি মাচ হাঙরি ফর ফিমেল ফ্লেস। ডু ইউ ডিনাই?

—অন্য প্রসঙ্গ এসে যাচ্ছে। পবে একদিন তোমাব সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করে প্রমাণ করে দোব ছেলেদের থেকে মেয়েদের সেক্স হাঙ্গার অনেক বেশি।

—ইজ ইট?

—হ্যাঁ ম্যাডাম। ঝুরি ঝুরি প্রমাণ আছে। দরকার পড়লে মহাভারত খুলে দেখাতে পারি।

—ওয়েল, তুমি তাহলে কী বলতে চাইছ?

—একটাই কথা বলছি, দুম্ করে একজন ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের বড় চাঁইকে ফাঁসাবার চেষ্টা করো না। যদি ব্যাপারটা মিথ্যে হয় তুমি কিন্তু বিপদে পড়ে যাবে। ইভন তোমার চাকরিটাও চলে যেতে পারে। কাচের ব্যাপারটা হাতে রেখেও তোমাকে দুটো জিনিস প্রমাণ করতে হবে। গোলাপ ব্রথেলে গিয়েছিল এবং সে নন্দিতার বাড়িও গিয়েছিল। খুব শক্ত।

সোহিনী কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর একসময় বলল,—ডু ইউ নো অম্লান, আমার কিছু ইনটুইশান কভি কভি একদম সাচ্ হো যাতা। দেয়ার ইজ নো লজিক। ব্যাট...অ্যাজামশান বহুৎ কারেক্ট হো যাতা। তো এক কাম করো। তুমি কিন্তু আমাকে পহেলেই বলেছ, বোস সাহাবকে লিয়ে তোমার কুছ শক্ আছে। তো—

—তো?

—আমি ইনডিভিজুয়ালি থোড়া ইনভেস্টিগেট করনে চাতা। আদার দ্যান মাই প্রফেশান। অর মাই সারভিস। কেয়া তোম মুঝে হেল্প করেগা?

—বল, তুমি কি হেল্প চাও? কিন্তু মনে রেখো আগুন নিয়ে খেলতে যাচ্ছ।

—যো ডেঞ্জার আয়েগা ও মেরা হোগা। তোম ফিকর্ মত্ করো। ইউ উইল বি অলওয়েজ আউট অব পিকচার।

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর অম্লান বলল,—গোয়েন্দাগিরি করতে হবে বলছ? বাট মাইন্ড ইট, গোলাপসুন্দর ইজ নয়নতারার হাজব্যান্ড।

—যদি কোই আদমি ক্রাইম করে, জজ সাহাবকা পিতাজি হোনেসে ভি, উন্‌কা পানিশমেন্ট হোগাই হোগা। ক্রাইম ডাজনট্ পে।

আবার অম্লানের নীরবতা।

—কেয়া শোচতা হ্যায়? আমি একটা লেড়কি হয়ে, মাইট বি আ পোলিস লেডি, যো রিস্ক লেনে যাতা, তোম এক মর্দ হো কর, পিছু হট যায়গা? ইসকি আলাবা তোম এক সাইকিয়াট্রিস্ট ভি হো। তোম কিসিকা নোকর নেহি হ্যায়। সোসাইটি মে তোম এক ইজ্জতদার আদমি, তো ডরনা কিস্‌কা?

—দুর বাবা, ভয়ডরের কথা হচ্ছে না। ঝাঁপ দেবার আগে জলের গভীরতা দেখে নেওয়া

দরকার। ঠিক আছে, আমার একটা কথা শোন। গোলাপসুন্দর বসু আমার মতে একজন সাইকো পেসেন্ট। এই ধরনের পেসেন্টরা ভায়োলেন্ট হতে পারে। মার্ডার করতেও পারে। কিন্তু যে দুটি মেয়ের মৃত্যু নিয়ে আমরা তদন্ত করতে চাইছি, সেটা কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে কিছু ধারণার ওপর। যে ধারণা দিয়ে প্রমাণ করা শক্ত হবে গোলাপসুন্দর খুনি। একটা কাচের টুকরো দিয়ে, কি জানি। তবে আমি নিজেও মনে প্রাণে বিশ্বাস করি না গোলাপ কাউকে খুন করতে পারে।

—এমোন কিছু হলে আই উড বি দ্যা ফাস্ট পারসন হু উইল বি ভেরি মাচ হ্যাপি। বিসওয়াস যাও অম্লান, আই লাইক মাই বস, ফর হিজ পার্সোনালিটি, ফির হিজ ডিটেকটিভ টেম্পারামেন্ট, অ্যান্ড হিজ স্মার্টনেস। অ্যায়সা অফিসার মিলনা বহুৎ তকদির কা বাত্। লেকিন—

—তুমি ঠিকই বলেছে সোহিনী। মনেপ্রাণে আমি চাই, বা আমি নিজেকে বলেছি এই দুটো খুনের সঙ্গে গোলাপ যেন কোন মতেই ইনভলভড্ না হয়।

হঠাৎ সোহিনী উঠে দাঁড়ালো। চিন্তাক্লিষ্ট মুখে বললে,—ইয়েট দেয়ার আর সাম মিস্টেরিয়াস পয়েন্টস্?

—মিস্টেরিয়াস পয়েন্টস্ মানে?

—অ্যাকর্ডিং টু ইওর ডায়গনিসিস, মিস্টার বসু ইজ টু সাম এক্সটেন্ট স্যাডিস্ট। হি ইজ অলসো আ টাইম বিয়িং পেসেন্ট অব অ্যামনেসিয়া। দ্যাট টাইম হি লুজেস হিজ মেমারিজ। বিভোর রিগেইনিং হিজ ফুল রিয়ালিস্টিক সেন্স্ হি কুড ডু এনিথিং হুইচ উই কান্ট ইমাজিন। হাম ঠিক বোলা না?

—তুমি কী ভাবে এগোতে চাও?

—আমার কাছে একটা নিউজ আছে।

—কী নিউজ?

—যিস্ রাতমে সতীকা মার্ডার হুয়া, গোলাপজি ওহি রাতে তিনসে সাড়ে তিনতক ঘর পে নেহি থা। হি ওয়াজ নট ইন হিজ হাউস।

—তুমি জানলে কী করে?

—আমি বসে থাকছি না অম্লান। আই হ্যাভ অলরেডি স্টার্টেড মাই ইনভেস্টিগেশান। গোলাপজির অ্যাবসেন্সে আমি গোলাপজির ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম। ওর মেল সার্ভেন্টকে পুছতাছ করেছি।

—কী বলেছে তামান্না?

—উস্ দিন ইভনিং-এ গোলাপজি এক দোস্তের ম্যারেজ অ্যানিভারসারি অ্যাটেন্ড করতে গিয়েছিল।

—ম্যারেজ অ্যানিভারসারি? কার?

—কমল সেন। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার।

—হ্যাঁ। আমি চিনি তাকে। তারপর?

—আমি কমলজির সঙ্গে দেখা করিয়েছিলাম। সেই ইভনিং-এ বহুত ড্রিঙ্ক করিয়েছিল গোলাপজি।

—বেশ, তারপর?

—কমল সাহেব আউর উনার বিবিজি, দোনো মিলকর এক ট্যাক্সি পাকাড়কে

গোলাপজিকো কোঠিমে ভেজিয়ে দিয়েছিল।

—তখন কটা হবে?

—রাত এগারো সাড়ে এগারো হোবে।

—এ ব্যাপারে গোলাপকে কিছু জিগ্যেস করেছিলে?

—হাঁ। লেকিন উন্‌সে স্ট্রেট কোই আনসার না মিলি। অলসো আমি ওয়েন্ট টু মিট শান্তা বিবি। মউসি অব দ্যাট বিল্ডিং। ইয়ে শান্তা বিবি এক চীজ।

—কেন?

—কিঁউ নেহি? সাপোজ, আমি তুমার হাউসে এলাম, তো, আমি যদি তোমার জান পয়ছান হই তো তুমি হামাকে জরুর চিনতে পারবে।

—হাঁ। তা তো পারবই।

—উয়ো রেড জোন এরিয়া হাম পোলিসবালোকে হরদম যানে পড়তা। হামারা সাহেব ভি দো এক দফে গিয়া থা। তো শান্তা মউসি কিঁউ উসকো পয়ছানা নেহি?

—সেটা নাও হতে পারে। একজন সি আই ডি অফিসার, রাত দুপুরে কোন এক বারবনিতার ঘরে যাবে, এটা চট্ করে কেউ বিশ্বাস করবে?

সোহিনী হো হো করে হেসে ওঠে। তারপর বলে,—অম্লান তোম বহুত নাদান হ্যায়। তোম কেয়া জানো করাপসানকা রুট সোসাইটির কতো অন্দরে ঘুষে গেছে! ইয়ে হ্যায় এক ডীপরুটেড স্যোশাল ডিসিজ।

—হুঁ। কিন্তু আই উইটনেস যদি চিনতে না চায়, তোমার তো কিছু করার নেই।

—বাত সহি আছে। লেকিন এক খুশখবর ভি আছে।

—সেটা কী?

—শান্তা মউসি বহুৎ উলঝন মে গির পড়ি যব হাম আউর সুবীর উসকো ক্রশ এগজ্যাম কিয়া। দ্যাট টাইম শি গেভ আস সাম ডেসক্রিপশান অব দ্যাট ম্যান। দ্য লাস্ট ভিজিটর অব সতী অন হার লাস্ট নাইট।

—চেহারার ডেসক্রিপশানটা কি গোলাপের মতো?

—এগজ্যাক্টলি।

মাথা নাড়তে নাড়তে অম্লান বলল,—নাহ্ সোহিনী, তোমার এই প্রমাণ বা যুক্তি ধোপে টিকবে না। শান্তাবিবি কখনোই গোলাপকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আইডেন্টিফাই করবে না। অনেকটা গোলাপের মতো দেখতে বলাটা কোন কাজেই লাগবে না।

—দ্যাট আই নো ম্যান। উসি লিয়ে তো আমি তোমার মদত চাইছি।

—বেশ, তুমি এগোও। আমার জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে আমি তোমাকে হেল্প করব। তবে একটা কথা, আমার মনে হচ্ছে তুমি বেশ কিছুদিন ধরে তোমার বসের হোয়্যার অ্যাবাউটস্ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ। এমন কি সে কোথায় যায়? কত রাতে বাড়ি থেকে বেরোয়, কটায় ফেরে, তাই না?

—অম্লান, ইয়ে হ্যায় মেরা ডিউটি। অ্যান্ড আয়াম অলওয়েজ আ ডিউটি বাউন্ড পাবলিক সার্ভেন্ট।

—নাহ্ সোহিনী, আমি তোমায় কোন দোষ দিচ্ছি না। নয়নতারা আমার কাছে গোলাপসুন্দর সম্বন্ধে সব কিছু বলার পরই, আমি খুবই দোদুল্যমানতার মধ্যে ছিলাম। শুধু

তাই নয় গোলাপ যদি এই রোগে ভোগে তাহলে ও ওর উর্দির প্রভাব খাটিয়ে আরো অনেক মেয়ের ক্ষতি করতে পারে। অনেক মেয়েকে খুনও করতে পারে। তাই আমি ওকে ডেকে অনেক কিছুই জিগ্যেস করি। বাট—

—বাট?

—দুটি মেয়ের খুনের তদন্ত ও করছে। কিন্তু ও একবারের জন্যেও নিজেকে সন্দেহ করেনি। ভেরি মাচ ইন্টারেস্টিং কেস।

—নো অম্লান। আই থিঙ্ক দিস ইজ ভেরি মাচ কমপ্লিকেটেড কেস।

দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক উত্থানপতন এতো বেশি অনিশ্চিত হয়ে গেছে কোন কিছুই মনোনিবেশ করে সমাধানের রাস্তায় এগোতে পারছে না পুলিস। যে কোন কেসই, পুলিস যদি মনে করে কেসটাকে সলভ্ করতে হবে, তা সলভ্ হয়ে যায়। ক্যালকাটা পুলিসে যোগ্যব্যক্তির অভাব নেই। ট্যালেন্টেরও অভাব নেই। দক্ষতা আর অভিজ্ঞতাও প্রচুর। তবু পুলিসকে জনতার গাল খেতেই হয়। জনতার দরবারে আজকের পুলিস নিতান্তই ঘুষখোর এবং অপদার্থ।

টেবিলে বসে দু আঙুলের কায়দায় পেপার ওয়েট ঘোরানোটা গোলাপসুন্দরের অভ্যেস। আসলে এটা তার চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। খুব মনোযোগ দিয়ে যখন সে কোনকিছু ভাবে বিশেষ করে অফিসের টেবিলে বসে, তখন কাচের ওপর পেপার ওয়েট ঘুরতেই থাকবে।.

সতী আর নন্দিতার কেসদুটো এখনও পর্যন্ত কুয়াশা। সতীকে যে মেরেছে, তার মোটিভ বোঝা না গেলেও সে সম্ভবত সতীর পরিচিত কেউ নয়। যে লোকটি সতীকে নিজের রক্ষিতা করার জন্যে উদ্‌গ্রীব ছিল, তাকে ধরা হয়েছিল। তাকে ক্রশকরাও হয়। কিন্তু লোকটা নিতান্তই কামুকে ব্যবসাদার। ব্যবসা করে। টাকাকড়ি আছে। আর আছে নিঃসন্তান বিকলাঙ্গ অসুস্থ বউ। তা সেই লোকটি তার পূর্ণ যৌবনটিকে তো বিকলাঙ্গ স্ত্রীর উদ্দেশে উৎসর্গ করে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নিয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করতে পারেন না। কেই বা পারে?

গোলাপ হোঁচট খেল। তার চৌত্রিশবছরের পূর্ণ যৌবনে লালবাবুর মতো তার স্ত্রী নয়নতারা একধরনের মানসিক অসুস্থতা নিয়ে তাকে ছেড়ে গেছে। লালবাবুর বউয়ের সঙ্গে নয়নতারার তেমন কোন অমিল নেই। তাকেও না কোনদিন আবার যৌনতৃষ্ণা মেটাবার জন্যে কোন নোংরা জায়গায় যেতে হয়। নোংরা জায়গায় যেতে হবে না বলে সে নন্দিতার সঙ্গে মিশতে চেয়েছিল। হ্যাঁ মেশাই। ঠারে ঠোরে লিভ টোগেদার। প্রস্তাবও দিয়েছিল। এ ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না। কারণ নন্দিতা খুবই বারমুখো মেয়ে। তার অনেক পুরুষবন্ধু আছে। তার প্রফেশনটাই বারমুখো। অর্থাৎ এসব মেয়েরা ঠিক সংসারী হতে পারে না। তদুপরি নন্দিতা সম্ভবত সেটা চায়ওনি। তাই যদি চাইতো তাহলে অবিবাহিতা একটি মেয়ে কোন

হিসেবে রাত আড়াইটে নাগাদ কোন ছেলেকে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে আসতে দরজা খুলে দেয়।

অথচ তার মনে আছে সেও ঐ একই রাত্রে নন্দিতার বাড়ি গিয়েছিল। নিজের কাছে স্বীকার করতে তার দ্বিধা নেই। ইদানীং রাত গভীর হলেই তার শরীর ছিঁড়ে উত্তেজনার পারদ যে কোথায় উঠে যায়! সে নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। সেই কারণেই সে সেই রাতে নন্দিতার ফ্ল্যাটে গিয়েছিল। জানাতে গিয়েছিল নন্দিতা রাজি থাকলে তারা লিভ টোগেদার করবে। কিন্তু কোত্থেকে কী হয়ে গেল। কোন শুয়োরের বাচ্চা এসে নন্দিতাকে খুন করে বেরিয়ে গেল। কোন প্রমাণ পর্যন্ত রেখে যায়নি। নন্দিতার পার্সোন্যাল ডায়েরি ঘেঁটেও তার কোন প্রেমিকের নাম পাওয়া যায়নি। যার যার নাম ছিল তারা তার অফিস কোলিগ। তবে, একটা বিপজ্জনক নামও ছিল। গোলাপসুন্দর বসু। নন্দিতার ডায়রির জবানীতে সে নাকি গোলাপকে খুব পছন্দ করতো। গোলাপকে নাকি তার অদেয় কিছু নেই এমন কথাও লিখে রেখেছে।

বড় সর্বনাশা কথা। গোলাপ মনে মনে নন্দিতার দেহটাই চেয়েছিল। মনটন নয়। মন একজনকেই দিয়েছিল। সে নয়নতারা। আর কাউকে মন দেওয়ার মতো ছেলেমানুষি সে করছে না।

কিন্তু? হ্যাঁ আরো একটা 'কিন্তু' 'কিন্তু' খোঁচা তার মনের মধ্যে খোঁচাখুচি শুরু করেছে। অম্লানের স্বপ্নাদি। সে নাকি অম্লানের থেকে বয়েসে বড়। তাহলে, হয়তো তার থেকেও বয়েসে বড়। তার মানে এই নয় যে তাকে দিদি টিদি বলে ডাকতে হবে। কিন্তু শরীর, চেহারা, আর মুখশ্রীতে কামনার ছড়াছড়ি। মহিলা এতোদিন কি ভাবে এককজীবন কাটাচ্ছেন এটাই বেশ ভাবার। সে তো ভাবতেই পারে না, জীবন একবারই পাওয়া যায়। চেতনার সুইচটা অফ হয়ে গেলে সব অন্ধকার। সে আর কখনও এই গ্রহে ফিরবে না। তাই জীবনটাকে ধুসর করে রাখাটা তার কাছে নিতান্ত বোকামি।

গতকাল রাত্রে ঘুমের মধ্যে ছটফটানি শুরু হতেই ওর মনে প্রথম যেমুখটা ভেসে উঠেছিল সেটা স্বপ্নাদির। মাত্র কয়েক মিনিটের দেখা। কিন্তু মাদকতাময় চোখ আর ঠোঁট টেপা হাসিটা সে কিছুতেই ভুলতে পারেনি। পারছেও না।

সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছিল। পাজামা পরাই ছিল। পরতে গিয়েই চমকে উঠেছিল। কালো রঙের হাইনেক পাঞ্জাবি। শান্তাবিবি এই রকম একটা পাঞ্জাবির কথা বলেছিল। কিন্তু তখন আর অন্য কিছু ভাবার সময় ছিল না। ঐ পাঞ্জাবিটাই গলিয়ে নিয়ে একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়েছিল। রাত তখন দেড়টা। বাইক নিয়ে সোজা চলে এসেছিল অম্লানদের বাড়িতে। সারা বাড়ি অন্ধকারে ডুবে আছে। এবং বাইরে থেকে কোনমতেই বলা যাবে না স্বপ্নাদি তখন কোন্ ঘরে শুয়েছিল। শুয়েছিল নাকি ঘুমোচ্ছিল? নাকি কোন বিশেষ কারো কথা চিন্তা করছিল? সেই বিশেষ একজনটা কে? সে নিজে?

সেই মুহূর্তে তার মনে হয়েছিল রেনপাইপ বেয়ে ওপরে উঠে গিয়ে স্বপ্নাদিকে খুঁজে নিতে। কিন্তু তার বড় হঠকারি ব্যাপার হবে। স্বপ্নাদিকে পেতে গেলে চাটু তাতাতে হবে। নইলে—

তারপর সে বাইক ঘুরিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু রগ দুটো দপদপ করছিল। অসম্ভব এক অন্যতর খিদে তাকে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছিল। তারপর সে বাইক চালিয়ে ছিল উম্মাদের মত। তারপর?

এই মুহূর্তে আর কিছুই তার মনে নেই। মনে আছে তাকে তামান্নাই ডেকে তোলে। চায়ের পেয়ালা নিয়ে।

চারপাঁচ ঘণ্টার মতো ব্ল্যাঙ্কনেস। স্মৃতিবিলোপ। অ্যামনেসিয়া! রোগের নামটা সে জেনেছে অম্লানের কাছ থেকে। অ্যামনেসিয়া। কিন্তু স্মৃতিবিলোপ হলে কি এতো তাড়াতাড়ি সেটা ফিরে আসে? আসতে পারে? নাকি সোমনাবুলিজ্‌ম্? সেও তো এক অচেতন অবস্থা।

গোলাপসুন্দর টেবিলে রাখা জলটুকু এক চুমুকে শেষ করে দিয়ে ভাবছিল বিকেলের দিকে একবার অম্লানের চেম্বারে যেতে হবে। চব্বিশঘণ্টার মধ্যে চারপাঁচ ঘণ্টা সে কোথায় থাকে? নিশ্চয় কোন একটা জগতে থাকে। সেটা সে বুঝতে পারে না কেন? এতো অল্প সময়ের জন্যে কি অ্যামনেসিয়া কাউকে গ্রাস করতে পারে?

নিজের অসুস্থতা এবং দুটি আনসলভ্‌ড কেস নিয়ে গোলাপসুন্দর বেশ বিব্রত। এর ওপর ওপরঅলার তাগিদ। ডিসি ডিডিকে কেমন করে বোঝবে, বেশ্যার ঘরে উড়ো খদ্দেরের হদিশ পাওয়া আর বনের মধ্যে একটা বনচড়াইকে খুঁজে পাওয়া একই জিনিস। একটি রাতচরা প্রায় ভালগার মেয়ে কোথায় কখন তার কোন বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে রাত কাটালো, এবং তাকে মার্ডার করল, এবং সলিড কোন প্রমাণ না রেখে পালিয়ে গেল, তাকেও খুঁজে বার করা শক্ত এই কলকাতা শহরের জনজঙ্গলে। এমনকি নন্দিতার ডাইরিতেও কোন রহস্যময় যুবকের নাম লেখা নেই। যাকে অ্যাটলিস্ট সন্দেহ করা যায়।

গোলাপ আর একটা সিগারেট ধরাবার মুহূর্তেই কালোরঙের বেজায় ভারী টেলিফোনটা গাঁক গাঁক করে ডেকে উঠল।

—হ্যাঁলো, হ্যাঁ গোলাপসুন্দর বসু স্পিকিং।

—স্যার আমি সুবীর বলছি।

—ও ইয়েস, বলো। এনিথিং রঙ। তোমার কণ্ঠস্বর খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ স্যার। এগেন দ্য সেম টাইপ অব মিসহ্যাপ।

—তুমি কী বলতে চাইছ?

—ঠিক যে ভাবে, যে প্রসেসে সতী এবং নন্দিতা দত্ত খুন হয়েছিল, ঠিক সেই ভাবেই খুন হয়েছে আর একটি মেয়ে।

—হোয়াট?

—হ্যাঁ স্যার। দিস ইজ ফ্যাক্ট।

—তুমি কোথা থেকে বলছ?

—বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড থেকে। আপনি কি স্যার অভিনেত্রী রুবি পালিতের নাম শুনেছেন?

—ওহ্ সিওর। তোমার বউদি একবার সিরিয়ালে অ্যাকটিং করেছিল। অবশ্য নেহাতই শখে। তখনি ঐ মেয়েটির সঙ্গে ওর আলাপ হয়। মেয়েটিকে নিয়ে নয়নতারা অনেক বারই চায়ের আসর বসাতো ওদের বাড়িতে। ইয়েস আই নো হার ভেরি ওয়েল। আরে হ্যাঁ দাঁড়াও মেয়েটি কবে মারা গেছে বলছ?

—গত পরশু।

—ওহ্ মাই গড। পরশু সন্ধেবেলাতেই তো টালিগঞ্জ এনট্রেন্সের মুখে যেখানে উত্তমকুমারের স্ট্যাচু আছে সেখানেই দেখা হয়েছিল। রুবি পালিতের সঙ্গে। আশ্চর্য, ভারি

আশ্চর্য। তা বডি কোথায় এখন?

—আপনি তো স্যার বর্তমানে অসুস্থ। ছুটিতে আছেন। তাই আপনার ফার্স্ট্ অ্যাসিসটান্ট সোহিনী সিং কেসটা ডীল করছে।

—গুড। ভেরি গুড। কিন্তু বডি এখন কোথায়? তার ফ্ল্যাটেই আছে?

—না স্যার। বডি পুলিস মর্গে চলে গেছে।

—তুমি এতোক্ষণ ওখানেই ছিলে?

—হ্যাঁ স্যার।

—সোহিনী কোথায়?

—থানায়।

—তুমি কি থানায় ফিরবে?

—আমি একবার আপনার সঙ্গে দেখা করব।

—আসতে পার। তবে সোহিনী ইজ গুড এনাফ।

—জানি তবু আপনার সঙ্গেই আমার কথা আছে।

—তোমার খুব কিছু সিরিয়াস ব্যাপারে ভাবিত মনে হচ্ছে।

—গেলেই সব বুঝতে পারবেন।

—ওয়েল। ডু কাম প্লিজ।

ডিসি ডিডি পলাশ গুপ্ত কিন্তু দুম করে রেগে গেলেন। এই ইয়াং মেয়েটা হঠাৎ নিজেকে কী ভেবে ফেলেছে সেটাই তাঁর মাথায় ঢুকছিল না। তারওপর তার অ্যালিগেশনটা এমন একজনের ওপর যার ওপর তাঁর নিজের অগাধ বিশ্বাস আছে। পলাশ গুপ্তের মতে শুধু উঁচু পদে নয়। গোলাপসুন্দরের মতো ঝানু গোয়েন্দা অফিসার এখন তাঁর ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টে নেই। আর তার নামেই কিনা সোহিনী পরের পর যে কটা মার্ডার হচ্ছে সন্দেহের তীরটা ছুড়ে দিচ্ছে। পলাশ গুপ্তর চুরুট খাওয়ার বিশাল নেশা। পলাশ গুপ্তকে চুরুট ছাড়া চিন্তাই করা যায় না। একটা নতুন চুরুট ধরিয়ে সরাসরি সোহিনীর দিকে তাকিয়ে বললেন,—সোহিনী, আমার মনে হচ্ছে তুমি গোলাপের ওপর ভেরি মাচ জেলাস।

—নো স্যার। বিলকুল নেহি। রাদার আই রেসপেক্ট হিম।

—মনে হয় না। কলকাতা শহরে পর পর তিনটি খুন হোল কারো ব্যক্তিগত আক্রোশে।

—সার, যে কোন হোমিসাইডকা জনম হোতা হ্যায় কিসিনা কিসিকো পার্সোনাল গ্রাজসে।

—সব সময়ে নয়। তুমি কি মনে করো রোজ এতো এতো পলিটিক্যাল মার্ডার হচ্ছে সেগুলো কারো পার্সোন্যাল গ্রাজ থেকে? না, তা নয়। পলিটিক্যাল মার্ডার কারো ব্যক্তিগত

আক্রোশ থেকে তত বেশি জন্ম নেয় না। অধিকাংশক্ষেত্রে কোন বিশেষ কাউকে নিয়ে দল যখন সঙ্কটে পড়ে তখন পার্টিরই ডিসিশানে সেই বিশেষ ব্যক্তিটিকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কাঁটা তোলার জন্যে। আবার কখনও কখনও পার্টির নির্দেশে পাটি শত্রুকে খুন করা হয়। সেগুলো ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকে নয়। ডু ইউ ফলো?

—জরুর স্যার। ইয়ে বাত তো ঠিকই হ্যায়। লেকিন, ইয়ে তিনো লেড়কি। পহেলা বালা এক প্রসটিটিউট। সেকেন্ড ওয়ান আ লেডি জার্নালিস্ট। অ্যান্ড থার্ড ওয়ান ওয়াজ অ্যান অ্যাকট্রেস। স্পেশালি টিভি সিরিয়ালে অ্যাকটিং করে। লেকিন মউত্ হুয়া একই তরিকাসে।

—তা সে প্ল্যানটা কি তোমার ইমিডিয়েট বস্ করেছেন? আমার কী মনে হচ্ছে জানো, এটা তোমার জেলাসি। তুমি এইসব আষাঢ়ে গল্প তৈরি করে তোমার রাস্তাটা ক্লিয়ার করছ।

—হোয়াট রাস্তা?

—আরো ক্লিয়ার করে বলার মতো বোকা তুমি নও।

—নো স্যার নো। ইয়ে গলদ বাত হ্যায়। অ্যায়সা ম্যায় কভি নেহি শোচা।

—কিন্তু তোমার সন্দেহ কেন? সেটা তো ব্যাখ্যা করতে হবে? তুমি যে ব্যাখ্যাগুলো দিচ্ছ ওগুলো বড়ই কাকতালীয় ব্যাপার। সতী নামে মেয়েটির ঘরে পাওয়া ঘড়ির ভাঙা কাচ। ওয়েল। তার ঘরে যে লোকটি এসেছিল তারই ঘড়ির কাচ হতে পারে। তুমি সন্দেহ করছ সেটি তোমার বস্ গোলাপসুন্দরের। কারণ তার ঘড়ির কাচও ভাঙা ছিল।

—ইয়েস স্যার। দিস ইজ ভেরি ইমপর্টান্ট পয়েন্ট। গোলাপজির ডায়ালের কাচ, সতীর মুট্টিমে মিলা কাচ আউর বিস্তারামে মিলা হুয়া কাচ, সবই একই গ্লাসকা ব্রোকেন পার্টস্। ফোরেনসিক রিপোর্ট।

—ওয়েট সোহিনী, রিপোর্টটা তুমি বোধহয় মন দিয়ে পড়নি। ফোরেনসিক বলছে ঘড়ির যে কাচ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পাওয়া গেছে সেগুলো একই গ্লাসের ব্রোকেন পিস নাও হতে পারে। কারণ জোড়গুলো মিলছে না। কিছু মিসিং হয়ে গেছে। আর, ঘড়ির কাচটা হচ্ছে টাইটান কোম্পানির একটা মডেলের। ঐ মডেলের কয়েক হাজার ঘড়ি কলকাতার বাজারে ছাড়া আছে। এবং কয়েক শো লোক ঐ একই ব্র্যান্ডের ঘড়ি পড়ে। অতএব তোমাদের পাওয়া কাচগুলো অন্য কারো ঘড়ির কাচ হতে পারে। সেটা যে গোলাপের হবেই তার কোন মানে নেই। কারণ ঐ একই ব্র্যান্ডের একই কাচ কয়েক হাজার তৈরি হয়েছে। নাহ্ সোহিনী এই পয়েন্টে জোরালো কেস সাজানো যাবে না।

সোহিনী কোন উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করে অন্যমনস্কের মতো কিছু ভাবছিল। আসলে এসব কথা সে নিজেও অনেকবার ভেবেছে। অম্লান বা সুবীরও একই কথা বলে। কিন্তু তার মনের সন্দেহটা সে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারছে না।

—কী ভাবছ? শান্তাবাড়িওলির বর্ণনা তোমার বসের চেহারার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। তাই না? গোলাপের ঐ স্ট্রাকচার কলকাতায় কত ছেলের আছে জানো? শুধু সন্দেহ করলেই হবে না। প্রমাণ। প্রমাণ না হলে কোর্ট কিছুই অ্যাকসেপ্ট করবে না। এই মেয়েগুলোকে মারার পিছনে গোলাপের মোটিভ কী? একজন পতিতা, একজন জার্নালিস্ট, একজন সিনেমার অভিনেত্রী এরা সবাই কি গোলাপের শত্রু ছিল? আর গোলাপ বেছে বেছে তাদের খুন করছে রাত্রিবেলা তাদের বাড়ি গিয়ে, তাদের সঙ্গে শরীরী সম্পর্ক পাতিয়ে? অ্যাবসার্ড। এটা বিশ্বাসযোগ্য কাহিনী হতে পারে না। গোলাপ ইজ নট অ্যাট অল আ পারভারটেড পার্সন।

সোহিনী তখনও মাথা নিচু করে পলাশ গুপ্তর একটানা কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল। পলাশ গুপ্ত থামতেই ও মুখ তুলে তাকালো ডিসিডিডি সাহেবের দিকে। তারপর বলল,

—স্যার।

—হ্যাঁ বলো।

—ডক্টর অম্লান দত্তগুপ্ত আ সাইকিয়াট্রিস্ট। ডু ইউ নো হিম?

—না। বলে যাও।

—হি ইজ আ কমন ফ্রেন্ড অব গোলাপজি অ্যান্ড হিজ ওয়াইফ নয়নতারা।

—তাতে কী হোল?

এরপর সংক্ষেপে গোলাপসুন্দর সম্বন্ধে অম্লান বা নয়নতারার মনোভাবটুকু আস্তে আস্তে বুঝিয়ে দেয় পলাশ সাহেবকে। এও জানায় গোলাপসুন্দর একজন সাইকো পেশেন্ট। বিশেষ করে কোন মহিলার সঙ্গে যৌনমিলনের সময়ে সে অ্যামনেশিয়ায় ভোগে। এবং উত্তেজনা যত বৃদ্ধি পেতে থাকে ততই তার মধ্যে স্যাডিজ্‌ম্‌ মাথা চাগাড় দিতে থাকে।

সব শোনার পর পলাশ গুপ্ত খানিকক্ষণ থম্‌ মেরে বসে থাকেন। নিভে যাওয়া চুরোটে আবার অগ্নিসংযোগ করেন। তাঁর মুখ চোখের অবস্থা খুবই করুণ হতে থাকে। আসলে এতো কিছু শোনার পরেও তিনি মনেপ্রাণে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন না বা পারছেন না যে গোয়েন্দা বিভাগের একজন একনম্বর অফিসার হয়ে গোলাপসুন্দর কীভাবে এতো ক্রাইম করতে পারে।

—হোয়াট আর ইউ থিংকিং স্যার?

ঘাড় নাড়তে নাড়তে পলাশ বলেন,—আমাকে একটু ভাবতে সময় দাও। গোলাপ সম্ভবত এখন ছুটিতে আছে।

—ইয়েস স্যার।

আবার কিছুক্ষণ কপালে টোকা মারতে মারতে কিছু ভাবলেন। তারপর বললেন,—তোমার এই সন্দেহের কথা আর কে জানে?

—সুবীর। আই মিন—

—সাব ইন্সপেক্টর সুবীর গুপ্ত?

—ইয়েস স্যার। আর জানে ডাক্তার অম্লান দত্তগুপ্ত। গোলাপজী ওনার কাছে ট্রিটমেন্টের জন্যে গিয়েছিলেন।

—আর কে জানে?

—নান।

—গোলাপসুন্দর নিজে জানে যে সে খুনি?

—দ্যাট আই ডোন্ট নো।

—এতো খবর সংগ্রহ করেছ। আর এটা করোনি? এটা তো তোমার জানা প্রয়োজন ছিল।

সোহিনী এবার সরাসরি পলাশ গুপ্তের দিকে তাকায়। তার ভ্রূ দুটো কোঁচকায়। তারপর ধীরে ধীরে বলে,—স্যার, আমার মালুম হচ্ছে কি আপনি আমার শক্‌ বিসওয়াস করেন না। আর আমি এই কেস ডীল করি ইয়ে ভি আপ্‌কা না পসন্দ।

—না সোহিনী। আমাদের লাইনের কাজটাই এই। পরিপূর্ণ বিশ্বাস অথবা বিনা প্রমাণে অবিশ্বাস করা উচিত নয়। গোলাপসুন্দরকে, সত্যি বলতে কি আমি এখনও অবিশ্বাস করি না।

আবার তোমার কনফিডেন্স আমাকে সন্দেহের পথে ঠেলে দিচ্ছে। সেই জন্যেই জিগ্যেস করেছি গোলাপসুন্দর কি নিজে জানে যে সে একজন ক্রিমিন্যাল? এ প্রশ্ন করার কারণ কি তোমায় ক্লিয়ার করতে হবে?

—নো স্যার। দোজ হু আর আ পেশেন্ট অব অ্যামনেসিয়া, উন্ লোগোকি মেমারি খো যাতি হ্যায়। ইয়ে তো আপ জানতেই হ্যায়।

—হ্যাঁ সেই জন্যেই প্রশ্নটা করেছিলাম। ঠিক আছে, এই মুহূর্তে গোলাপসুন্দরকে তুমি বা সুবীর কেউই তাকে কিছু জানতে দেবে না।

—সমঝ গিয়া স্যার।

—আর, তার প্রতিটি গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখবে।

—অফকোর্স স্যার।

—তার বর্তমান গতিবিধির কোন খবর রাখ তুমি?

—ইয়েস স্যার। গোলাপজী দিনভর আপনা কোঠিমেই রহ্‌তা।

—তাহলে সে খুনগুলো করছে কখন?

—মালুম হোতা হ্যায় কি উন্‌কা সফর রাতমেই হোতা হ্যায়। কিঁউ কি সব মার্ডারহি তো রাতমেই হুয়া স্যার।

—ওয়েল, তুমি অ্যাজ ইউজুয়াল তোমার ইনভেস্টিগেশান চালিয়ে যাও। মাইন্ড ইট, হোয়েন ইউ আর ইনভেস্টিগেটিং গোলাপসুন্দর, হি ইজ নট দেন ইউর বস্।

এর কোন সরাসরি উত্তর দেয় না সোহিনী। সে ভেবেছিল পলাশ গুপ্ত হয়তো তাকে একেবারেই নাকচ করে দেবেন। কিন্তু পলাশ গুপ্ত এক্ষেত্রে অ্যাডামেন্ট হননি। তাকে তদন্তের অনুমতি দিয়েছেন। এতে একদিকে তার আনন্দ হচ্ছে। কোন কমপ্লিকেটেড কেসের এই প্রথম সে পূর্ণতদন্তের ভার পেলো। আবার দুঃখও হচ্ছে, ক্রিমিন্যালের নাম গোলাপসুন্দর বসু। তার ইমিডিয়েট বস। কথাটা সেখানেই শেষ নয়। গোলাপসুন্দরকে সে শ্রদ্ধা করতো। তাকে বস্ হিসেবে ভালোবাসতো। তার সঙ্গে থাকতে পারলে আরো অনেক কিছু সে শিখতে পারতো। জটিল ঘটনার আবর্তে লুকিয়ে থাকা আসল সত্যটাকে তুলে আনা সে তো জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। তার নিজের বাবা-মাও যদি সামাজিক ভাবে অপরাধী হোতেন সেখানেও তার ভূমিকা আজকের মতোই হোত। নাহ্, সে দোষীকে তুলে আনতে চায়। তার জন্যে যে কোন অপ্রীতিকর কাজেও পিছপা হবে না। মাথা হেঁট করেই চলে আসছিল। ভুলেই গেছিল পলাশ গুপ্তকে অফিসিয়াল সম্মান না জানিয়ে সে যেতে পারে না।

—উইস ইউ বেস্ট অব লাক মিস্ সিং।

সম্বিত ফিরে পায় সোহিনী। যথাবিহিত স্যালুট ঠুকে, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার' বলে গট্‌গট্ শব্দ তুলে সোহিনী সিং ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

—আপনি এখন কেমন আছেন স্যার?

প্রশ্ন তুলে সুবীর একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো গোলাপসুন্দরের দিকে। ভ্রূতে সামান্য বিস্ময়ের রেশ টেনে গোলাপসুন্দর বলে,—কেমন আছি মানে? ওহ্ ছুটি নিয়েছি বলে বলছ? অনেক ছুটি পাওনা আছে। সাত আট মাস আগে দিনপনেরোর ছুটি নিয়েছিলাম। তারপর এখন। তবে, তোমার কাছে লুকবো না, আজকাল আমি বড় টায়ার্ড।

—হ্যাঁ স্যার, আমিও তা লক্ষ করেছি। ইদানীং আপনাকে খুব ক্লান্ত লাগছে। মনে হয় আপনি ইনসমনিয়ায় ভুগছেন।

—ইনসমনিয়া? না ঠিক তা নয়। শুলে আমার ঘুম আসে। ঘুমিয়েও পড়ি। কিন্তু প্রচণ্ড শারীরিক অস্বস্তি নিয়ে একসময় ঘুম ভেঙে যায়।

—তারপর?

গলার আওয়াজটাকে যতদূর সম্ভব নিস্পৃহ রেখে গোলাপ বলে,—তারপর, কিছুক্ষণ উঠে পায়চারী করি। আবার কখন যেন শুয়ে পড়ি। ভোর হয় তামান্নার ডাকে।

—তার মানে আবাব ঘুমিয়ে পড়েন?

—নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়ি। নইলে তামান্না ডেকে তোলে কীভাবে!

—আরো একটা মার্ডার হয়েছে।

—হ্যাঁ। তুমিই তো প্রথম খবরটা দিলে। কাগজেও বেরিয়েছে। অভিনেত্রী রুবি পালিত। সব থেকে ইমপর্টান্ট ব্যাপার কি জান, রুবি পালিতের মৃত্যু ঐ একইভাবে হয়েছে। আচ্ছা এই ধারাবাহিক খুনগুলোর তুমি কি কোন লিঙ্ক্ খুঁজে পাচ্ছ না?

—পাচ্ছি স্যার। মনে হচ্ছে কোন এক বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষ খুনগুলো করে যাচ্ছে।

—হ্যাঁ তাই। প্রথম দুটোয় মনে না হলেও তৃতীয় খুনটা চোখে আঙুল দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে, সব কটা খুনই একই লোকের। কারণ প্রসেস অব মার্ডার একই। কাজের ধারাটাও একই লোকের। হ্যাঁ, তুমি যেন কী বলার জন্যে আসবে বললে? বল কী বলার আছে?

—একটা অনুরোধ করতে এসেছি।

—অনুরোধ? কিসের অনুরোধ?

—আমাদের ডিপার্টমেন্ট এখন খুবই নাজেহাল। পুলিস অবশ্য তার কাজ করছে। কিন্তু গোয়েন্দা ডিপার্টমেন্টকে তো বসে থাকলে চলবে না।

—বসে তো নেই। তুমিই তো বললে সোহিনী কেসটার ভার নিয়েছে। সোহিনীকে আমি ছোট করছি না। শী ইজ ট্যালেন্টেড। উদ্যমী এবং পরিশ্রমী। তাছাড়া ইয়াং ব্লাড। এনথ্যু অনেক। তুমিও আছ সঙ্গে। কেসটা নিয়ে একটু ভাবো না। ঠিক খুঁজে পাবে। পৃথিবীতে কিছু কিছু কেস হয়তো আনসলভ্ড্ রয়ে গেছে। কিন্তু অধিকাংশই সলভ্ড্ হয়ে গেছে। এটাও হবে।

—কিন্তু।

—কিসের কিন্তু?

—আপনি স্যার ছুটিটা ক্যানসেল করুন।

—সেকী? যদিও ছুটিটা নিয়েছি আমার ইচ্ছে বিরুদ্ধে গিয়ে। কারণ কাজ ছাড়া আমি বসে থাকতে পারি না। সেই আমি ছুটি নিয়েছি। আসলে মনেপ্রাণে আমি বড়ো একা এবং কোন কিছুই আমার ভালো লাগছে না। এই মুহূর্তে আমার কাজে মন নেই। কোন কাজেই আর উৎসাহ পাই না।

—সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি বৌদিকে নিয়ে আসুন।

—তোমার বৌদি কোথায় আছে তা তো আমি জানি না।

—যদিও আপনার পার্সোনাল ব্যাপার। আপনি উত্তর নাও দিতে পারেন।

—বল না, কি প্রশ্ন?

—আপনার সঙ্গে আপনার স্ত্রীর বিরোধ কেন? শুনেছি মাত্র দুদিনের নাকি আপনাদের বিবাহিত জীবন?

—ঠিকই শুনেছ। তবে আমি নিজেও জানি না কেন নয়নতারা আমাকে এতো ভালবাসা সত্ত্বেও ছেড়ে চলে গেছে।

—আমি কি বৌদির খোঁজ করব?

—নাহ্ সুবীর। তুমি আমার ছোট ভাইয়ের মতো হলেও, একান্ত ব্যক্তিগত জীবনে লোকে বাবা-মার কাছেও উন্মুক্ত হতে পারে না বা চায়ও না। তাই।

—স্যরি দাদা। তবে আপনি এবার একটু গা হাত পা ঝেড়ে উঠুন। আপনি তদন্তে নামলে খুনি ধরা পড়বেই।

গোলাপসুন্দর হেসে ফেলে। তামান্না একটু আগে চা আর সিঙাড়া দিয়ে গেছে। গোলাপদের পাড়ায় হরিপ্রসাদের সিঙাড়া আর চাটনি খুবই বিখ্যাত।

সিঙাড়ায় কামড় দিতে দিতে গোলাপ বলে,—কে বলল যে আমি তোমাদের তদন্তে নেই। ছুটি নিলেও আমি মার্ডারগুলো নিয়ে রেগুলার ভাবছি। একজন একনিষ্ঠ গোয়েন্দা অফিসার তদন্তে নেমেও অসুস্থতার কারণে ছুটি নিলেও, মন তার পড়ে থাকে রহস্যের কেন্দ্রবিন্দুতে। চিন্তা কোর না। আমি ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাব। আর খুনির হদিশ পেলে সঙ্গে সঙ্গেই তোমাদের জানাবো। আসলে এই ধরনের বিকৃত মস্তিষ্কের খুনিরা বেশিদিন বাইরে থাকাও বিপদ। তুমি কিছু চিন্তা কোর না সুবীর। সেরকম মনে হলে আমি ছুটি ক্যানসেল করব।

—থ্যাঙ্ক ইউ গোলাপদা। আমি আপনাকে ভালবাসি তাই বলছি, বলেই হঠাৎ চুপ করে গেল সুবীর। মনে পড়ে গেল ওপরওলার হুকুম গোলাপকে তাদের সন্দেহের কথা যেন না জানানো হয়।

—থামলে কেন বল?

—না, মানে আপনাকে ভালবাসি বলেই বলছি, তদন্তটা আপনিই হাতে তুলে নিন।

গোলাপ হাসল। সুবীরের দিকে তাকিয়ে ভাবলো, ছেলেটা এখনও জানে না কোন কথা বলা যায় কোন কথা লুকোতে হয়।

—ঠিক আছে সুবীর। আমি তোমার কথা রাখার চেষ্টা করব।

সুবীর বেরিয়ে যেতেই ও তামান্নাকে দিয়ে আর এক কাপ চা আনালো। ছুটি থাকলেই

চা ওর সারাদিনের নেশা। অবশ্য সন্ধের পর নয়। কিন্তু ইদানীং মদের নেশার থেকেও আরো একটা ভারী নেশা ওকে পেয়ে বসেছে। এখনও ও বুঝতে পারছে না কাজটা ঠিক হচ্ছে না বেঠিক।

নয়নতারা চলে যাবার পর দেখতে দেখতে সাত-আট মাস কেটে গেছে। পুলিস বিভাগের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে নিজেকে সে ব্যস্ত রেখেছে। যতদূর সম্ভব সে চেষ্টা করেছে নয়নতারাকে ভুলে যাবার। কিন্তু কাউকে ভোলা বোধহয় এতো সহজ কাজ নয়। সমস্তদিন কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখলেও রাত তাকে ছেড়ে দেয় না। নয়নতারা তখন জাঁকিয়ে বসে তার মনের ওপর। তাকে খুব কাছে পেতে ইচ্ছে করে। আর ইচ্ছে থেকে আসে অন্যতর এক ক্ষুধা। যেটাকে সে এড়াতে পারে না। একটি শরীর তাকে বড় উদ্বেল করে।

এমনি একটা অবস্থায় তার দিন আর রাত কাটছিল। কিন্তু হঠাৎই তার একজনকে বড় ভালো লেগে গেল। অথচ তাকে তো তার ভালোলাগার কথা নয়। কোনমতেই নয়। কিন্তু এমন কিছু কিছু মহিলা আছে যাদের ভালো না লেগে পারে না।

অম্লান যখন প্রথম তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল স্বপ্নাদি বলে, কি জানি কেন গোলাপসুন্দর অম্লানের সম্পর্কিত দিদিকে স্বপ্নাদি বলে ডাকতে পারেনি। সে কি স্বপ্নাদির চোখে কোন গভীর কিছু দেখেছিল? নাকি স্বপ্নাদি অল্পবয়েসের বিধবা এক সুন্দরী মহিলা বলে তার দুর্বলতার জন্ম। গোলাপসুন্দর নিজেকে অনেকবারই প্রশ্ন করেছে স্বপ্নাদি তার মোহ না প্রেম! সে তো সাত আটমাস আগে নয়নতারাকে ভালোবাসতো। এতো তাড়াতাড়ি তার ভালোবাসাটা পটপরিবর্তন করলো? নাকি স্বপ্নাদির প্রতি দুর্বলতা আর কিছুই নয় নয়নতারাকে ভোলার অছিলা? হতেও পারে। এর মধ্যে তার নন্দিতার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ছটফটে মেয়েটাকে তার খারাপ লাগতো না। তবে নন্দিতাই সম্ভবত তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। নইলে সেই রাতে, গভীর রাতই বলা যায়, তার ভেতরটা যখন একটি শরীরের জন্যে ছটফট করছিল, সে ছুটে গিয়েছিল নন্দিতার কাছে। নন্দিতা তাকে ফিরিয়ে দেয়নি। কিন্তু নন্দিতা রহস্যময় ভাবে এখন মৃতা। তারপরেই দেখা স্বপ্নাদির সঙ্গে। আর স্বপ্নাদিকে তখনই ভালো লাগে।

কিন্তু অম্লান জানলে ব্যাপারটা খারাপ জায়গায় পৌঁছবে। অম্লান তার সব কথা জানে। তাছাড়া নয়নতারাকে ডিভোর্স না করে স্বপ্নাদি তার কাছে চিরদিন স্বপ্নাদি হয়েই থেকে যাবে। অবশ্য সে একদিনও স্বপ্নাদি বলে ডাকেনি।

অম্লানের অসাক্ষাতে সে গিয়েছিল স্বপ্নাদির বাড়ি। বাড়িতে তখন থাকা বলতে একমাত্র অম্লানের মা। একে বৃদ্ধা তায় বাত পীড়িতা। নিচে নামতেই পারেন না। দরজা খুলে দিয়েছিল স্বপ্নাদিই। দরজা খোলার পরই স্বপ্নাদির মুখের ভাবপরিবর্তন ঝানু গোয়েন্দা অফিসার গোলাপসুন্দর বসুর চোখ এড়িয়ে যায়নি। স্বপ্নাদির তাকানোর ভাষাই অন্য কিছু।

অম্লানের বন্ধু হিসেবে যতটা দরজা-অভ্যর্থনা থাকা উচিত ছিল, তার সিকি ভাগও ছিল না। সামান্য ফ্যাকাসে মুখে, সামান্য অপ্রস্তুত অভিব্যক্তিতে কেবল বলেছিল,—আরে, আপনি?

—হ্যাঁ আমি। চলে এলাম।

—কিন্তু অমু তো বাড়ি নেই।

—জানি। সে এখন রোগী নিয়ে ব্যস্ত তার চেম্বারে। আমি এসেছি আপনার কাছে।

ভ্রূ কুঁচকে বিস্মিত চোখে স্বপ্নাদি বলেছিল,—আমার কাছে? কেন?

—এই কেন'র জবাব আমার জানা নেই। আজ সকাল থেকেই আপনার কথা মনে হচ্ছিল।

মনে হচ্ছিল আপনাকে একবার দেখবো। চলে এলাম।

—অমুর মুখে শুনেছি আপনি পুলিসে চাকরি করেন।

—হ্যাঁ। পুলিস। তবে আমি যেখানে কাজ করি সেখানে উর্দি না পরলেও চলে। কোথাও কোন অপরাধ হলে প্রথমে ছুটে যায় পুলিস। তারপর কার্যকারণে অথবা জটিল কোন ব্যাপার থাকলে আমাদের হাতে চলে আসে পুরো কেসটা। তখন আমরাই তদন্ত করে অপরাধীকে খুঁজে বার করি। আমাদের যত্র তত্র অবাধ গতি। কোন এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে কাজ করার চেয়ারটাই বোধহয় আমাদের নেই। প্রয়োজন থাকলে যখন তখন যেখানে হোক ঘুরে বেড়ানোর পাশপোর্ট আমাদের হাতে আছে। তাই, এই অবেলায় বা অসময়ে আপনার কাছে আসতে আমার কোন অসুবিধা হয়নি। আমায় বসতে বলবেন না?

—হ্যাঁ। আসুন।

প্রাথমিক জড়তা স্বপ্নাদির ছিলই। প্রথমত গোলাপসুন্দর অম্লানের বন্ধু। অম্লান তাকে দিদি বলে। অথচ সে লক্ষ করছে গোলাপ তাকে একবারও স্বপ্নাদি বলে ডাকেনি। কী চায় গোলাপসুন্দর এটা স্বপ্নাদির চিন্তার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেদিন সামনাসামনি পেয়ে স্বপ্নাদি জিগ্যেস করেছিল,—আপনি তো অমুর বন্ধু। আমায় কী বলে ডাকবেন?

—নাহ্ ম্যাডাম। স্বপ্নাদি বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ আমি আপনাকে দিদি ডাকার কোন মানসিক সম্মতিই পাইনি।

—এ আবার কী কথা?

—আপনাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আপনাকে আমার গুরুজন বলে মনে হয়নি।

—গুরুজন না হলেও, আমি তো আপনার থেকে বয়েসে বড়, এটা তো মানবেন?

—সো হোয়াট? বয়েসে বড় হলে কি তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যায় না, নাকি প্রেম করলে মহাভারত আর কেউ পড়বে না?

—প্রেম? আমার সঙ্গে আপনি প্রেম করবেন?

—হ্যাঁ প্রেম। আমার মধ্যে ভনিতা কম। প্রেম করব, যে প্রেমে কাম আছে, আশ্লেষ আছে, দৈহিক সুখ আছে।

—আপনি বড় নির্লজ্জ।

—কী করব! গোয়েন্দা ডিপার্টমেন্টে চাকরি। একটু ঠোঁট কাটা তো হতেই হবে।

সেই শুরু। গোলাপের কাছে স্বপ্নাদি শুধুই স্বপ্না। আর স্বপ্না? বছর পঁয়ত্রিশের সুশ্রী, সুঠাম, ঈর্ষা করার মতো স্বাস্থ্য, স্মার্ট, তরতাজা যুবকটিকে ফেরাতে পারেনি স্বপ্নাদি। কারণ স্বপ্নাদির কোন ভবিষ্যত ছিল না। কিন্তু স্বাস্থ্য আছে, কামনা আছে, বাসনা আছে, আছে পুরুষের প্রতি আসক্তি। এতদিন যে কঠিন সংকল্পে নিজেকে বেঁধে রেখেছিল, গোলাপের নিত্য যাতায়াতে তার সে বাঁধ ভেঙে গেল। গোলাপের প্রেমে সে হয়ে পড়ল আচ্ছন্ন।

আর এটাই এখন গোলাপসুন্দরের মস্ত নেশা। দিনের কোন না কোন সময়ে স্বপ্নাকে ফোন করা। তার সঙ্গে কথা বলা। অবশ্য স্বপ্নাদিও তাকে মোবাইলে ফোন করে।

সুবীর চলে যাবার পর তার মনে হোল সুবীর কিন্তু ঠিক কথাই বলেছে। বেশ কিছুদিন যাবৎ সে মানসিক অশান্তিতে ভুগছে। এবং তার সঙ্গে শারীরিক অশান্তিও আছে। ফলে সে বেশ কিছুদিনের জন্যে ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে আছে।

কিন্তু এরই মধ্যে আরো একটি অপরাধ ঘটে গেছে। আরো একটি মেয়ে খুন হয়ে গেছে।

পুলিস এবং গোয়েন্দা বিভাগ রীতিমত সজাগ হয়ে গেছে। সে নিজেও খুন তিনটে নিয়ে ভেবেছে। খুনের প্রকৃতি দেখে তার সন্দেহ হয় সব কটা খুনই কোন বিশেষ একজনের কাজ। এবং সেই লোকটি মানসিকভাবে অসুস্থ।

শেষ খুন হয় যে মেয়েটি সে একজন অভিনেত্রী। রুবীর সঙ্গে তার পরিচয় আছে। এমনকি খুনের দিন সন্ধেবেলা তার সঙ্গে দেখা হয়। গোলাপ মনে করার চেষ্টা করল। সেই সন্ধের খুঁটিনাটি। রুবির সঙ্গে সেই সন্ধেটা একসঙ্গে কাটিয়েছে। রুবি পর্দানসীন মহিলা নয়। গোলাপের সঙ্গে গাড়ি ছিল। রুবিকে নিয়ে সে চলে আসে পার্ক স্ট্রিটের এক বারে। রুবি মেয়েটা খুব একটা ধোয়া-তুলসিপাতা চরিত্রেরও নয়। গোলাপ সেটা জানতো। বহু ছেলের সঙ্গেই তার ওঠা বসা। আর সিনেমা বা সিরিয়াল লাইনে একটু ওপর দিকে উঠতে গেলে অনেককেই তুষ্ট করতে হয়। প্রোডিউসার, ডাইরেক্টর। এর মধ্যে কিছু ফড়েও জুটে যায়। যারা এই সব উঠতি নায়িকাদের হয়ে সালিশী করে। উদ্যোগী হয়ে প্রোডিউসার ডাইরেক্টদের সঙ্গে মোলাকাৎ করিয়ে দেয়। তার বিনিময়ে তারা তো কিছু চাইবেই। জগৎটাতেই তো কড়ি ফেলে তেল মাখতে হয়। বিনিপয়সায় হরিদর্শনও হয় না।

গোলাপের মনে আছে প্রায় রাত সাড়ে নটা কি পৌনে দশটা পর্যন্ত ওরা একসঙ্গে বসে ড্রিঙ্ক করেছে। রাতের খাওয়া দাওয়াও সেরে নিয়েছে। তারপর রুবি তাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে বলেছিল।

গোলাপ ভাবতে চাইল সেই সন্ধেয় ওদের মধ্যে কী এমন কথা হচ্ছিল যার জন্যে প্রায় আড়াই ঘণ্টা মেয়েটির সঙ্গে সময় কেটে গিয়েছিল। খানিকক্ষণ নয়নতারার সম্বন্ধে আলোচনা হয়। রুবিও খুব বিস্মিত হয়েছিল নয়নতারার মিস্‌টেরিয়াস ভাবে উধাও হওয়ার কথা শুনে। এর কিছুক্ষণ পর দুজনেই প্রায় টিপ্‌সি হয়ে উঠেছিল। এবং ওদের পারস্পরিক কথাবার্তাগুলো রস থেকে আদিরসের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল সেটাও মনে আছে।

এরই মধ্যে বারতিনেক রুবির মোবাইল ঘণ্টি বাজিয়েছিল। আজকাল স্টুডিওপাড়ার এই এক ফ্যাশান হয়েছে। ছোট বড় মাঝারি প্রায় সবার হাতেই একটা করে মোবাইল। কি ডাইরেক্টর, কি প্রোডিউসার, কি ক্যামেরাম্যান। কেউ বাদ যায় না। সেই হিসেবে রুবি পালিত বর্তমানে সিরিয়ালে নামটাম করেছে। লোকে ডাকছে এখন। তার হাতে তো থাকবেই।

তিনবারের বেলায় গোলাপ অনুযোগ করেছিল—আমি আজ উঠি রুবি। তোমার যে চারদিকে এতো ডিমান্ড জানতাম না।

রুবির মেজাজ তখন তুঙ্গমুখী। কোনরকমে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিল,—সি আই ডি সাহেব কি চান না আমি নতুন নতুন সিরিয়ালে কাজ করি।

—ওহ্ সিওর! হোয়াই নট। তাছাড়া তুমি অভিনেত্রী। অভিনয় করবে। এতে আমার চাওয়া না চাওয়ায় তোমার কী এসে যায়?

—এ কি অভিমানের কথা?

—অভিমান সর্বদাই ঠিক জায়গায় পড়তে ভালবাসে। বেরসিকের কাছে অভিমান ছড়ালে অভিমানের ইজ্জত যায়।

—গোয়েন্দা সাহেবের কি মনে হচ্ছে আমি খুবই বেরসিক?

—না। বেরসিক হলে কি সন্ধে থেকে আমার সঙ্গে রসভাগ করে নিতে দিতাম? আর তোমার ঐ ধারণাটা ভুল। তুমি কাজ পেলে আমার তো কোন ক্ষতি হচ্ছে না। আমি তোমাদের

লাইনের লোকও নই। ওটা আমি বললাম ফোন এলেই কনসেনট্রেশান ব্রেক হয়ে যায়, তাই।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রুবি প্রায় আর্তনাদ করে বলেছিল,—গোয়েন্দা সাহেবের সঙ্গে তো গাড়ি আছে?

—তা আছে।

—আমার বাড়ি বেশিদূর নয়। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড। এতো রাতে ট্যাক্সি পাওয়ার জন্যে অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হবে, তাই।

হাত তুলে ওকে থামিয়ে গোলাপ বলেছিল,—এতো চিন্তা করার কিছু নেই। তুমি না বললেও আমি তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতাম।

অগত্যা উঠে পড়া। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে রুবির বাড়ির সামনে রুবি নেমে পড়ে। কিন্তু সে তাকে সে মুহূর্তে ছাড়েনি।

—গোয়েন্দা সাহেব কি একবার বাড়িতে পদধূলি দেবেন না?

—এতো রাতে?

—সবে পৌনে এগারো। নাইট ইজ টু ইয়াং। আর বাড়িতে তো আপনি একা।

—না। তামান্না আছে। বাড়িতে ওই আমার বস্।

—তার এতদূর স্পর্ধা নিশ্চয়ই নেই যে দেরি হলে গোয়েন্দা সাহেবকে দেরির জন্যে কৈফিয়ত চাইবে।

—না তা নয়।

—চলুন ভালো কফি খাওয়াব। ড্রিঙ্ক্সের পরে কফি অচ্ছুৎ নয়। তাছাড়া আজ রাতে আমি একা। মা গেছেন ভাইয়ের বাড়ি। খড়দহ। এতো রাতে আর ফিরবেন না।

এ পর্যন্ত হিসেবটা ঠিকই ছিল। সে রুবির সঙ্গে ওর ফ্ল্যাটে গিয়েছিল। কফি নয়। আরো একটা করে পেগ ওপন করে ছিল। তারপর, আর কিছু মনে নেই। সেই কালো পর্দা।

পরদিন দশটা এগারোটা নাগাদ খবর এলো রুবি পালিতকে তারই বিছানায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। মৃতদেহের অবস্থান দেখে মনে হয় কেউ তার সম্মতিতেই তার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছিল। সেই অবস্থায় থাকাকালীন তার সঙ্গী লোকটি তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে।

এইখানেই সব কিছু গণ্ডগোল হয়ে যায় গোলাপের। ঠিক যেন নন্দিতার রিপিটেশান। নন্দিতার ঘরে গিয়ে মদ্যপান এবং নন্দিতাকে কাছে টেনে নেবার পরই তার ব্ল্যাকআউট হয়ে যাওয়া। কিছুই তার মনে থাকে না। তিনদিন পর জানা যায় সেই রাতেই নন্দিতা খুন হয়েছে। রুবি পালিতের মতো একইভাবে।

এটা যে কি হচ্ছে তা গোলাপের মাথায় ঢুকতে চাইছে না। সে যে তদন্ত করবে, কী ভাবে করবে? দুটি মেয়ের সঙ্গে সামান্য একটু শরীরী সম্পর্কের কথা মনে পড়ার পর সব অন্ধকার। সে কিন্তু বাড়িতে চলে এসেছে। গাড়ি ছিল। নিশ্চয়ই গাড়ি চালিয়ে এসেছে। এবং তার ঘুম ভেঙেছে পরদিন প্রায় দশটায়। তামান্নার ডাকে। আবার কনফিউশান। অ্যামনেসিয়া না সোমনাবুলিজ্‌ম্?

রুবি পালিতের ফ্ল্যাটে গেলেও তেমন কিছু পাবে না। সে রাতে সে একাই ছিল। সম্ভবত তার বিধবা মা পরের দিন ফিরে আসেন। কিন্তু লোক্যাল পুলিস অফিসার জ্যোতিষ সাহা নিশ্চয়ই ইমপর্টান্ট যা কিছু সবই নিয়ে গেছেন। তার অর্থ প্রমাণ যা কিছু সব তার হাতছাড়া।

যদিও সে থানায় গেলে এগজিবিট সবই দেখতে পাবে। কিন্তু—

তবু সে ঠিক করল সে নিজে গিয়ে সরেজমিনে সব কিছু খুঁটিয়ে দেখবে। অপরাধী সর্বদাই কিছু না কিছু ফেলে যায়। খুন করার মুহূর্তে খুনির মানসিক অবস্থা এমনই জায়গায় যায়, কিছু না কিছু প্রমাণ সে ফেলে যাবেই যা তাকে কাঠগড়ায় পৌঁছে দেবে।

হঠাৎ গোলাপসুন্দরকে থানায় আসতে দেখে থানা অফিসার জ্যোতিষ সাহা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে আপ্যায়ন করল,—স্যার, আপনি? আপনি তো ছুটিতে ছিলেন?

চেয়ার টেনে বসতে বসতে গোলাপ বলে,—ছিলাম। কিন্তু আর ভালো লাগছে না। খুব বোর করছে।

—সে তো করবেনই স্যার। আপনাদের মতো জাঁদরেল সি আই ডি অফিসাররা বসে থাকতেই পারেন না। তো, স্যার, এনি প্রবলেম?

—অভিনেত্রী রুবি পালিতের মার্ডার কেসটা তো আপনিই হ্যান্ডেল করছেন?

—হ্যাঁ স্যার।

—কী মনে হচ্ছে আপনার?

—নো ডাউট ইট্‌স্ আ মার্ডার কেস। এবং খুন করা হয়েছে শক্ত কোন দড়ির ফাঁসে।

—দড়ি? এর আগেও আর একটি মেয়েকে খুন করা হয়েছিল গলায় মোটা ইলাস্টিক দড়ি পেঁচিয়ে।

—হ্যাঁ স্যার। আমি শুনেছি। সেটা অবশ্য আমার এলাকার ঘটনা নয়। তবে ফোরেনসিক বলছে যে তাকে মেরেছে সে একজন শক্ত-সমর্থ পুরুষ। মেয়েটির হাত এবং পা বাঁধা ছিল।

—তার মানে আপনি বলছেন মেয়েটি কোন রেসিস্ট করেনি। নইলে জ্ঞানত সে কেন হাত পা বাঁধতে দেবে?

—এটাই তো স্যার ধন্দে ফেলে দিচ্ছে। জোর করে যদি মেয়েটিকে বাঁধা হতো তাহলে বাধা দেওয়ার কোন না কোন চিহ্ন পাওয়া যেতো। নিদেন পক্ষে ধস্তাধস্তির কিছু নমুনা। আশ্চর্য ফোরেনসিক জানাচ্ছে মেয়েটির নার্ভে কোন মৃত্যুপূর্ব ইরিটেশান ছিল না।

—সেটা কেমন করে হয়? এই তো বলছেন গলায় ফাঁস লাগিয়ে মেয়েটিকে দমবন্ধ করে মারা হয়েছে।

—তা হয়েছে। কিন্তু হাত-পা বাঁধার জন্যে যদি বলপ্রয়োগ করা হোত সেটাও কিন্তু নারভাস সিস্টেমে ধরা পড়তো? যা পড়েনি।

—অর্থাৎ আপনি বলছেন মেয়েটি ইচ্ছে করেই হাত-পা বাঁধতে দিয়েছে। অ্যান্ড ইট ইস আ পারভারসান অব লাভ মেকিং?

—মাইট বি। মানুষের মন বড় দুর্জ্ঞেয়। বিশেষ করে নারী মন বা চরিত্র। খুব মিসটেরিয়াস।

—মেয়েটির গোপনঅঙ্গে কোন সিমেন পাওয়া গিয়েছিল?

—নো স্যার। সম্ভবত কনডোম ব্যবহার করা হয়েছিল। পরিত্যক্ত কনডোমটিও আমরা কোথাও খুঁজে পাইনি। হতে পারে, খুনি খুব সজাগ। সে সেটি সঙ্গে করে নিয়েই পালিয়েছে।

—কোন ফিঙ্গার অর ফুট প্রিন্ট?

—তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। তবে—

—হ্যাঁ বলুন।

—ওরা দুজনেই খুব ড্রিঙ্ক করেছিল।

—কী করে বুঝলেন?

—অ্যাপার্টমেন্টের দারোয়ান সেটি টের পায়। দারোয়ানের বক্তব্য সন্ধের বেশ কিছু পর রুবি পালিত তার এক বন্ধুকে নিয়ে যখন পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখনই সে মদের গন্ধ পায়।

—লোকটি কে? তাকে সে আগে কোনদিন দেখেছে?

—না। আগে সে কোনদিনও আসেনি।

—কতক্ষণ সে রুবির কাছে ছিল।

—ও বলেছে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক তো হবেই।

—লোকটি যখন ফিরে যায় তখনও কি দারোয়ান তাকে দেখেনি?

—এ প্রশ্ন আমি তাকে করেছিলাম। দারোয়ান বলেছিল, অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকার আগে যত মন দিয়ে একজনকে দেখে যাবার সময় তেমনভাবে দেখে না।

—তাহলে সে কী করে বুঝল ঐ লোকটাই বেরিয়ে যাচ্ছে?

—আন্দাজ ঢিল ছুঁড়ছে মনে হচ্ছে। হয়তো দেখেই নি বেরুতে। মানুষ অত ডিউটিবাউন্ড হলে তো দেশের অবস্থাই পাল্টে যেত।

—লোকটি চোহারার কোন ডেসক্রিপশন পেয়েছেন?

—আবছা আবছা। লোকটা বেশ লম্বা। অন্তত রুবি পালিতের থেকে অনেকটা।

ভ্রূ দুটো বেশ বঙ্কিম হোল গোলাপসুন্দরের। জ্যোতিষ সাহা যে সময়টার কথা বলছেন, সেই সময় সেই রুবিকে নিয়ে ওদের ফ্ল্যাটে গিয়েছিল। রুবি তার পাশ দিয়ে যখন হাঁটছিল তখন সে নিজেই রসিকতা করে বলেছিল, তোমার মতো এতো নাটা মেয়েকে নিয়ে রাস্তা চলা খুব বিপজ্জনক।

রুবি জিগ্যেস করেছিল,—কেন?

—বারবার ঘাড় নিচু করতে করতে ঘাড়ে ব্যথা হয়ে যাচ্ছে।

উত্তরে রুবি তাকে কী যেন বলেছিল। আসলে সেই সময়ে তারা দুজনেই বেশ ড্রাঙ্ক। এটাও মিলছে দারোয়ানের কথার সঙ্গে অ্যাপার্টমেন্টে যখন তারা ঢুকছে তখন তারা দুজনেই প্রায় টিপ্‌সি। আর যত ভালো মদই হোক না কেন তার নিজস্ব একটা গন্ধ সে ছড়াবেই।

অর্থাৎ তার যাওয়াটাই দারোয়ান মনে রেখেছে। এবং তার চলে যাওয়াটা নিশ্চয়ই দারোয়ান দেখেনি। একই লোককে দু ঘণ্টার মধ্যে দুবার দেখলে তাকে সে মনে রাখতোই। অর্থাৎ তাকে দারোয়ান দেখেনি। দেখেছে অন্য কাউকে। এবং এই লোকটিই খুনি। এবং এই লোকটিকেই খুঁজে বার করতে হবে।

—আচ্ছা জ্যোতিষবাবু, লোকটি কি এরপর আর কোনদিন এসেছে ঐ বাড়িতে?

—নাহ্ স্যার। খুনের পর দারোয়ান ঐ লোকটিকে আর কোনদিনও আসতে দেখেনি।

—লোকটিকে দেখলে সে চিনতে পারবে? জিগ্যেস করেছিলেন?

—করেছিলাম। উত্তরে বলল, পহেলে তো পাকড়াইয়ে। ফিন তো বাতাউঙ্গা আদমি আসলি কেয়া নকলি।

গোলাপসুন্দর উঠে দাঁড়ালো।

—স্যার, একটু চা খেয়ে যান।

—আজ থাক। পরে আর একদিন হবে। দরজা তো সিল করা।

—হ্যাঁ স্যার।

—আপনি ছাড়া আর কেউ কি ইনভেস্টিগেশানে ইনটারেস্ট দেখিয়েছিল?

—হ্যাঁ স্যার। আপনারই দুই অ্যাসিসট্যান্ট। মিস্ সোহিনী সিং আর সুবীর গুপ্ত। প্র্যাকটিক্যালি ওপর মহলের ধারণা এটা একটা চেইন অব মার্ডারস। সম্ভবত কোন একজনই হয়তো করছে। তাই স্পেশ্যাল সি আই ডি ডিপার্টমেন্টের হাতে চলে যাচ্ছে। এবং সম্ভবত, আপনি ছুটিতে থাকায় ওঁরা কেসটা নিয়ে ডীল করছেন।

ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় দোলাতে দোলাতে গোলাপসুন্দর বলল,—চাবিটা এখন কোথায়?

—এখনও আমার কাছে।

—ওয়েল। ওটা আমায় দিন। আমি একবার ঘরটা ভালো করে দেখতে চাই। তারপর ফেরার পথে আপনাকে চাবি ফেরত দিয়ে যাব। অবশ্য যদি আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন।

—কি যে বলেন স্যার! আপনাকে অবিশ্বাস করব?

আসরটা বসেছিল নয়নতারার শোবার ঘরে। সাধারণত নয়নতারা নিজের বেডরুমে কাউকে এতোদিন ঢুকতে দিত না। হয়তো কোনদিনও দিত না। কিন্তু সব হিসেব এলোমেলো হয়ে গেছে নয়নের। তার স্বপ্নের ঘরের সুখের চাবিটা হঠাৎই হারিয়ে গেছে। গোলাপকে নিয়ে সে ভেবেছিল একটা সুন্দর সংসাব তৈরি করবে। কিন্তু, এখন মনে হচ্ছে দুঃখে আর অভিমানে গোলাপকে ছেড়ে না এলেই ভালো হোত। অম্লানের কাছেও ও শুনে নিয়েছে গোলাপ একটা অদ্ভুত রোগে ভুগছে! ঠিকমতো ট্রিটমেন্ট আব নার্সিং পেলে বোগটা ভালো হয়ে যেতে পারে। সেই প্রসঙ্গ টেনেই ও প্রশ্ন করল,—আচ্ছা অম্লান তুমি কি বলো, গোলাপকে সুস্থ করা যাবে?

নয়নতারা কিছু বলার আগেই সোহিনী বলে উঠল,—ম্যাডাম, ই সোব বাত অনেক পরের কথা আছে। কোর্ট উইল ডিসাইড দ্যাট। লেকিন উস্‌কা পহেলে গোলাপজিকো অ্যারেস্ট করনে পড়েগা।

—তার মানে আপনাদের কাছে গোলাপের বিরুদ্ধে কোন সলিড প্রমাণ আছে।

সোহিনীকে হোঁচট খেতে হোল। এ প্রশ্নের সহসা কোন জবাবও সে দিতে পারছিল না। কারণ সত্যিই তেমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি যার দ্বারা গোলাপকে দোষী শনাক্ত করা যায়। তবু সোহিনী বলল,—না মিসেস বসু, তেমন ভাবে কোন সলিড প্রমাণ আভিতক মিলা নেহি। সাসপেক্টেড পার্সন ইজ ভেরি মাচ ক্লেভার। অ্যান্ড ইনটেলিজেন্ট। হি ডেস্ট্রয়েড অল দ্য এভিডেন্সেস। লেকিন—

—না সোহিনী, অম্লান বলল, এটা তোমার ঠিক ইনভেস্টিগেশন অফিসারের মতো কথা হোল না। তুমি কি বলতে চাও গোলাপ জানে কোন্ কোন্ প্রমাণ থাকলে সাধারণত অপরাধী ধরা পড়ে, এবং সেগুলো সে ডেস্ট্রয় করে গেছে। নো। আমার ডাক্তারি শাস্ত্র বলে গোলাপ জানেই না সে খুন করেছে। এবং যে জানে না সে খুন করেছে সে কেন প্রমাণ লোপ করার

পেছনে ছুটবে? সোহিনী! আই মাস্ট সে ইউ আর নট ইয়েট সিওর অ্যাবাউট গোলাপ্‌স্ ক্রাইম।

সোহিনী কিছুক্ষণ নিজের মনেই কপাল চুলকালো। সত্যি বলতে কি তার কাছে কয়েকটা শোনা কথা আর একটা কাচভাঙার মতো রসদ নিয়ে খুনিকে কাঠগড়ায় তোলা সম্ভব নয়। তবে তাব মুখ দেখে মনে হচ্ছিল সে কোনভাবেই হাল ছেড়ে দেয়নি। তার মধ্যে সঙ্কল্প পূরণের একটা ইতিবাচক দৃঢ়তা লক্ষ করা যাচ্ছিল। সম্ভবত সে মনে মনে কিছু ভাবছিল।

সবার নীরবতার মধ্যে নয়নতারা আবার মুখ খুলল,—শান্তামাসি গোলাপকে ঠিক আইডেন্টিফাই করতে পারেনি। আমি গোলাপকে যতটুকু জানি, সে একজন পতিতার ঘরে রাত কাটাতে যাবে না। তার ঘড়ির কাচভাঙা বা রিস্টে আঁচড়ের দাগ এগুলো কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণ নয়। আপনার কেউ তার রিস্টের উন্ড টেস্ট করাননি। আপনারা কোথাও তার ফিঙ্গার অর ফুটপ্রিন্ট্ পাননি। আমি বুঝতে পারছি না। এরপরও মিস সিং কি ভাবে আমার স্বামীকে খুনি সাব্যস্ত করতে চাইছেন বা করবেন। তাই জন্যেই বলছি, ওকে বরং আপনারা অম্লানের হাতে ছেড়ে দিন। তাহলে হয়তো, ও যদি সত্যিই রোগী হয়, তার একটা ভালো হওয়ার বা সুস্থ হওয়ার সুযোগ থাকবে। কিন্তু, সত্যিই সে নির্দোষ হলে তাকে খুনি করে তুলবেন না। উত্তরটা সোহিনীই দিল,—আপনার মনের কথা, আই ক্যান ফিল। আপনি বিসওয়াস করুন, গোলাপজির সঙ্গে আমার কোই দুষমনি নেই। আমি সিরিফ ট্রুথকে খুঁজছি। গোলাপজি যদি মার্ডারার না হয় দেন আই শ্যাল বি দ্য হ্যাপিয়েস্ট গার্ল ইন দিস ওয়ার্ল্ড। ইয়ে এমোশানকি বাত নেই। সাচ্। মেরা দিল্‌কি বাত। লেকিন—

এবার অম্লান বলে,—লেকিন?

—আমাব শক কভি ঝুট্ বোলে না। এতো ভুল ভি আমার হোবে না? আই শ্যাল গো অন আদার পাথ। হা, দুসরা কোই রাস্তামে হামকো চলনে পড়েগা। বিকজ আই মাস্ট ফাইন্ড আউট দ্য মার্ডারার।

—সেটা কী?

—ওয়েট। আমি বোলব। জরুর বোলব।

নাহ্, রুবি পালিতের ঘরে তন্নতন্ন খুঁজেও কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রমাণ হাতে পেলো না গোলাপসুন্দর। ঘরের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সব দিকে নজর ঘোরাচ্ছিল। একজন উঠতি এবং মোটামুটি প্রতিদিন শুটিং আছে এমন একজন অভিনেত্রীর ঘর যেমন হওয়ার তাই আছে। নতুন পুরনো নানান শৌখিন আসবাব। সেগুলো ছাড়াও মদের প্রতি তার আসক্তি ছিল বেশি। টেবিল এখন ফাঁকা। কোন বোতলও নেই। গ্লাসও নেই। জ্যোতিষ সাহা বলেছেন, একমাত্র মেয়েটির ফিঙ্গারপ্রিন্ট আইডেনটিফাই করা গেছে। কিন্তু ছেলেটি হাতে

সম্ভবত গ্লাভস ছিল। হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে, তার হাতেও নাইলন গ্লাভস ছিল। সেও অনেকক্ষণ বসে মদ খেয়েছে। মদ খেতে খেতে পর টিপ্‌সি হওয়ার পরই, একসময়ে সে রুবিকে নিয়ে বিছানায় চলে গিয়েছিল। বিছানায় যেতে রুবির যখন আপত্তি ছিল না, তখন সে নিশ্চয়ই মাঝপথে তাকে ছেড়ে চলে যায়নি। আসলে এই সময় থেকেই তার ব্ল্যাকআউট। তারই মধ্যে ক্ষীণ একটা কিছু তার স্মৃতিতে ভাসছে। সবুজ কালোর ডোরা দেওয়া একটা সাপ। সাপটাকে নিয়ে সে খেলছিল। বোধহয় একবার সে খেলাচ্ছলে রুবির গলায় সেই সাপটাকে ছেড়ে দিয়েছিল। রুবি প্রথমে ভয় পেয়েছিল। তারপর...। আর কিছু মনে নেই। কিন্তু সাপ? সাপটা গেল কোথায়? সেই বা কেমন করে একটা সাপ নিয়ে খেলছিল? সে তো সাপুড়ে নয়। অথচ তার হাতে সাপটা ছিল। গেল কোথায়?

ফোরেনসিক বলছে একটা দড়ি গলায় পেঁচিয়ে রুবি পালিতকে মারা হয়েছে। দড়ি? কিন্তু তার হাতে তো দড়ি ছিল না। ছিল সবুজ কালো ডোরাকাটা একটা সাপ।

সব গুলিয়ে যাচ্ছিল গোলাপসুন্দরের। প্রথমত সে আর সাপটাকে খুঁজে পাচ্ছে না। দ্বিতীয়ত সে কখন বাড়ি ফিরেছে সেটা সে জানে না। মনেও করতে পারছে না।

হঠাৎই ওর মনে পড়ল তামান্নার কথা। সে কখন বাড়ি ফিরেছে সেটা বলতে পারবে তামান্না। সেই তো এখন তার সুখদুঃখের হিসাবরক্ষক।

তামান্না! হ্যাঁ তামান্নাই হয়তো তার কিছু জট ছাড়িয়ে দিতে পারে। ঘর বন্ধ করে বেরিয়ে আসতে আসতে আরও একটা কথা তার মাথায় ঢুকলো। যদিও এই মুহূর্তে সে মনে করতে পারছে না সে রুবির ঘর থেকে কখন বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু সে যখনই বের হোক না কেন রাত খুব কম ছিল না। কিছু নাহলেও এগারোটা নিশ্চয়ই হবে। কি তারও বেশি। তাহলে যে লোকটি রুবিকে খুন করেছে সে তার বেরিয়ে আসার পর রুবির ঘরে যায়। তা কি সম্ভব? যে কোন ফ্ল্যাট সিস্টেম বাড়ি একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর বন্ধ হয়ে যায়। এখানেও তাই হয়েছে। তাছাড়া রুবি তো বারবনিতা নয়। একই রাত্রে সে কি আরও একজনের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছিল? নিশ্চয়ই হয়েছিল। নইলে ফোরেনসিক কেন বলবে সঙ্গমরত অবস্থায় তাকে দমবন্ধ করে মারা হয়েছে।

কিন্তু সতীর ক্ষেত্রে যেমন তার শেষ নাগরটিকে ধরা যায়নি এক্ষেত্রে প্রায় সেই অবস্থাই দাঁড়াবে। একজন অভিনেত্রীর বন্ধুর সংখ্যা নিতান্ত কম হয় না। সবাই হয়তো বন্ধু হয় না। কিন্তু বন্ধুর মতো ঘনিষ্ঠ হতেই হয়। নানান লোকের সঙ্গে তাকে যোগাযোগ রাখতেই হয়। এদের মধ্যে কারো কারো সঙ্গে ইনটিমেসি হয়তো বেশি হয়ে যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শরীরী সম্পর্ক এসে যাওয়াও বিচিত্র নয়। তার জন্যে রুবিকে সে দোষারোপ করছে না। কারণ রুবির চরিত্র নিয়ে তার কোন ভাবার অবসর নেই। তার সঙ্গে যেটুকু ঘটেছে সেটা নিতান্তই ওই শরীরী খেলা। পশ্চিমী হাওয়া এ দেশটাকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করছে। তার সু এবং কু প্রভাব থেকে এদেশের ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে আসতে পারছে না অথবা চাইছে না। এখন তাৎক্ষণিক সুখটাই ভীষণ কাম্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাৎক্ষণিক চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে ভেবে দেখার অবসর আজ আর বোধহয় নেই। সময়টা বড় দ্রুত ছুটে চলেছে।

গোলাপসুন্দর এখন কিছুদিন হোল, মানে ছুটি নেওয়ার পর থেকে বাইক ব্যবহার করছে না। ইদানীং তার মন বড় অস্থির। একা থাকলেই তার মনে অনেক চিন্তার জন্ম হয়। যেটা আগে একেবারেই ছিল না। আসলে এটা হয়েছে নয়নতারার রহস্যজনক অন্তর্ধানের পর থেকে। এখন সে বড় একা। আর একার বোকামিত্ব তাকে নানান চিন্তার দাস করে ফেলেছে।

রাস্তায় নেমে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল, জ্যোতিষ সাহাকে চাবিটা দিয়ে সে বাড়ি ফিরবে। নিস্পৃহ থাকার চেষ্টা করেও তার রক্তের গভীরে আছে কাজের নেশা। ছুটিও ভালা লাগছিল না। সতী, নন্দিতা আর রুবির কেসটা তাকে সল্‌ভ করতেই হবে। তিন তিনটে রহস্যজনক এবং একই ধরনের খুনের কোন নিস্পত্তি হবে না? এটা তার নিজেরও কলঙ্ক। সি আই ডি শাখারও বদনাম।

সার্কুলার রোডে ট্যাক্সি ঢুকতেই তার মনে পড়ে গেল স্বপ্নাদির কথা। ইদানীং স্বপ্নাদির কথা সে খুব ভাবে। স্বপ্নাদির ব্যবহার, স্বপ্নাদির কথা বলা, তার সান্নিধ্য গোলাপসুন্দরের খুব ভালো লাগে। আসলে স্বপ্নাদি খুব স্নেহপ্রবণ এবং দরদী। তার ভেতরের চাপা দুঃখটাকে মহিলা বেশ আন্তরিকভাবেই নিয়েছেন। নয়নতারার এ হেন ব্যবহারে তিনিও বিস্মিত। কোন মেয়ে যে এমন একটা কাজ করতে পারে সেটাও তাঁর চিন্তার অতীত। আসলে মহিলা কমবয়েসে বিধবা হয়েছেন। বাইরের জগৎটাও খুব একটা পরিচিত নয়। কথাবার্তায় যতই চটপটে হোক না কেন, কোথাও একটা ঘরকুনো স্বভাব লুকিয়ে আছে। আর এই বিশেষ কারণেই, নয়নতারা বা তথাকথিত আধুনিকাদের সঙ্গে স্বপ্নাদির ফারাকটা চোখে পড়ে। মনে হয় স্বপ্নাদি অনেক কাছের, অনেকখানি মনের মানুষ।

অম্লান ওকে স্বপ্নাদি বলে। তার তা বলতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু স্বপ্নাদির কাছে গেলে তার মনে হয় সে একটা ছায়াছায়া গাছতলায় এসে দাঁড়িয়েছে। কোমল স্নেহে গাছটি তার ডালপাতা দিয়ে তাকে শান্তির পরশ বুলিয়ে দিচ্ছ।

বাড়ির সামনে এসে ট্যাক্সি থামিয়ে নেমে পড়ল। হাতঘড়িটায় চোখ চলে গেল। এখন অম্লান তার চেম্বারে। অম্লানের মা নিশ্চয়ই তাঁর নিজের ঘরে। তাহলে স্বপ্নাদি? এখন কী করতে পারে। হয়তো একা একা ছাদে ঘুরছে। অথবা—

ডোর বেলে হাত দিয়েও চাপ দিল না। আচ্ছা এই যে ঘনঘন স্বপ্নাদির কাছে আসছে, হয়তো অম্লান কিছু মনে করতে পারে। অম্লানের মাও কিছু ভাবতে পারেন। সেটাই স্বাভাবিক। তার সঙ্গে অম্লানের বন্ধুত্ব। বন্ধুর অনুপস্থিতিতে তার পাতানো দিদির সঙ্গে এতে মেলামেশা খারাপ লাগতেই পারে। তবে দিদির কোটিনটা রয়ে গেছে। চট্ করে কেউ কিছু নাও ভাবতে পারে।

মাঝে মাঝে ইদানীং রাত অনেক গভীর হলে যখন শরীরের তন্ত্রীতে সেই অস্বাভাবিক উত্তেজনা আর উত্তেজনার দাপাদাপিটা তাকে অস্থির করে তোলে, যখন তার বাইরে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে যে কোন একটি নারীদেহ নিয়ে খেলা করতে, ঠিক তখনি তার মনে পড়ে স্বপ্নাদির কথা, স্বপ্নাদির মধ্যযৌবনের ভরাট শরীর, তার মাদক কোটেড কথাবার্তা, তার কটাক্ষের যৌনতা তাকে নিশিডাক ডাকতে থাকে। তখন মনে থাকে না দিদির স্নেহ, ছায়াছায়া গাছতলা, তখন থাকে শুধুই যৌনক্ষিপ্ততা। মুছে যায় মহিলাকে ঘিরে যা কিছু ভালো, যা কিছু আত্মনিবেদনের ইচ্ছা। কেবল ভেসে ওঠে স্বপ্নাদির শরীর নিয়ে দামালপনার চিন্তা।

কিন্তু স্বপ্ন বা ইচ্ছা চরিতার্থ করার উপায় থাকে না। এ তো নন্দিতা নয়। রুবি পালিত নয়। স্বপ্নাদি আছে অন্যের বাড়িতে। অন্যের আশ্রয়ে।

নিজের ভাবনার অজান্তেই নবে চাপ পড়ে গিয়েছিল। কতক্ষণ ভাবনার গভীরে ডুবে ছিল সেটাও খেয়াল ছিল না। খেয়াল হোল যাকে চাইছিল তাকে দরজা খুলি দাঁড়াতে দেখে।

—তুমি কি চাকরিটাকরি ছেড়ে দিয়েছ?

—না ম্যাডাম। ছুটি নিয়েছিলাম। তবে আর ছুটি ভালো লাগছে না। জয়েন করব।

—তাই কর। একা একা বাড়িতে থাকলে শয়তান ভর করে মাথায়।

—ঠিক বলেছ। শয়তানই ক্রমশ আমার মাথায় চেপে বসতে চাইছে। তাই তো তোমার কাছে ছুটে আসতে চাইছি বারবার।

—কেন? আমি তোমাকে কতটুকুই বা ভরাট করতে পারি?

—পার! একমাত্র তুমিই পার। তা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলব না ওপরে যেতে বলবে?

—ওপরে যেতে বলার আমি কে? আমি তো এ বাড়ির বলতে পাব পরিচারিকা।

—যাহ্। অম্লান খুব ভালো ছেলে। সে তোমাকে দিদির মতো দেখে।

—আর তুমি?

—চল ওপরে। ওপরেই বলব।

—আমি জানি তুমি কী বলবে।

—কী?

—আমাকে কি এতোই বোকা বা গাঁইয়া ভাব?

—না তোমাকে অনেক সহজ আর বুদ্ধিমতী মনে করি।

—প্রশংসা সব সময়ে বিগলিত করে না। তুমি যা চাইছ তা যে সম্ভব না সেটা তুমিও জান আমিও জানি।

—আমার কাছে কোন কিছুই অসম্ভব নয় সেটা নিশ্চয়ই এতদিনে তুমি বুঝতে পেরেছ।

—সেই জন্যেই তোমাকে আমার ভীষণ ভয়।

—কিসের ভয়?

—টর্নেডো যখন ছুটে আসে তখন অনেক মহীরুহরই বুক কেঁপে ওঠে।

—সার্টিফিকেট দিচ্ছ?

—না। সজাগ করাতে চাইছি।

—টর্নেডো যখন বিশাল শক্তি নিয়ে ছুটে আসে তখন প্রকৃতিও তার কাছে মাথা হেঁট করে।

—আবার সেই টর্নেডোই যখন কোথাও শেষ আশ্রয় না পায়, প্রকৃতির বুকে ধাক্কা খেতে খেতে একসময়ে প্রকৃতিতেই আত্মসমর্পণ করে।

—হ্যাঁ স্বপ্না, আমি তো তাই চাই।

চকিতে স্বপ্নাদি ওর দিকে ঘুরে তাকায়। মাত্র কয়েক পলকমাত্র। তারপর দরজা বন্ধ করার মতো অবস্থায় এসে কেবল বলল,—তুমি নয়নের কাছে যাও গোলাপসুন্দর। তোমার সান্নিধ্য আমাকে সুবাস দেবে না। কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত করবে। তুমি যাও। পার তো আর এসো না। মনে রেখো আমি রক্তমাংসের তৈরি মানুষ। আমার মন আছে। চাহিদা আছে। কামনা আছে বাসনা আছে। আবার হিন্দুত্বের কড়াশাসন আছে। তুমি যাও।

বলেই দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দেয়। বন্ধ দরজার সামনে কয়েকমিনিট দাঁড়িয়ে রইল গোলাপসুন্দর। তারপর একসময়ে নিজেকেই যেন শুনিয়ে বলল,—কাজটা তুমি ঠিক করলে না স্বপ্না। দাবানলকে ঠেকিয়ে রাখা বনাঞ্চলের পক্ষে সম্ভব নয়। সে নিঃশেষ হয়েই শান্তি পায় তার পেড়ো দেহের দিকে তাকিয়ে। স্বপ্না, তুমি ভুল করলে।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে একটু রাতই হোল। স্বপ্নাদির কাছ থেকে বিমুখ হয়ে ও সোজা বাড়ি না ফিরে চলে যায় ট্রিঙ্কায়। সারা সন্ধে মদ্যপান করে ফিরে আসে নিজের ডেরায়। দরজাটা

খুলল তামান্না। একটু দেরি করেই। সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওর দিকে তাকিয়ে ঢুলুঢুলু চোখে গোলাপ জিগ্যেস করল,—ঘুমিয়ে পড়েছিলি?

—জি হ্যাঁ। কা করে। ঘরপে একেলা। না কোই দোস্ত, না কোই—

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমার খাবার দে।

শার্ট প্যান্ট ছেড়ে ও পাজামা পাঞ্জাবি পড়ে ব্যালকনিতে পাতা বেতের চেয়ারে বসে আকাশের দিকে তাকালো। তারা ভরা আকাশ। তবে চাঁদ নেই। হয়তো আছে। আড়ালে।

তারও মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে সেও যেন কোন কিছুর আড়ালে লুকিয়ে আছে। একটা রহস্যের মেঘ যেন তার চারদিকে জমাট হয়ে আছে। কেন মনে হচ্ছে সে তা জানে না। রহস্যের মেঘ তো তাকে জড়িয়ে থাকতে পারে না। সে তো রহস্যভেদ করেই আনন্দ পায়। রহস্যভেদ করাটাই তার পেশা। তার স্বভাব। তাহলে কেন যে এসব কথা মনে হয় কে জানে।

তামান্না এলো রাতের খাবার নিয়ে। খাবার রেখে সে চলে যাচ্ছিল। গোলাপ তাকে ডাকল,—তোকে কটা কথা জিগ্যেস করব তামান্না।

—কহিয়ে।

—তুই জানিস, আমি মাঝে মাঝে রাত্রে বেরিয়ে যাই।

—জি।

—আমায় কিছু বলিস না তো?

—কেয়া বলুঁ। আপ তো পোলিস মে কাম করতা হ্যায়।

—পুলিস হলেই রাতে রাস্তায় বেরুতে হবে?

—হো ভি স্যকতা।

—আচ্ছা, রাত্রে কখন ফিরে আসি তা তুই জানিস?

—কভি কভি। যব আপ চাবি লেনে ভুল যাতা। লেকিন বাবুজি—

—হ্যাঁ বল।

—ই সোব বাত আপনি আমায় পুছতাছ করছেন কেন?

—দরকার আছে।

—আওর এক দিদিজি, এক বাবুজি, অ্যায়সাই সওয়াল পুছনেকে লিয়ে আয়া থা। কুছদিন পহেলে।

—আর একজন দিদিমণি? কে সে?

—জানতা নেহি।

—কী জিগ্যেস করেছিল?

—সাব কোন টাইম মে ঘর পে রহতা। কোন টাইম মে নিকাল যাতা। ফিন ক বাজে লউট আতা।

—তুই কী বললি?

—যো সাচ সোহি বোলা।

—জিগ্যেস করিসনি ওরা কারা?

—হাঁ। পুছা থা। লেকিন উলোগ কুছ না জবাব দিয়া।

—কেমন দেখতে মনে আছে?

—দিদিজি দেখনেসে আচ্ছাই লাগতা। আর সহাবকো ভি অ্যায়সাই।

—কী রকম বয়েস হতে পারে?

—করীব দিদিজিকা ওমর বিশকা উপর। সাহাবকো ভি অ্যায়সাই। আউর দিদিজি কুর্তাপাজামা পড়িয়েছিলেন।

—ঠিক আছে। ফের যদি আসে নাম জেনে রাখবি। তুই যা। খাওয়া হয়ে গেছে?

—নেহিজি। আপ খায়া নেহি। হাম কেইসে খাউ? আভি খা লেগা। যেতে গিয়েও না গিয়ে আবার ফিরে এলো।

—আর কিছু বলবি?

—আউর একঠো বাত পুছা।

—কি?

—আপ্‌কা কোই কালাবালা কুর্তা হ্যায় কি নেহি?

—ঠিক আছে। তুই খাবার নিয়ে আয়।

তামান্না চলে যেতেই গোলাপের মগজে আবার চিন্তা ঢুকল। তার খোঁজে এসেছিল একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। একসঙ্গে। কে? কে তারা? আবার প্রশ্ন করে গেছে সে কখন বের হয়। কখন বাড়ি ফেরে। এমন কি কালো পাঞ্জাবির খোঁজও নিয়েছে কেন? এ প্রশ্ন তাদের করার কারণ কী? তবে কি তারা ক্রিমিন্যাল কেউ? হলে সে হবে পুরুষমানুষ। তাহলে মহিলা কেন? আর যদি ক্রিমিন্যাল না হয় তাহলে কে হতে পারে? খুন হওয়া কারো ফ্যামিলি মেম্বার? তার কাছে সাহায্য পাবার আশায় এসেছে? হতেই পারে। সম্ভবত এটাই সম্ভব। নাম ঠিকানাটা তামান্নার রেখে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু নাম জানায়নি। এটাও রহস্য।

খেতে খেতেই ভাবছিল। হাতটাত ধুয়ে ব্যালকনিতে বসে একটা সিগারেট ধরালো। এ ব্যালকনিতে বসলে অনেক নিচে সুন্দর করে সাজানো রাস্তা দেখা যায়। কাছ থেকে সব কিছুই বড় ক্রুড মনে হয়। আবার সেই বস্তুই যখন অনেক দূরে চলে যায় তখনই তাকে কত সুন্দরই না লাগে। জীবনের এটাই রহস্য। কাছে থাকতে থাকতে একটা মানুষকে যখন অসহ্য মনে হয় তখন তাকে ছেড়ে চলে যেতে হয় বেশ কিছু দূরে। বেশ কিছুদিনের জন্যে। আর এই অনুপস্থিতিটাই পরস্পরের প্রতি আকর্ষণকে বাড়িয়ে তোলে।

শহরটাকে এখন ভারি সুন্দর লাগছে। দূরের উঁচু উঁচু ফ্ল্যাট বাড়িগুলোর জ্বলন্ত আলোগুলো হীরে চুনী পান্নার মতো জ্বলছে। এ ফ্ল্যাটটার এটাই মজা। পুব দক্ষিণ অনেক দূর পর্যন্ত খোলামেলা। চমৎকৃত করে এর প্রাকৃতিক দৃশ্য। মনকে উদাস করে। মনে আছে দার্শনিক চিন্তাভাবনা। স্বপ্নাদির আজকের ব্যবহারটা তার খুব খারাপ লেগেছে। কোন মেয়েকে তার ভালো লাগলে সে তাকে চায়। আর মেয়েটিও তাকে এড়িয়ে যেতে পারে না। তার কাছে ধরা দেয়। কিন্তু কেউ যদি তা না করে? যেমন স্বপ্নাদি? সে জানে গোলাপসুন্দর তার কাছে কী চায়। কিন্তু? অবহেলা আর প্রতারণা সে বরদাস্ত করতে পারে না। যেমন ঐ সতী মেয়েটা...

ওহ্ মাই গড্ বলেই গোলাপ থমকে দাঁড়ালো। চিন্তা হোঁচট খেলো। সতী? মানে ঐ গণিকা মেয়েটি। হ্যাঁ, তার মনে পড়ছে। একটু একটু করে। সে রাত্রে কমলের বাড়ি থেকে ফেরার আগে মদ্যপানে তার শরীর শিথিল হয়েছিল। তার ওপর কমলের সুন্দরী বউয়ের রূপ আর রূপের ধাক্কা তাকে ক্রমশ উত্তপ্ত করছিল। সে তাড়াতাড়ি ট্যাক্সিতে উঠে সোজা গাড়ি চালাতে বলে। তারপর... তারপর... হ্যাঁ তার মনে পড়ছে, সে গিয়েছিল সোনাগাছির খানদানি বাড়িতে। সেখানে সুন্দরী গণিকাদের ভিড় বেশি। রাত তখন অনেক। সে সোজা উঠে গিয়েছিল

তিনতলায়। সব ঘরের দরজাই তখন বন্ধ ছিল। একজন বিগতযৌবনা তার কাছে এগিয়ে এসে বলেছিল, দু নম্বর ঘর ফাঁকা আছে। সে যেতে পারে। অবশ্য যদি তার পছন্দ হয়। তার দামটা একটু চড়া।

কিছু না বলে পকেট থেকে একটা পাঁচশো টাকা ধরিয়ে দিয়েছিল সেই বিগত যৌবনার হাতে। তারপর সোজা ঢুকে গিয়েছিল মেয়েটির ঘরে। তারই নাম সতী। কিন্তু...

সতী তাকে ঢুকতে দিতে চায়নি। তাকে বেরিয়ে যেতে বলেছিল। বলেছিল, তার শরীর ভালো নেই। সে রাতে আব কোন বাবুকে সে এনটারটেইন করবে না।

গোলাপ খুব নোংরা গালাগালি দিয়ে চিৎকার করে উঠেছিল। মউসি এগিয়ে এসে সতীকে রাজি করিয়েছিল বটে। তবে আরও পাঁচশো টাকা বেশি দিতে হয়েছিল এক গণিকার জন্যে। টাকা নয়। অন্যতর একটা প্রবৃত্তি, এক জিঘাংসা মনোবৃত্তি তাকে উন্মত্ত করেছিল। তারপর মেয়েটির শরীর থেকে পাতলা নাইটিটা খুলে ফেলেছিল। সেই নাইটি দিয়ে মেয়েটির প্রবল আপত্তি থাকা সত্ত্বেও সে তার দুপায়ের গোড়ালি একত্রিত করে বেঁধে ফেলেছিল। তারপর... হ্যাঁ মনে পড়ছে, মেয়েটির শরীরটাকে যখন সে ময়দার তালের মতো পিষছে, তখনই মেয়েটি, সম্ভবত ক্লান্ত থাকার জন্যেই তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। খাটের কাঠে তাব হাতটা ছিটকে লাগে। এবার মনে পড়েছে ঘড়ির কাচ ভাঙার রহস্য। তারপর সে যখন নতুন করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, মেয়েটি খপ্ করে কব্জি চেপে ধরেছিল। এখন মনে পড়ছে কেন মেয়েটির মুঠো করা হাতের তালুতে ঘড়ির কাচের টুকরো পাওয়া গিয়েছিল। অবশ্য ফোরেনসিকও ডেফিনিট হতে পারেনি। কাচের সব টুকরো পাওয়া যায়নি। যা পাওয়া গিয়েছিল তা দিয়ে প্রমাণ করা যেতো না পাওয়া কাঠের টুকরোগুলো তারই ঘড়ির কাচ।

কিন্তু এরপর তার আর কিছুই মনে নেই। আবার সব অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। কেবল মনে আছে পরের দিন সকালে তার ফোন বেজে উঠে সংবাদ দেয় সতী খুন হয়েছে গতরাতে।

সত্যটা দিনের আলোর মতো আস্তে আস্তে ফুটে উঠছে। অনিচ্ছা আর ক্লান্তিতে মেয়েটি তাকে বাধা দিয়েছিলো। কিন্তু তার কামনার উত্তাপ মেয়েটিকে তছনছ করেছে। তাকে ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর দিকে।

তাহলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় সি আই ডি চিফ অফিসার গোলাপসুন্দর বসু একজন খুনি। তাহলে নন্দিতা দত্তের খুনিও সেই। সেই একই প্রক্রিয়ায় খুন করা। আসলে সে রাত্রেও সে কামতাড়নায় পাগল হয়ে গিয়েছিল। চেয়েছিল একটি মেয়ের শরীর। আর সেই কারণে চনমনে নন্দিতা তার দ্বিতীয় বলি? কিন্তু, আবার সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। নন্দিতাকে সে খুন করল কখন? সেটাই তো সে বুঝে উঠতে পারছে না।

কিন্তু সাপ? সাপের ব্যাপারটা কী? কালো সবুজ ডোরাকাটা সাপ নিয়ে সে কেন গিয়েছিল রুবি পালিতের বাড়ি?

সাপ! সাপ!! ভাবতে চেষ্টা করল সবুজ কালো ডোরা কাটা সাপ? এবং ঠিক তখনি মগজে বিদ্যুৎ চমক। গোলাপের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে একটি পরিচিত ডায়লগ,—ওহ মাই গড।

তামান্না তাকে প্রায়ই তাগিদ দিত কাচা জামাকাপড় মেলার জন্যে বাজারে ইলাসটিক কর্ডের দড়ি পাওয়া যায়। তার দুপাশে হুক। তেমনি একটা দড়ি কেনার কথা ছিল। কিন্তু, সে তো কোন দড়ি কেনেনি। তাহলে দড়িটা এলো কোত্থেকে? রুবি পালিতের গলায় যেটা সাপের মতো পেঁচিয়ে বসেছিল। নাহ্! আবার সব হারিয়ে যাচ্ছে।

গোলাপসুন্দর ভেবেছিল স্বপ্নাদির কাছে তার গোপন অভিসারের কথা আর কেউ জানবে না। কিন্তু সবটাই ছিল অম্লান আর সোহিনীর কৌশল। ব্যাপারটা প্রথম নজরে এসেছিল অম্লানের। হঠাৎ গোলাপ তার বাড়ি আসা-যাওয়া বাড়িয়ে দিয়েছিল। একটু অবাক হলেও অম্লান ভেবেছিল গোলাপ সম্ভবত তার অসুখের ব্যাপারে অম্লানের সঙ্গে আলোচনা করতেই আসে। যদিও তার চেম্বারে যাওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু তা না করে সে ক্রমশ অম্লানের অনুপস্থিতিতে স্বপ্নাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করতেই সে সজাগ হয় উঠল। ওঠার কারণ একটাই। কোন একটা বিশেষ রোগে আক্রান্ত গোলাপসুন্দর। আর সে রোগের পরিণাম শহরে পর পর তিনটি তিন পেশার মহিলার খুন হওয়া। আর এ রোগটা এতই সর্বনাশা আর ভয়ংকর যার পরিণতি ফেয়ার পার্টনারের মৃত্যু।

স্বপ্নাদি কেবলমাত্র তার আশ্রিতা নয়। সে তার দিদির মতো। তার মায়ের আদেশ স্বপ্নাদিকে চিরদিন দেখতে হবে। যতদিন সে বাঁচবে।

গোলাপসুন্দরের প্রায় প্রতিদিন স্বপ্নাদিকে ফোন করা এবং একান্তে দেখা করার ব্যাপারটা সে জানালো ইন্সপেক্টর সোহিনী সিংকে। নয়নতারাকে জানালো না কারণ সে মনে কষ্ট পাবে। এমনকি নয়নতারা এখনও পর্যন্ত জানে না শহরের তিনিটি মহিলা খুন কার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। হয়তো সে বিশ্বাসই করবে না।

চেম্বারেই এসেছিল সোহিনী। সঙ্গে ছিল সুবীর,—কী ব্যাপার অম্লান? এতো জরুরী তলব কেন? এনি সিরিয়াস ডিসকাশান?

—হ্যাঁ সোহিনী। আমার কাছে ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াস। প্র্যাকটিক্যালি আর এক মহিলার জীবন বিপন্ন। যে কোন মুহূর্তে মহিলার মৃত্যু ঘটতে পারে।

—ইউ মিন মার্ডার? হোয়্যার?

এরপর অম্লান তার ভয় আর সন্দেহ তুলে ধরল সোহিনীর কাছে। জানালো, বর্তমানে গোলাপের মানসিক অবস্থা আরও ফিউরিয়াস হয়ে গেছে। নিজের অজ্ঞাতে খুন করতে করতে এখন সে এক্সপার্ট খুনি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্ভবত খুনের নেশা তাকে পেয়ে বসেছে। একটা বিশেষ মুহূর্তে সে তার যে কোন সেক্সপার্টনারকেই খুন করতে পারে।

সুবীর বলল,—আপনি তো সাইকিয়াট্রিস্ট। আপনার নাম আছে। গোলাপদা আপনার বন্ধু। আপনি পারেন না আপনার বন্ধুকে বাঁচাতে?

—আমি তো সেই চেষ্টাই করছি।

—যেমন?

—আমি তাকে পুলিসের হাতে তুলে দিতে চাই।

—সেটা তো তার শেষ পরিণতি। তার আগে কিছু করা যায় না?

—হয়তো যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে তাকে কোন রকমেই বা কোন গ্রাউন্ডেই আপনি তার ট্রিটমেন্ট করাতে পারবেন না। তাকে থরো ট্রিটমেন্ট করতে গেলে পুলিসের কড়া পাহারায় হস্‌পিট্যালাইজড্ করা দরকার। আমি জানি সে কয়েকটা দণ্ডমূলক অপরাধ করেছে। কিন্তু যদি প্রমাণ করা যায় সে মেন্টাল পেশেন্ট, এবং সেই অবস্থায় সে খুনের মতো গর্হিত কাজ করে ফেলেছে পুলিস হসপিটালে তার ট্রিটমেন্ট হতে পারে। তার শাস্তি মকুব হতে পারে। আর সেই জন্যেই আমি চাই তাকে পুলিস অ্যারেস্ট করুক।

সোহিনী আর সুবীর মন দিয়ে অম্লানের কথা গুলো শুনলো। তারপর সোহিনী বলল,—গোলাপজি যে কালপ্রিট এটা আমরা সবাই অনুমান করেছিলাম। এই নিয়ে আমি ডিসি ডিডি ইভন এসপি সাহেবের সঙ্গেও বাতচিত করেছি। লেকিন কোন সলিড প্রমাণ হাতে ছিল না। এসব ক্ষেত্রে খুনি খুব ইনটেলিজেন্ট হওয়ার জন্যে কোই প্রমাণ ফেলে রাখে না। গোলাপজিও রাখেনি। বাট আই শ্যাল হ্যাভ টু গেট হিম ইনটু মাই কাস্টডি। আই ওয়ান্ট টু ক্যাচ হিম অন দ্য স্পট।

—অন দ্য স্পট মানে?

—কোই লেড়কির সঙ্গে ক্লোজ অ্যাটাচ্ড্ অবস্থায় যব গোলাপজি মিলবে, দ্যাট উইলবি দ্য স্পট্। অ্যান্ড আই হ্যাভ গট দ্য চান্স। একটু আগেই অম্লান আমাকে স্বপ্নাদির কথা বলিয়েছে। গোলাপজি ইজ নাউ ভেরি মাচ ইন্টারেস্টেড টু গেট স্বপ্নাদি'জ কম্পানি। সো—,

—কিন্তু ব্যাপারটা খুব রিস্‌কি হয়ে যাবে না? স্বপ্নাদি দেখতে শুনতে খুব মডার্ন হলেও, একেবারেই সরল মেয়ে। মারপ্যাঁচের ব্যাপারগুলো ওর আসে না। ওর যদি কোন ক্ষতি হয়ে যায়—নারাজ কণ্ঠে অম্লান বলল, না না, সে ঠিক হবে না।

—হবে, সুবীর বলল, হবে ডাক্তার সাহেব। আমাদের পুরো ফোর্স আপনার বাড়ি ঘিরে থাকবে। উনি কিছু করার আগেই আমরা ওঁকে অ্যারেস্ট করে ফেলব। আসলে গোলাপদা তো জানেনই না যে উনি খুনি। তাই বেশি সজাগও হতে চাইবেন না। তিন তিন জনকে খুন করেছেন। টোপ হিসেবে আমাদের চতুর্থ জনকে পাঠাতেই হবে। হাতে নাতে ধরা ছাড়া এই ধরনের সাইকিক পেশেন্টদের অ্যারেস্ট করা শক্ত। এবং অ্যারেস্ট করলেও তার এগেনস্টে প্রমাণ সমেত চার্জশিট তৈরি করা ভেরি ডিফিকাল্ট। তাই—

কথা কেড়ে নিয়ে সোহিনী বলে,—উসি লিয়েই তো তুমার হেল্প আমার দরকার অম্লান।

ইতস্তত করে অম্লান জিগ্যেস করল,—স্বপ্নাদিকে কী আমাদের কথা জানাবো?

—নো। নট অ্যাটল। উনি খুবই সাধারণ লেডি। উনার পক্ষে যাদা ড্রামা করা নট ভেরি পসিবল। সো লেট আর মুভ অ্যাজ ইউজুয়াল। অ্যান্ড উই স্যাল মুভ অ্যাজ পার আওয়ার প্ল্যানস্। ওক্কে?

—গোলাপের স্ত্রীকে কিছু জানাবার দরকার আছে?

—নো। দো আই নো শী ইজ ভেরি মাচ ইনটেলিজেন্ট, ইয়েট শী ইজ দ্য ওয়াইফ অব গোলাপসুন্দর বাসু। কিছু না কিছু উইকনেস তো থাকবেই। জানাজানি হলে সব প্ল্যানটাই ভেস্তে যাবে।

সো—।

—আচ্ছা ডক্টর দত্তগুপ্ত, গোলাপদা কি ইদানীং প্রায়ই এ বাড়িতে আসাযাওয়া করেন?

—হ্যাঁ সেই রকমই শুনেছি।

—কিন্তু আমরা কোন ভুল করছি না তো?

—ভুল? কী ভুল?

—স্বপ্নাদিকে তো আপনি দিদি ডাকেন। অর্থাৎ উনি আপনার থেকে বয়েসে বড়ো।

—হ্যাঁ। প্রায় বছর ছয় সাত তো হবেই।

—তার মানে উনি গোলাপদার থেকেও বয়েসে বড়।

—সো হোয়াট? সোহিনী বেশ ঝাঁঝে নিয়েই বলল, তুমি সুবীর, বহু পিছিয়ে আছ। এখন বয়স টয়স নিয়ে তেমন কেউ ভাবনা চিন্তা করে না। এজ ইজ নট অ্যাট অল আ ফ্যাক্টর।

—কথাটা আমি উড়িয়ে দিচ্ছি না। তবে গোলাপদার মোন্টলিটি কী তা তো আমরা জানি না। স্বপ্নাদিকে উনি কি চোখে দেখেন সেটাও আমাদের অজানা।

—সুবীর তুমি কী বোলতে চাইছ, একটু ক্লিয়ার করে বলবে?

—তুমি চাইছ স্বপ্নাদিকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে। কিন্তু টোপটা যদি আদপে টোপ না হয়। অর্থাৎ স্বপ্নাদির সঙ্গে গোলাপদা হয়তো দিদি হিসেবেই মেলামেশা করে।

—হতে পারে, অম্লান সিগারেটা ধরাতে ধরাতে বলল, এটা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া স্বপ্নাদিকে তো এইসব ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করা যায় না। তবে আমার স্টাডি অনুযায়ী, নয়নতারা ঐ ভাবে চলে আসার পর গোলাপের মধ্যে প্রচণ্ডভাবে একাকীত্ব গ্রো করে। এমন কি ওর ঐ স্যাডিজ্‌মটাও ঐ মানসিক অবসাদ থেকে আসতে পারে। মনের ওপর সাডেন জার্ক। তাই হয়তো ওর অবচেতন কোন নারীকে খোঁজে। এমন কোন নারী যার কাছে ওর অবদমিত সেক্সকে মিটিয়ে নিতে পারে। সেখানে সে বড়-ছোট কিছুই মানবে না।

সোহিনী আর সুবীর, দুজনেই অম্লানের কথাগুলো শুনলো। তারপর সুবীরই বলল,—বেচারা গোলাপদা। হাই র‍্যাঙ্কের সি আই ডি অফিসার। ওপরমহলের অগাধ বিশ্বাস ঐ মানুষটার ওপর। অথচ, নাহ্, ডক্টর দত্তগুপ্ত, মিসেস বাসু, আই মীন নয়নতারা দেবী ঠিক কাজ করেননি। মানছি, ওনারও জীবনের ভয় ছিল। কিন্তু অকারণ ভয়ে বা অভিমানে উনি মূল্যবান ছটা' মাস নষ্ট করে দিয়েছেন। উনি যদি সরাসরি আপনার কাছে চলে আসতেন, তাহলে হয়তো—

কথা ধরে নিয়ে অম্লান বলল,—তাহলে হয়তো একটা ট্রিটমেন্ট চলতো। কিন্তু ওর এই অ্যামনেসিয়ার ব্যাপারটা কতদিনের সেটা না জানলে স্যাডিজ্‌মটা।

—আপনার কি ধারণা অ্যামনেসিয়ার জন্যে স্যাডিজ্‌ম্ না

—কোনটার জন্যেই কোনটা নয়। দুটো আলাদা রোগ। অ্যামনেসিয়া যে কোন লোকেরই হতে পারে। যে কোন সাডেন শক্ থেকে হতে পারে। স্মৃতি বিলোপের অনেক কারণ আছে। সেটা লং পিরিয়ডের জন্যে থাকতে পারে। আবার কিছুক্ষণের জন্যে হতে পারে। ব্ল্যাকআউট হয়ে যাওয়া। সেই সময়ের কিছুই আর পরে মনে থাকে না। কিন্তু স্যাডিজ্‌ম্ একটা মেন্টাল ডিজিজ।

হঠাৎই সোহিনী উঠে দাঁড়ায়।

—কি হোল সোহিনী ডাক্তারি ব্যাপারটা ভালো লাগছে না?

—লাগছে। লেকিন এখোন আর কোন ভাবেই টাইম ওয়েস্ট করতে ইচ্ছে করছে না। যতো দেরি হবে কোই না কোই মেয়ের জীবন বিপন্ন হ'তে পারে। পলাশ সাহেব আমাকে ইনভেস্টিগেশানের পুরো দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছেন। আমি সেটা সদ্ব্যবহার করতে চাইছি। অম্লান

তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ এতো তাগাদা কেনো লাগাচ্ছি। যদি কোই দোসরা লেড়কি এখন খুন হয় আমার সার্ভিস রেকর্ডে একটা ব্ল্যাকস্পট পড়বে। হুইচ আই ডোন্ট ওয়ান্ট। সো—

—ঠিক আছে সোহিনী। আই শ্যাল ট্রাই মাই লেভেল বেস্ট টু হেল্প য়ু। বাট রিমেম্বার স্বপ্নাদি ইজ মাই দিদি। কোন মতেই কিন্তু আমি তার লাইফ রিস্ক্ করাতে পারবো না।

—আপ কৃপয়া মুঝ্ পর বিশওয়াস রাখিয়ে জি!

এবার আর মাতৃভাষার লোভটা ছাড়তে পারল না সোহিনী।

ওয়াড্রোবটা তন্নতন্ন করে খুঁজছিল গোলাপসুন্দর। সবুজ কালোয় ডোরাকাটা সাপটা সে সেদিন রুবি পালিতের বাড়িতে খুঁজে পায়নি। রুবির শরীরটা নিয়ে খেলা করার সময় তার হাতে সেই সাপটা ছিল। সেটাকে সে রুবির ধবধবে শরীরে নানান কায়দায় ছেড়ে দিচ্ছিল। রুবিও প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেও পরে বেশ মজা পাচ্ছিল। এমন কথাও বলেছিল, এখন মনে পড়ছে, কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ করে বলেছিল, ঠিক এই সময়ে সাপ নিয়ে খেলা করার কী মানে জান তো?

সে বলেছিল সে জানে না। উত্তরে রুবি বলেছিল পরে বলে দেবে।

কে জানে রমণের সময়ে সাপের কী কাজ! আসলে সে তো খেলার ছলে, মজার ছলে সাপটাকে—

আবার তার চিন্তা হোঁচট খেল। সাপ কেন? তার পকেটে সাপ থাকবে কেন? এই কেনর উত্তর অবশ্য ও পরে পেয়েছে। জিনিসটা সাপ নয়। একটা ইলাসটিক কাপড় মেলাব দড়ি। তামান্না তাকে আনতে বলত। কিন্তু সেটা কোথায়?

ওয়াড্রোবটা আগাপাশতলা খুঁজেও বার করতে পারলো না। সেই মুহূর্তে হতাশ হয়ে অন্য কিছু ভাবছিল হঠাৎই ওর দৃষ্টি চলে গেল ব্যালকনির এমাথা ওমাথায়। গেঞ্জী, জাঙ্গিয়া, টাওয়েল, রুমাল মেলা আছে। এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে সবুজ কালো ডোরা দেওয়া একটা দড়ির কিছু কিছু অংশ। সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে গেল ব্যালকনিতে। এই তো! এই তো সেই সাপ। সেই দড়ি। যেটাকে সে খুঁজছে। যেটাকে সে পেয়েছিল রুবির বাড়িতে। কিন্তু এটা কখন এলো? কী ভাবে এলো?

—তামান্না, তামান্না এদিকে আয়।

তামান্না বোধ হয় রসুই ঘরে আটা মাখছিল। সেই অবস্থায় উঠে এসেছে,—সাব, কেয়া হুয়া সাব?

—এই দড়িটা তুই কোত্থেকে পেলি?

—কিঁউ সাব! ইয়েতো আপহি লে আয়া।

—কব?

—ইতনা মালুম নেহি। লেকিন আপকো পেন্টকা পাকিটসে মিলি হুই।

—আমার প্যান্টের পকেটে? কোন প্যান্ট?

ওয়াড্রোব খুলে তামান্না প্যান্টটা দেখিয়ে দিল। প্যান্টটা দেখেই ওর শরীরের রক্ত নিমেষে চলকে উঠল। আরো নিশ্চিত হবার জন্যে সে জিগ্যেস করল,—তামান্না, তোর কি মনে আছে, ঐ প্যান্টের সঙ্গে আমি কি শার্ট পড়েছিলাম।

—জি হাঁ।

—কী? বল?

—ওহি সফেদবালা গেঞ্জি।

মনে পড়ছে। গোলাপসুন্দরের এখন অনেককিছু মনে পড়ে যাচ্ছে।

একবার শিলিগুড়ির হংকং মার্কেট থেকে একটা আমেরিকান প্যান্টের পিস্ দেখে ওর খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। কাপড়টার বুনোনটাই একটু অন্যরকমের। খুব হেভি কাপড়। সব থেকে আকর্ষণীয় কাপড়টার রঙ। নীল। এবং এই নীলটা চট্ করে দেখা যায় না। উজ্জ্বল কোবাল্ট-ব্লু-র সঙ্গে সামান্য কালো মিক্স্ড্ করে যে রঙটা দাঁড়ায়। এছাড়া পিস্‌টার একটা অদ্ভুত জেল্লা ছিল। দরদাম কিছু না করেই পিসটা কিনে নিয়েছিল।

কোন অকেশান হলে গোলাপসুন্দর প্যান্টটা গলিয়ে নিত। সেদিন কোন অকেশান ছিল না। ডিপ ব্লু প্যান্ট আর তার ওপরে ধবধবে সাদা গেঞ্জিটা পরে বেরিয়ে গিয়েছিল। সারাদিন অনেকগুলো কাজ ছিল। বাইক নিয়ে যে মুহূর্তে টালিগঞ্জে উত্তমকুমারের স্ট্যাচুর কাছে এসেছে তখনই রিকশাস্ট্যান্ডে রিকশা থেকে নামছিল রুবি পালিত।

এটা সেটা কথার পর সে রুবিকে নিয়ে গিয়েছিল ব্লুফক্সে। তার সঙ্গে ড্রিঙ্ক্ করেছিল। তার বাড়ি গিয়েছিল। একসময় মেয়েটি তার বেডপার্টনার হয়েছিল। এবং তারপর...না, অজান্তে নয়, এখন তার মনে পড়েছে, সহবাসকালে সে ঐ কালোসবুজ সাপটাকে তার গলায় পেঁচিয়ে দিয়েছিল। এবং হ্যাঁ মনে পড়ছে, তার হাত আর পা দুটোও বেঁধে দিয়েছিল। রুবি জিগ্যেস করছিল কেন সে তার হাত পা বাঁধছে। উত্তরে সে বলেছিল, মনে পড়েছে তার, সে বলেছিল, ইটস্ আর গেম। আ সেক্স গেম।

তার মানে, ব্যালকনি থেকে ফিরে এলো গোলাপসুন্দর এসে দাঁড়ালো টানা আয়নার সামনে। আপাদমস্তক তার প্রতিচ্ছবি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আয়নাটা।

সি আই ডি অফিসার গোলাপসুন্দর বসু গোয়েন্দার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে প্রতিচ্ছবির দিকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাকে আরও কিছু অতীত গল্প শোনাতে শুরু করল। গল্প নয় সবই সত্যি।

আয়নার বুকে তখন মেঘ মেঘ কুয়াশা। এ কুয়াশা তরল কুয়াশা। সরে যেতেই ভেসে উঠল এক কিশোরীর মুখ। চিন্ময়ী। চিন্ময়ী মূর্তি। তারা তখন থাকতো জলপাইগুড়িতে। সে আর তার বিধবা মা। বাবা মারা যাবার সময়ে কিছু টাকা রেখে গিয়েছিলেন। তারই সুদে চলছিল মা আর ছেলের সংসার। কোন মতে। সেই তখনই তার একটি মেয়েকে ভাল লেগেছিল। পাশের বাড়ির মেয়ে। চিন্ময়ী মুখার্জি।

গোলাপ তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে চেয়েছিল। কিন্তু নাক উঁচু মেয়েটি, যেহেতু ধনী বাবার একমাত্র মেয়ে, গোলাপকে কোন পাত্তাই দেয়নি। একটি মেয়ের ওপর তার রাগের শুরু তখন থেকেই। সেই রাগটা চরমে পৌঁছল এক দুপুরের এক দৃশ্যে। চিন্ময়ী তখন রতিক্রিয়ায় ব্যস্ত

ছিল গভীর জঙ্গলে একটি চা বাগানের সিকিওরিটি গার্ডের সঙ্গে। নিমেষে তার রক্ত চড়ে গিয়েছিল। চা বাগানের ষণ্ডা এবং গুণ্ডা ছেলেটিকে দেহ দিতে তার কোন কৌলিন্যে বাধেনি অথচ সে, গোলাপসুন্দর বসু, একমাত্র অর্থনৈতিক বিপন্নতা ছাড়া সে তো ঐ ষণ্ডাটির থেকে কোন অংশেই ছোট ছিল না। জীবনের প্রথম এবং শেষ বলাৎকার। হ্যাঁ বলাৎকার তো বটেই। চিন্ময়ীকে সে ধরে ফেলেছিল সেই জঙ্গলেই। অন্য একদিন। চিন্ময়ী চেচাঁতে চেয়েছিল। কিন্তু একে সদ্যযুবক, তায় ব্যায়াম করা শরীর। পারবে কেন যুঝতে চিন্ময়ীর লতানো শরীর?

রমণ করতে করতেই নাম না জানা লতানো শিকড়ের ফাঁসে চিন্ময়ীর ভবযন্ত্রণা শেষ করে দিয়েছিল। পুলিস তাকে সন্দেহ করেনি। বরং সে-ই চা বাগানের সিকিওরিটি গার্ডটিকে পুলিস দিয়ে অ্যারেস্ট করায়। একটা উড়ো বেনামী চিঠিতে গার্ডটিকে দোষী বানিয়ে পুলিস চৌকিতে খবর পাঠিয়ে দিয়েছিল সে নিজেই। তারপর সে চলে আসে কলকাতায়। গার্ডটির কোন শাস্তি হয়েছে কি না সে আর খবর রাখেনি। তবে তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল এতেই গোলাপসুন্দর খুব আনন্দ পেয়েছিল।

তার দ্বিতায় খুন এক গণিকা। সতী। তার অপরাধ সে টাকার বিনিময়ে তাকে সঙ্গ দিতে গড়িমসি করেছিল। টাকা নেবার পর গণিকা তার সেই মুহূর্তের নাগরকে ফিরিয়ে দিতে পারে না। সেটা তার বেইমানি। এটাও বলাৎকার। গণিকাকে বলাৎকার। কারণ মেয়েটির চরম অনিচ্ছায় তাকে সে চরম ক্ষণে এনে ফেলেছিল। কিন্তু মেয়েটি হঠাৎই তাকে ঘুষি মারতে যায়। প্রচণ্ড শাক্তিশালী এক গোয়েন্দা অফিসার, তার ইগো, মেয়েটির অহংকার আর গণিকার স্পর্ধা সে সহ্য করতে পারেনি। মাথার বালিশটা মুখের ওপর চেপেই....।

তৃতীয় খুন নন্দিতা দত্ত। জার্নালিস্ট। কিন্তু এক কথায় ছেনাল। না আছে পদমর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা। না আছে পেশার প্রতি আনুগত্য। নিজেকে খুব মড় ভাবতো। মাত্র কদিনের আলাপেই সে গোলাপের সঙ্গে একই বিছানায় শুতে আপত্তি করেনি। অর্থাৎ এরা সেই মেয়ে যারা শারীরিক প্রয়োজনে যখন খুশি যে কোন ছেলেকেই বেডপার্টনার করে নিতে পারে। তাহলে সতীর সঙ্গে নন্দিতার তফাত কি? একজন শিক্ষিতা ফ্লার্ট। অন্যজন বারবধূ। সতীকে সে মারতো না। তার তাচ্ছিল্যই তার মৃত্যুর কারণ। নিজের পেশাকে অসম্মান করাই তার মৃত্যুর কারণ। আর নন্দিতা? উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন এবং মেকি আঁতেলপনা। নিজেকে এবং নিজের পেশাকে অপমান করা ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব মেয়ের না বাঁচাই ভালো।

চতুর্থ খুন রুবি পালিত। কেরিয়ারিস্ট! হতেই পারে। সে যে লাইনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে সেখানে লুচ্চা প্রোডিউসার আর যৌন লোলুপ কিছু পরিচালক হাঁ করে বসে থাকে রুবিদের ছিঁড়ে খাবার জন্যে। রুবিদের কোন উপায় নেই। তাকে বাধ্য হয়েই, নিত্য নতুন কাজ পাবার তাগিদে তাকে দেহদান করতেই হয়। গোলাপ ভাবল, চতুর্থ খুনটা সে করতে চায়নি। রুবির সঙ্গে কথা বলে তার মনে হয়েছিল, তার প্রতি রুবির দীর্ঘদিনের দুর্বলতা। সেই যবে নয়নতারা আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। সেদিন তাকে কাছে পেয়ে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিল। তার চাওয়াগুলোও মিটিয়ে নিয়েছিল। এমন কি তার হাত-পা বাঁধার খেলাটাও সে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু গোলাপ বুঝতে পারে, ক্রমশ সে প্রবৃত্তির দাস হয়ে চলেছে।

তার প্রথম দিকের খুনগুলোর একটা মোটিভ ছিল। জ্বালা মেটানোর তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকেই কয়েকটি মেয়ের মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু রুবি? একটা নিছকই দুর্ঘটনা। জীবনসংগ্রামে রুবি বাঁধনছেঁড়া হয়ে ভেসে যাওয়াটা তার কাছে খুবই খারাপ লেগেছিল। সে ভেবেছিল

রুবিকে কোনভাবে যদি ঐ জীবনের মোহ থেকে বার করে আনা যায়। কিন্তু, নাহ্ এটা সম্পূর্ণই দুর্ঘটনা। সে রুবিকে খুন করতে চায়নি।

কিন্তু আর একজনের নৃশংসতা আর হঠকারিতার শোধ তাকে নিতেই হবে। আর সত্যি কথা বলতে কি নয়নতারার অপরিণামদর্শী হঠকারিতার জন্যে নিজের অজান্তেই সে অনেকগুলো খুন করে ফেলেছে।

সে জানে নয়নতারা এখন কোথায়? পালিয়ে আর লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু নয়নতারার জানা উচিত এফিসিয়েন্ট সি আই ডি অফিসার গোলাপাসুন্দর বসুর পক্ষে তার অদৃশ্য হয়ে থাকা স্ত্রী নয়নতারা বসুকে খুঁজে নিতে খুব বেশি সময় লাগবার কথা নয়।

এতোদিন সে দেখা করেনি। দেরি হয়ে গেল। তার সঙ্গে দেখা করতেই হবে। বেটার লেট দ্যান নেভার। একটা বোঝাপড়া তো দরকার!

সোহিনীর টেবিলে এখনও সেই কালো রঙের গাঁক গাঁক করা টেলিফোনটাই আছে। অনেকেই ওকে পাল্টাতে বলেছিল। বিশেষ করে গোলাপসুন্দর। প্রায় দিনই ঠাট্টা করে বলতো,—মিস্ তুমি এখনও ব্যাকডেটেড রয়ে গেলে।

—হোয়াই স্যার?

—এখনও পড়ে আছ ক্লাইভের যুগে। টেলিফোনটা পাল্টাও। ওটার অ্যান্টিক ভ্যালু থাকতে পারে, ভারী কয়েকটা পেপারওয়েটের কাজ করতে পারে—কিন্তু টেলিফোন হিসেবে নেহাতই অচল।

কোন রকম দ্বন্দ্বে না গিয়ে সোহিনী উত্তর দিত,—স্যার আপনি ঠিকই বলেছেন। আগেকার কালো টেলিফোন রিসিভার মিউজিয়ামেই পাঠানো উচিত। লেকিন স্যার আদমিকা গ্র্যান্ড গ্র্যান্ড মাদার। এরাও তো পুরনো দিনের মানুষ। আমরা কি তাদের ফেলে দিতে পারি? নাকি অচল সমঝ্কর বাতিল করতে পারি?

হাত তুলে গোলাপ বলতো,—ঠিক আছে বাবা, তুমি কী বলবে বুঝতে পেরেছি। তুমি ঐ মোটা কালো হেঁড়ে গলার ফোন নিয়েই বসে থাক।

গোলাপ আর এই নিয়ে বিশেষ বাড়াবাড়ি করতো না। টেলিফোনটা গাঁক-গাঁক শব্দে বেজে উঠতেই গোলাপের কথা ওর মনে পড়ে গেল। খুব খারাপ লাগছে সোহিনীর। অমন সুন্দর একটা মানুষ, দরাজ হৃদয়ের প্রাণবন্ত মানুষটাকে আজ হোক কাল হোক খুনি হিসেবে আসামীর কাঠগড়ায় তুলতে হবে। প্রথম সন্দেহটা সেই করেছিল। সন্দেহের সূত্র ধরে এগিয়ে সে প্রায় সমাধানের কাছে পৌঁছে গেছে। একটা টোপ। একটাই সুযোগ। স্বপ্নাদি যদি তার অভিনয়ে কোন ভুল না করে তাহলে গোলাপসুন্দর বসু ধরা পড়বেই। একটি নিরীহ মেয়েকে খুন করার পূর্ব মুহূর্তে অ্যারেস্ট করতে হবে। আইনের কাছে বাবা মা ভাই বোন বস্ সুপার

বস্ কেউই ছাড় পেতে পারে না। সে হেল্পলেস।

আবার ফোন বাজল। বাঁ হাত দিয়ে তুলে বহু ব্যবহৃত শব্দটি উচ্চারণ করল,—হ্যালো, ইন্সপেক্টর সোহিনী সিং ইজ স্পিকিং। ওপাশ থেকে শব্দ ভেসে এল,—নমস্কার, আমি নয়নতারার বাবা চন্দ্রমাধব ব্যানার্জি বলছি।

—হ্যাঁ বলুন।

—আমার মেয়ে নয়নতারাকে এইমাত্র মৃত অবস্থায় আবিষ্কার করেছে আমারই কাজের মেয়ে সাবিনা।

—হোয়াট? প্রায় চিৎকার করে উঠল সোহিনী। সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাত ঘড়িটা দেখল। সলিলকির মতো মুখ থেকে বেরিয়ে এল একটা শব্দ,—স্ট্রেঞ্জ!

—কী বলছেন ইন্সপেক্টর সিং? হোয়াই স্ট্রেঞ্জ?

—নো, নাথিং। আমরা এখনই আসছি।

—মিস্টার বসু কি ওখানে আছেন?

—বসু, ইউ মিন গোলাপসুন্দর বসু?

—হ্যাঁ। আমার জামাই।

—স্যরি স্যার। হি ইজ নাউ অন লিভ। প্রায় দেড়মাস মতো সাহেব ছুটিতে আছেন।

—দেড় মাস? অন লিভ? কিন্তু সে কথা তো, এনিওয়ে আপনি তাড়াতাড়ি আসুন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে গেল সোহিনী বাহিনী। সুবীর, কনস্টেবল রামানন্দ, ফোটোগ্রাফার বীরেশ হালদার আর দু একজন ষণ্ডা কনস্টেবল। যাবার আগে দুজনকে দুটো ফোন করল, ডিসিডিডি পলাশ গুপ্ত। আর ডাক্তার অম্লান দত্তগুপ্তকে। ইনস্ট্রাকশান দিল স্বপ্নাদির ওপর যেন স্পেশ্যাল নজর রাখা হয়।

আধঘণ্টার মধ্যেই সোহিনী পৌঁছে গেল। ওরা ভ্যান থেকে নামতেই একটি চাকর শ্রেণীর লোক এগিয়ে এসে বলল,—সাহেব ওপরে আছেন। ইন্সপেক্টর দিদিকে ওপরে নিয়ে যেতে বলেছে।

সোহিনী ভেবেছিল প্রতিবারের মতো এবারও সেই একই দৃশ্য দেখবে। দেখবে একই ধরনের হত্যা পদ্ধতি। কিন্তু ঘর এবং মৃতদেহ দেখে তার মুখ থেকে আবার বেরুল সেই শব্দটি,—স্ট্রেঞ্জ!

মাথায় হাত চেপে বসেছিলেন চন্দ্রমাধব ব্যানার্জি। স্ট্রেঞ্জ শব্দটা শুনে মুখ তুলে তাকালেন। বোঝাই যাচ্ছে ভদ্রলোক কাঁদছিলেন। চোখদুটো করমচার মতো লাল। কান্নার বেগ চেপে ভীরু গলায় উনি জিগ্যেস করলেন,—কি 'স্ট্রেঞ্জ' ব্যাপার দেখলেন মিস সিং?

প্রশ্ন এড়ালো সোহিনী। শুধু বলল,—আমি একবার ঘরটা ভালো করে ওয়াচ করবো। ইট্স্ মাই ডিউটি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করবেন।

আগের চারটে মার্ডারের সঙ্গে নয়নতারা হত্যার কোন মিল নেই। সে সোফার ওপর বসে আছে। সোফার হাত রাখার জায়গা ছাড়িয়ে দুপাশে দুটো হাত ঝুলছে। ঘাড়টা লট্‌কে পড়েছে। চুলগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখটাকে আড়াল করে রেখেছে। বীরেশ ইতিমধ্যে বেশ কিছু ছবি নিয়ে নিয়েছে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে। মৃতদেহটিকে নানান দৃষ্টিকোণ থেকে সোহিনী আর সুবীর লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ সোহিনীর মনে হল মৃতার পা দুটো বড় বেশি স্টিফ্। সুবীরের

দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে বলল,—পাটা দেখেছ সুবীর?

—হ্যাঁ দেখেছি। মনে হচ্ছে পা দিয়ে কিছু ঠেলতে চেয়েছিলেন।

—হ্যাঁ, জরুর। বাট—

—আমি জানি সোহিনী তুমি খুব ডিজহার্টেন হয়েছ। ভেবেছিলে সতী, নন্দিতা আর রুবির রিপিটেশান হবে। অর্থাৎ তুমি ধরেই নিয়েছিলে এ খুনটাও একই লোকের।

সোহিনী কিছু না বলে তার দৃষ্টি চারদিকে ঘোরাতে থাকে। নাইলন গ্লাভসটা হাতে পরে নিয়ে ও নয়নতারার মুখের ওপরে ঝাপিয়ে পড়া চুল সরিয়ে মুখটা ভালো করে দেখতে গিয়েই বুঝতে পারল মৃত্যুটা কেমন ভাবে ঘটেছে। ঠোঁটের কোণে জমাট রক্ত। জিভটা একপাশে বেরিয়ে রয়েছে। এলানো অবস্থায়।

—সুবীর, দিস ইজ সিম্পলি আ মার্ডার কেস। বাই স্ট্যাঙ্গুলেশান। গলা টিপে। বাই দি বাই—

চকিতে ওর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল নগ্ন ঘাড়ে। নয়নতারার গায়ের রঙ ঘি দিয়ে মাখা ময়দার মতো। এবং সেখানে স্পষ্ট দড়ির চাপ দাগ। এখনও লাল হয়ে আছে। অর্থাৎ খুব বেশিক্ষণ মার্ডার করা হয়নি।

—সুবীর, তুমি তো এখনো গ্লাভস পরোনি। একদফে দেখতো নয়নতারাজির বডি এখনও গরম আছে কিনা?

সুবীর গায়ে টাচ করতে যাচ্ছিল। এমন সময় পিছন থেকে ভরাট গম্ভীর পুরুষ গলায় ওরা ফিরে তাকালো।

বেঁটেখাটো মোটাসোটা এক সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়েছেন। বয়েস প্রায় নয়নতারার বাবার মতোই। সুবীরই এগিয়ে গেল,—আপনি? মানে—

এক একজনের উচ্চারণ খুব স্পষ্ট আর তীক্ষ্ণ হয়। ভদ্রলোক বললেন, —আমার নাম রণতোষ মজুমদার। এদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান।

—ভেরি গুড। আপনি কি এখনই আসছেন?

—হ্যাঁ, একটু আগে ব্যানার্জি আমায় ফোন করেছিল। ওর মেয়ে নাকি,

—নাকি? সোহিনী বলে, হোয়াই নাকি? ইজ দেয়ার এনি ডাউট?

—ওহ শিওর, ডাক্তার মজুমদার বললেন, পরীক্ষা না করে কী ভাবে বলব নয়নতারা ইজ ডেড। আমাকে দেখতে দিন।

কয়েকটা বিশেষ বিশেষ জায়গা পরীক্ষা করার পর ডাক্তার বললেন,—শী ইজ নো মোর। অ্যান্ড শী ইজ মার্ডারড্।

—হাউ ডু ইউ কাম টু নো?

—মার্ডার উইপনটা সম্ভবত আপনাদের চোখে পড়েনি।

—হোয়াট?

সোহিনী রীতিমত হতচকিত হয়ে এগিয়ে যায়,—মার্ডার উইপন? আমরা এখনও দেখতে পাইনি? হোয়্যার? হোয়্যার ইজ দ্যাট?

ডাক্তার মজুমদার কোচের ওপর বসে থাকা নয়নতারার পিছন হতে টেনে বার করেন সবুজ কালো একখানা জামাকাপড় মেলার দুপাশে হুক বা আংটা লাগানো একটা দড়ি। তারপর ইন্সপেক্টর সোহিনীর সামনে দোলাতে দোলাতে বলেন,—ছেলে ডিটেকটিভদের চোখে

এতক্ষণে এটা ধরা পড়ে যেত। মেয়েরা এখনও অবলা। তাদের যে কেন নগররক্ষীর বা নগরপালকের ভূমিকায় অ্যাক্টো করতে বলা হয় বুঝি না। কিছু মনে করবেন না ম্যাডাম, কয়েকটা জরুরী সংবাদ আপনাকে দিয়ে যাই। আপনার ইনভেস্টিগেশনে কাজে লাগবে। নয়নতারা আমার বন্ধুর মেয়ে। ছমাস আগে পুলিসের এক ভারি পোস্টের অফিসারের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়। বিয়ের পরই ছাড়াছাড়ি। এখন থেকে, বলেই নিজের কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখে বললেন,—এখন বাজে বিকেল চারটে। অর্থাৎ তিন থেকে সাড়ে তিনঘণ্টা আগে নয়নমাকে খুন করা হয়েছে। ব্রুট্যালি মার্ডারড্। টাইমটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি বললাম।

—দেন ইউ আর সিওর, তিন চারঘণ্টা পহেলে ইনকো মার্ডার কিয়া গিয়া?

—বললাম না, অ্যাপ্রক্সিমেট্লি।

—অ্যান্ড বাই স্ট্র্যাঙ্গুলেশন?

—ইয়েস। উইথ দ্যাট কর্ড।

—থ্যাঙ্কস্ ডাক্তারসাহেব। ইজ দেয়ার এনিথিং মোর টু সে?

—রেস্ট উইল বি ইনফরম্ড্ বাই ফোরেনসিক অ্যান্ড পোস্ট মর্টেম। ডাক্তার মজুমদার আর দাঁড়ালেন না। যাবার সময় চন্দ্রমাধবের কাঁধে সান্ত্বনার হাত ছুঁইয়ে জিগ্যেস করলেন,—মিসেস্ কোথায় এখন? তোমার বাবাকে দেখছি না?

—বাবাকে নিয়ে আমার শালীর বাড়ি গেছে। চন্দননগর।

—একটা খবর দাও। যতই হোক নয়ন তোমাদের একমাত্র মেয়ে। আর জামাইকেও। চন্দ্রমাধব কেবলমাত্র মাথা নাড়লেন।

আরো পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে বডি মর্গে পাঠানো হয়ে গেল। একমাত্র সুবীর ছাড়া আর সবাই ফিরে গেল থানায়। ইতিমধ্যে ডাক্তার অম্লান দত্তগুপ্ত এসে গিয়েছিল। দেখা গেল অম্লান এ বাড়ির পরিচিত।

শোকার্ত চন্দ্রমাধববাবুকে কয়েকজন ধরাধরি করে নিয়ে গেল ওনার স্টাডি রুমে। রুমটি আইনি বইয়ে ঠাসা। সোফায় বসতে বসতে চন্দ্রমাধব বললেন,—আইনি লোকের ঘরে চরম বেআইনি ঘটনা ঘটে গেল।

ওকে সান্ত্বনা দেবার কোন ভাষা কারোরই ছিল না। তবু কিছুটা সময় কাটিয়ে অম্লান বলল, মেসোমশাই, আপনি তো জানেন,

অম্লানকে থামিয়ে চন্দ্রমাধব বললেন,—জানি। বল তোমাদের কী প্রশ্ন?

প্রশ্ন শুরু করল সোহিনী।

—স্যার, আপনি সিওর বুঝতে পারছেন কি আপনার ডটারকা ডেথ কোই ন্যাচারাল ফেনোমেনান নেহি। শী ওয়াজ কিল্ড্।

চন্দ্রমাধব চুপ করে থেকে বোঝান এটা তাঁর জানা তথ্য। কেবল ঘাড় নাড়িয়ে অন্য প্রশ্ন করতে বলেন।

—সো, মুঝে কুছ ইনফরমেশান চাইয়ে।

—বলুন।

—অ্যাকর্ডিং টু ডাক্তার মজুমদার'স অ্যাজামশন, নয়নতারাজির মৃত্যু হয়েছে করীব একসে দেড় কা অন্দর। খুব ভালো করে ভেবে বলবেন কি সেই সময় উনার কাছে কে ছিল?

—আমার জামাই গোলাপসুন্দর বসু আজ এসেছিল নয়নতারার সঙ্গে দেখা করার জন্যে।

অনেক দিন পরে।

—আপনি তাকে এলাউ করলেন?

—হোয়াই নট? হি ইজ মাই সান-ইন-ল।

—বাট, বেনার্জি সাহেব, আপনি তো বিলকুল জানেন, দুজনের মধ্যে তেমন কোন রিলেশানই ছিল না।

—নো। আই ডোন্ট বিলিভ ইট। আমার মেয়ের সঙ্গে জামাইয়ের কোন ঝগড়া হয়নি। হলে নয়নতারা আমাকে জানাতো।

—কিন্তু একটা কথা খুব সাচ্। নয়নতারাজি মানালি থেকে একা ফিরে এসেছিল। হাজব্যান্ডকে কিছু না জানিয়ে। এটাকে কি আপনি খুব স্বাভাবিক ইনসিডেন্ট বলবেন?

চন্দ্রমাধব কিছু না বলে মাথা নিচু করেন।

—ওয়েল, কিত্না দিন বাদ, আই মিন, মিস্টার বসু কতদিন পর আপনার এ বাড়িতে এলেন?

—সাত আট মাস তো হবেই।

—আপ কুছ পুছা নেহি?

—কী?

—এতোদিন উনি কেন আসেননি?

—নো, আই ডিড্‌ন্ট্ আস্‌ক্ দেম এনিথিং। নয়নতারা ওয়াজ ইনটেলিজেন্ট ইনাফ। আর আমি চাইওনি ওদের ইনটারন্যাল ব্যাপারে মাথা গলাতে। অবশ্য ওরা যদি নিজেরা এসে বলতো, অলরাইট। বাট,

সুবীর অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার ও বলল,—কিছু মনে করবেন না স্যার, আপনি একজন প্রবীণ আইনজ্ঞ। আপনার কাছে আমরা মূল্যবান কিছু পয়েন্টস্ চাইছি।

—প্রশ্নটা কী?

—গোলাপসুন্দরবাবু ঠিক কটায় এসেছিলেন?

—প্রায় বারোটা নাগাদ।

—আপনি আশ্চর্য হননি?

—না। একটা কথা বুঝেছিলাম কোন কারণে ওদের মধ্যে মনোমালিন্য হয়েছিল। সেটা মিটতে চলেছে।

—কতক্ষণ ছিলেন?

—সেটা বলতে পারব না।

—নয়নতারা দেবীর ডেডবডি কে প্রথম দেখেছিলেন?

—আমার কাজের মেয়ে সাবিনা।

—তাকে একবার ডাকা যাবে?

—হ্যাঁ। কেন নয়?

সাবিনাকে ডেকে পাঠানো হোল। বছর চব্বিশ-পঁচিশের কাছাকাছি বয়েস। বেশ ভয় ভয় মুখে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়াল। সুবীরই প্রশ্ন চালিয়ে গেল,—তুমি এ বাড়িতে কতদিন আছ সাবিনা?

—আজ্ঞে, ছ-সাত বছর তো হবে।

—তার মানে তোমার দিদিমণির বিয়ের সময়ে তুমি এ বাড়িতেই ছিলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু।

—দাদাবাবু মানে—,

—দিদিমণির বর তো?

—হ্যাঁ, আগে দেখেছ তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বিয়ের আগেও কতবার এসেছেন।

—বিয়ের পর আর আসেননি, তাই না?

—হ্যাঁ বাবু। বিয়ের পর ওনারা বাইরে বেড়াতে গেলেন। তারপর আর ফিরলেন না।

—দিদিমণি কবে এ বাড়িতে এলেন?

—এই তো কদিন হোল। অ্যাদ্দিন ওর বন্ধুর বাড়ি ছিলেন। আর দাদাবাবু এলেন আজ দুপুরে।

—তোমার কিছু মনে হয়নি?

—কী মনে হবে বাবু?

—অ্যাদ্দিন পরে এলেন? ছিলেন কোথায়?

—এসব মনিবদের ব্যাপার। আমাদের নাক গলাবার কী আছে বলুন?

—আজ কোন ঝগড়াঝাটি হয়েছিল? তোমার দিদিমণি আর দাদাবাবুর মধ্যে?

—কই, তা তো শুনিনি।

—দাদাবাবু কতক্ষণ ছিলেন?

—বলতে পারব না বাবু। ওনার তো এখানে খাবার কথা ছিল। তো আমি ডাকতে গিয়ে দেখি, সাবিনা হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। সুবীর ওকে কিছুটা সময় দিতে চাইল। সোহিনী এতোক্ষণ ঘরের এটা সেটা নেড়ে চেড়ে দেখছিল। মাঝে একবার ও বেরিয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত যে ঘরে মার্ডারটা হয়েছে সেটাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। যখন ও ঘরে ফিরল হাতে একটা সিগারেটের প্যাকেট।

—সুবীর, পুছতাছ কমপ্লিট?

—আর কয়েকটা প্রশ্ন করব, হ্যাঁ সাবিনা, তুমি ঘরে গিয়ে কী দেখলে?

—দেখলুম দাদাবাবু নেই। ঘর ফাঁকা। শুধু দিদিমণি সোফায় মাথা নিচু করে বসে আছে।

—তোমার কিছু মনে হয়নি?

—কী মনে হবে বাবু? জলজ্যান্ত মানুষটা বসে আছে, এতে মনে হবার কী আছে?

—তা তো বটেই, তারপর কী করলে?

—দিদিমণিকে ডাকলুম। কোন সাড়া পেলুম না। তারপর কী মনে হতে কাছে গিয়ে দেখি

—কী?

—দিদিমণি মাথা হেঁট করে বসে রয়েছে। হাত দুটো দুপাশে ছড়ানো। কেমন যেন বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। আরও ভালো করে দেখতে গিয়ে দেখি, কোলের ওপর দু চারফোঁটা রক্ত। হাল্কারঙের কাপড় পরেছিলেন তো তাই রক্তটা বোঝা গেছিল।

—তুমি তারপর কী করলে?

—চিৎকার করে বাবুকে ডাকলুম। তিনি এসে অনেক ডাকাডাকি করলেন, দাদাবাবুর খোঁজ করলেন। তারে পাওয়া গেল না। তখন বাবু ডাক্তারকে খবর দিলেন। ডাক্তার আসার

আগেই আপনারা এলেন।

আবার কান্না। কাঁদতে কাঁদতেই বলল,—দিদিমণি আর নেই একথা ভাবতে পারছি না বাবু। এমন করে কে মারল? কেন মারলো বাবু?

সে কথার জবাব না দিয়ে সুবীর বলল,—এ বাড়িতে আর কে কে থাকে?

—বাবু, বাবুর বাবা, মা, আমি আর আমার বর। বঙ্কার মা আছে। সেই সব রান্নাবান্না করে।

—তোমার বর কোথায়?

—আজ্ঞে মা তো মাসির বাড়ি গেছেন। দাদুকে নিয়ে। চন্দননগরে। আমার বর তাদের নিয়ে গেছে।

—আর তোমাদের রান্নার মেয়েটি?

—মেয়ে কোথায় বাবু? সে তো বুড়ি?

সুবীর সোহিনীর দিকে তাকালো। সোহিনী ইশারায় সাবিনাকে ছেড়ে দিতে বলল। সাবিনা চলে যেতেই সোহিনী বলল,—অম্লান,

—বল।

—এতোক্ষণ তো তুমি সওয়াল জবাব শুনলে? তোমার কী মালুম হচ্ছে নয়নতারাজিকো কোন বাইরের লোক খুন করে গেছে?

—বাড়িতে যারা আছে, অর্থাৎ আঙ্কল, আর সাবিনা, কিম্বা ঐ বঙ্কার মা, সেও তো বুড়ি মানুষ, এ মার্ডার তাদের কারো নয়। যে নয়নতারাকে খুন করেছে তার শরীরে কিছু তাকত্ দরকার। গলায় ফাঁস দিয়ে মারতে গেলেও যে শক্তি দরকার সেটা এই বয়েসে আঙ্কেলের পক্ষে সম্ভব না। ওনার প্রায় বাষট্টির কাছে বয়েস। ডায়াবেটিস পেশেন্ট। হেভি প্রেসার। হার্টেরও ট্রাবল আছে। বঙ্কার মাকে আমি দেখেছি। রোগা ডিগডিগে বুড়ি। প্রায় ষাটের কাছে বয়েস। পেট চালানোর জন্যে রান্নার কাজ করে। কারণ বঙ্কা রোড অ্যাকসিডেন্টে মারা যায় বছর চারেক আগে। অতএব সেও মারবে না। দাদু মানে আঙ্কেলের বাবা। ইমপসিবল্, নয়নতারার মা বাতের রোগী। তাঁর দুটো হাড়ের আঙুলে কোন জোর নেই। এবং সেগুলো এলোমেলোভাবে বেঁকে গেছে। অতএব তাঁর পক্ষে এই মার্ডার সম্ভব নয়। তাছাড়া তিনিও এখন এখানে নেই। বাকি রইল দুজন। সাবিনা আর তার বর। শারীরিক শক্তির দিক থেকে সাবিনা নয়নতারাকে পিছন দিক থেকে গলায় ফাঁস দিতে পারে। এবং সে জোর তার আছে। তার বর, আমি এর আগের দিনে এসে তাকে দেখেছি। বছর ত্রিশের মতো বয়েস। বেশ হেলদি। সে পারে। খুঁজলে তার মোটিভ থাকলেও থাকতে পারে।

বাধা দেয় সোহিনী,—হ্যাঁ, মোটিভটাই বল।

—আমি প্রোব্যাবিলিটির কথা বলছি। ধরা যাক সুন্দরী নয়নতারার একাকিত্বের সুযোগ সে নিতে চেয়েছিল। হয়তো তার নয়নতারার প্রতি আসক্তি ছিল। নয়নতারা হয়তো তাকে থ্রেট করেছে। সবাইকে জানিয়ে দেবার ভয় দেখিয়েছে। এনিথিং হতে পারে। সেই আক্রোশে সে একাজ করতে পারে।

—কিন্তু, সুবীর বলে, তার অ্যালিবি সে এখানে নেই। আবার সেই অ্যালিবি সামনে রেখে সেও খুন করে যেতে পারে। কিন্তু সেটা কখন? গোলাপদা এ বাড়িতে এসেছিলেন, নিয়ার অ্যাবাউট টুয়েলভ টু টয়েলভ থার্টি। তার আগে নিশ্চয়ই নয়নতার খুন হয়নি। কারণ সাবিনা ওদের দুজনকে কথা বলেত শুনেছে। তার মানে যদি সাবিনার বরকে সন্দেহ করতে হয় তাহলে

তাকে আসতে হবে। গোলাপদার চলে যাবার পর। কিন্তু গোলাপদা কখন গেছে সেটা কেউ বলতে পারছে না। তবু চন্দননগরে একবাব খোঁজ নিলেই জানা যাবে সাবিনার বর আজ সকাল থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত কোথায় ছিল।

হঠাৎ সোহিনী সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে ধরে বলে,—সুবীর, তোমার কি মনে আছে আমাদের বস্ কোন ব্র্যান্ডের সিগারেট খেতেন?

—হ্যাঁ, ঐ সিগারেটই। যেটা তোমার হাতে রয়েছে। তা এটা তো থাকতেই পারে।

—বিলকুল পারে। বস্ তো সিগারেটটা একটু বেশিই খেতেন। লেকিন তোমার কি মনে পড়ে সুবীর, এর আগে যারা খুন হয়েছিল তাদের কারো ঘর থেকেই কোন পোড়া সিগারেটের টুকরো আমরা পাইনি।

—তা দিয়ে কি প্রমাণ হোল?

—কুছ নেহি। আমি কেবল ভাবছি, হোয়াট মিস্টার গোলাপসুন্দর বাসু ওয়ান্টেড টু ডু? একজন হ্যাবিচুয়াল স্মোকার, আগের তিন জায়গায় একটাও সিগারেট খেলো না—অথচ এখানে? এটা কি কোই নয়া চাল?

সুবীর বা অম্লান কেউই সোহিনীর কথার খেই খুঁজে পেলো না। তবু সুবীর জিগ্যেস করল,—তুমি কি ডেফিনিট, নয়নতারাকে খুন করেছে গোলাপসুন্দর বসু?

—যদি বলি হ্যাঁ, কন্ট্রাডিক্ট করো। আমাকে মিথ্যা প্রমাণিত করো।

—মাইন্ড ইট সোহিনী, সুবীর বলে, গোলাপদার মার্ডার করার সময় বা অভ্যেস বিশেষ একটা সময়ে। আর সে সময়টা গভীর রাতে। কোন একটা বিশেষ রিপুর কাছে পরাজিত গোলাপদার অবচেতন মার্ডার। গোলাপদা ইজ আ পেশেন্ট রাদার দ্যান আ মার্ডারার। কি অম্লানবাবু, অ্যাম আই রং?

—নো, নট অ্যাট অল। ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট। তবে এর অর্থ এই নয় যে আমরা জেনে শুনে, দো হি ইজ আর পেশেন্ট, অ্যাট দ্য সেম টাইম আ মার্ডারার, তাকে সমাজের বুকে ছেড়ে রাখব। আরো পাঁচটা মেয়ের জীবন বিপন্ন হতে পারে। তোমরা কেউ ভাবতে পেরেছিলে নয়নতারা মার্ডার হবে?

—ইয়েস, আই থট্ সো, সোহিনী বলে, আমার মনে হয়েছিল দুজন মহিলার লাইফ ইজ অ্যাট স্টেক। একজন মিসেস নয়নতারা বাসু। আর একজন স্বপ্নাদি। আমার ধারণায় এই মার্ডারটা গোলাপাজি ঠাণ্ডামাথায় করেছেন।

—তার মানে তুমি বলতে চাইছ যে এটা ডেলিবারেট মার্ডার?

—ইয়েস। আউর মোটিভটাও ক্লিয়ার।

—মোটিভটা কি?

—অপমানের বদলা নেওয়া। নয়নতারাজির হনিমুন থেকে পালিয়ে আসাটা গোলাপদার কাছে খুব শকিং ব্যাপার। খুবই অপমানজনক। কোন পুরুষমানুষই এটা মেনে নেবে না।

—হ্যাঁ সোহিনী, অম্লান বলে, এ কথাটা নয়নতারাকে আমিও বলেছিলাম। গোলাপের মিসটেরিয়াস ব্যবহারটা পরদিন সকালেই ওকে জানানো উচিত ছিল। দুরাত সময়ও পেয়েছিল। ইচ্ছে করলেই ও কোন সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখাতে পারতো।

—সেটাই নয়নতারাজির ভুল। তিনি কেবল নিজের লাইফ বাঁচাতে সরে ছিলেন। বাট সেটাই পারলেন না। ট্র্যাজেডি।

মিনিট দু'তিন কেউই কোন কথা বলছিল না। হঠাৎ ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই সজাগ হোল সোহিনী। কখন যেন সন্ধে নেমে গেছে। যদিও এখন শরৎকাল। কিন্তু আকাশ মেঘলা থাকায় সন্ধ্যেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। শোকের বাড়ি হলেও সাবিনা তিনকাপ চা করে দিয়ে গেল। শুধুই চা। অবশ্য অন্য কিছুর কথা ভাবাই উচিত নয়।

—সাবিনা। তোমার বড়বাবু কী করছেন?

—চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন।

—বাবুর দিকে একটু নজর রেখো। আমরা এখন যাব।

—ঠিক আছে। চাটা খেয়ে যাবেন।

চলে যাচ্ছিল। আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল,—দিদিমণিকে কে খুন করেছে বাবু, সেটি তো বললেন না?

সুবীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবলো,—এই মেয়েটার একটা মোটিভই হতে পারতো, তবে সেটা বড়ই কষ্টকল্পনা। একে সন্দেহ থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে।

ঠিক তখনই সুরেলা সুরে সোহিনীর মোবাইলটা বেজে উঠল। নব টিপেও কার নম্বর ধরতে পারল না, বলল, ইয়েস, সোহিনী সিং স্পিকিং। হু ইজ ফ্রম দ্য আদার সাইড?

তারপর খানিকক্ষণ নীরবতা এবং সোহিনীর তীক্ষ্ণ চিৎকার,—হো...য়া...ট। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কারেজ, প্লিজ স্ট্যে দেয়ার। বলেই সুবীর আর অম্লানের দিকে তাকিয়ে বলল, আ ফোন ফ্রম গোলাপসুন্দর বসু। জাস্ট ইমাজিন হি ইজ নাউ উইথ স্বপ্নাদি।

—কী বলছো তুমি? চিৎকার করে ওঠে অম্লান।

—হ্যাঁ, বিলকুল সহি। আর গোলাপসুন্দরজি চ্যালেঞ্জ ভি থ্রো কিয়া। স্বপ্নাদি অ্যান্ড গোলাপসুন্দব একই বেড়ে। দে আব এনজয়ইং দেমসেল্‌ভ্‌স্।

—ওহ্ মাই গড, বলে সুবীর আর অম্লান লাফিয়ে উঠল। তিনজনের হাতে আর নষ্ট করার কোন সময়ই ছিল না। এখন একটি সেকেন্ড মানেই....।

পুলিসের গাড়ি হলেও, হুটারের তীব্র শব্দ বাজলেও, কলকাতার ব্যস্ত নাগরিক জীবন এই সব আওয়াজে এতোই অভ্যস্ত যে তাদের ঐ আওয়াজকে সম্মান জানাতেও নড়াচড়ায় গড়িমসি থেকেই যায়। ফলে আধঘন্টার রাস্তা পৌঁছতে লাগল আরও পনেরো মিনিট বেশি।

জীপটা চালাচ্ছিল সোহিনী নিজেই। থামার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথমে নেমে পড়ল অম্লান। ছুটে গিয়ে দরজায় বেল টিপল। একবার দুবার তিনবার। নাহ্ কোন সাড়া নেই। চিরাচরিত ভঙ্গিমায় স্বপ্নাদি নিজে এসে দরজা খুলে দিল না। আরো দুবার বেল টিপল। এবারও পূর্ববৎ।

—কী করবেন অম্লানবাবু, বাড়িতে আর কেউ নেই? সুবীর জিজ্ঞাসা করে।

—মা আছেন। তিনতলায়। ওঁর পক্ষে তো নিচে নামা সম্ভব নয়। তবে স্বপ্নাদি শেষ পর্যন্ত—

—ইজ দেয়ার এনি আদার ওয়ে টু গেট ইনসাইড?

—ওহ্ স্যরি, একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম, বলেই অম্লান অ্যাটাচি খুলে একগোছা চাবি বার করে একটা ঢোকাতেই দরজা খুলে গেল।

তিনতলায় স্বপ্নাদির শোবাব ঘর। তিনতলায় ওদের পৌঁছতে সময় লাগল পাক্কা আড়াই মিনিট।

স্বপ্নাদির ঘরের দবজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। বেশ জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দিল অম্লান। স্বপ্নাদির নাম ধরে বেশ কয়েকবার ডাকার পরও যখন খুলল না তখন দরজা ভাঙার কথা চিন্তা করতে হোল। পাশের ঘরে মা তখন চিৎকার শুরু করেছেন, খোকা, খোকা এলি?

—হ্যাঁ মা। স্বপ্নাদির ঘর খুলছে না কেন?

—সেকি? কেন? ঘর খুলবে না কেন? দ্যাখ হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে।

—সন্ধেবেলা কেউ এসেছিল এ বাড়িতে?

—হ্যাঁ, ওই গোলাপ এসেছিল। এই তো একটু আগে চলে গেল।

—তোমার এখানে এসেছিল?

—হ্যাঁ। কত কথা বলল। বলল আর নাকি আমাদের বাড়ি তার আসা হবে না।

—কেন কিছু বলেনি?

—তেমন কিছু না, কেবল বলল, ও নাকি অনেক দূরে কোথায় চলে যাবে।

—কোথায়?

—তেমন করে কিছু বলল না। হয়তো স্বপ্নাকে বলে গেছে।

—কিন্তু, সুবীর বলল, শাবল টাবল কিছু আছে? যা দরজা করেছেন তিনজনে ধাক্কা মারলেও হিন্দী ছবির মতো দরজা ভেঙে পড়বে না।

শাবল একটা ছিল। নিচে গ্যারাজ ঘরে। তাড়াতাড়ি সেটাই আনা হোল। এবং কিছু জোর প্রচেষ্টার পর দরজার খিল ভেঙে পড়ল।

বিছানার ওপর লম্বালম্বি শুয়ে আছে স্বপ্নাদি। নাহ্ কোথাও কোন এলোমেলো এবং বিসদৃশ কিছু চোখে পড়ল না। অম্লানই এগিয়ে গিয়ে পাল্‌স্ তুলে ধরল। তারপর আস্তে আস্তে হাতটা নামিয়ে রেখে কপালে হাত দিল।

—কি হোল ডাক্তার, সুবীর তাগাদা লাগায়।

—শী ইজ নট ডেড্। শী ইজ অ্যালাইভ। বাট, অ্যাট প্রেজেন্ট সেন্সলেন্স। তারপর নাকের কাছে নাকটা নামিয়ে নিয়ে কিছু শুঁকল। ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল,—অজ্ঞান করা হয়েছে। ক্লোরোফর্মের গন্ধ।

সুবীর বলল,—এতো ফাইন সুযোগ পেয়েও, নাহ্ গোলাপদা তাহলে হ্যাবিচুয়াল মার্ডারার নয়।

চোখ পাকিয়ে সোহিনী তাকালো ওর দিকে। তার পর মুখ ঘুরিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে স্বপ্নাদির পরিধেয় বসনের দিকে তাকাল। নাহ্, কোথাও, কোন ঝড় ঝাপ্‌টার চিহ্ন নেই।

—তার অর্থ—

—নো, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু নো এনি মিনিং ফ্রম ইউ, বোঝাই যাচ্ছে সোহিনী ঈষৎ ক্ষুব্ধ।

—হ্যাভ ইউ গট এনি স্মেলিং সল্ট?

—লাভ নেই। শুধু শুধু ওর শরীরটাকে ব্যতিব্যস্ত করা।

ইতিমধ্যে প্রেসারটাও চেক করে নিয়েছে অম্লান, তাই বলল,—আপাততঃ বলা যায় স্বপ্নাদি সুস্থ। কিছুক্ষণ পর ঘোর কেটে যাবে। দরকার হবে না আর্টিফিসিয়ালি জ্ঞান ফেরানোর।

যে কাজটা সাধারণত সোহিনী করে, সেটা সুবীর করতে শুরু করেছিল। ওর একটাই সান্ত্বনা ছিল, অন্তত এই একটা মার্ডার থেকে, হাজার সুযোগ পেয়েও গোলাপদা নিজেকে বাঁচাতে পেরেছে। এর অর্থ একটাই। গোলাপদা নিজেকে ফিরে পাচ্ছে। এদিক ওদিকে সুবীর খুঁজছিল কিছু। ঠিক কি ও খুঁজছে সেটা ও নিজেই জানে না। এবং জিনিসটা খুঁজে পাবার পরই ও বুঝতে পারল এতোক্ষণ এই জিনিসটাই খুঁজছিল।

একটা চিঠি। পৃথিবীতে সব থেকে বেশি প্রচলিত বই, বাইবেল, সেই বইয়ের মধ্যেই ছিল। চিঠির খামে লেখা ছিল গোলাপের শেষ চিঠি।

কাঁপা কাঁপা হাতে চিঠিটা ও খুললে দেখল। অম্লান আর সোহিনী, দুজনেই সেটা দেখেছিল। ওরা এগিয়ে এল। চিঠিটা খুলল। বাংলায় লেখা। সোহিনী আর অম্লান দুজনে দুটো সোফায় বসতে বসতে বলল,—সুবীববাবু, চিঠিটা পড়ুন। গোলাপের চিঠি। ও যেখানেই থাক, আমি ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের লোক না হয়েও বলতে পারি, অন্তত আজ রাতে ও আর কাউকে খুন করবে না। করলে স্বপ্নাদিকে ছাড়তো না। আপনি চিঠিটা পড়ুন।

সুবীর ধীরে ধীরে চিঠিটা পড়া শুরু করল,

প্রিয় সুবীর, আমি জানি, আর কারো না হোক তোমার একটু দরদ আছে আমার ওপর। যেটা রিসেন্টলি হারিয়ে ফেলেছে আমার একদার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী মিস সোহিনী সিং। নাহ্, এটা ওর দোষ নয়। ও যখন আমাকে দোষী সন্দেহ করতে শুরু করেছে তখন কেনই বা আমার প্রতি ওর সহানুভূতি থাকবে। বিয়িং আ পুলিস অফিসার। ওর কাছে ন্যায় এবং আইন সবার থেকে বড়।

হ্যাঁ সোহিনী, তোমার ধারণাই ঠিক। ঘড়ির কাচ ভেঙেছিল সতীর খাটের বাজুতে ধাক্কা লেগে। তারপর তার মুঠোর চাপে। সেই কাচের কিছু অংশ ওর হাতের মুঠোয় থেকে গিয়েছিল। অবশ্য তখন আমি স্বজ্ঞানে ছিলাম না। যে সতীকে মার্ডার করেছে সে একজন স্যাডিস্ট। সি আই ডি অফিসার গোলাপসুন্দর নয়।

আমার এই রোগটা আজকের নয়। অনেক দিনের। কোন মেয়ে আমায় অপমান করলে বা আন্ডার এস্টিমেট করলে বা অবজ্ঞা করলে আমার ভেতরে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। আর তার পর আমার অ্যামনেসিয়া স্টেজে চলে আসতে হয়। টোট্যাল ব্ল্যাকনেস।

এতো কিছু রোগের ব্যাখ্যা তুমি অম্লানের কাছ থেকে জেনে নিও। সতী, নন্দিতা, রুবি এদের হত্যা করার জন্যে 'তাৎক্ষণিক জিঘাংসা' কাজ করেছিল। সোহিনী তোমার সন্দেহের কথা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তাই আমি কিছুদিনের জন্যে ছুটি নিয়েছিলাম। অসুস্থতার গ্রাউন্ডে। অবশ্য আমি সত্যিই অসুস্থ হয়ে পড়ছিলাম। এক একটা মার্ডারের পর তিন চারদিন আমি প্র্যাকটিক্যালি আধমরা হয়ে থাকতাম। আমার সব জোর চলে যেত। সব আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলতাম। সেটা সকালের দিকে। কিন্তু রাত নামলেই, পেটে মদ পড়লেই, উন্মত্ত

কামনা আমাকে তছনছ করতো। নয়নতারা থাকতো না। ফলে অন্য কোন মেয়ের সঙ্গ পেতেই চাইতাম। যাদের পেয়েছিলাম, পরের দিন জেনেছি তারা মৃত।

আমি আর পারছিলাম না। ডাক্তার জেকিল আর মিস্টার হাইডকে এক দেহে পোষা সম্ভব হচ্ছিল না। অ্যামনেসিয়া কেটে গেলেই আবছা আবছা অনেক কিছুই স্মৃতিতে ভেসে উঠত। তখন আর এক যন্ত্রণা।

আমি খুনি। অন্তত নয়নতারাকে খুন করার পর মনে হল আর আমার সমাজে থাকা উচিত নয়। নয়নতারার ঔদাসীন্য, ওর ঘৃণার দৃষ্টি, ওর কেবলি নিজেকে বাঁচানোর স্বভাবটা আমার ভালো লাগেনি। জগতে এরাই তো বিশেষ স্বার্থপর। ও চেষ্টা করলে আমাকে ভাল করতে পারতো। করেনি। নিজেকে বাঁচানোর জন্যে। তাই, সাদা মাথায় খুব সহজ পদ্ধতিতে ওকে খুন করেছি। পিছন থেকে গলায় ফাঁস দিয়ে একটা হ্যাঁচকা টান। এতো আরামের মৃত্যু আর হয় না। কষ্ট পাবার আগেই কষ্ট শেষ।

আমি জানি, মিস সোহিনী আমাকে ডিটেক্ট করে ফেলেছে। মেয়েটা ভবিষ্যতে নাম করবে। কয়েকটা ছোট খাটো ক্লু থেকেই ওর বিশ্বাসটা তৈরি হয়ে যায়। নিজেকে আর আমি বাঁচাতে চাই না। তাই খুনের হাতিয়ার সবুজকালো ইলাসটিক কর্ডটা নয়নতারার পেছনেই রেখে এসেছিলাম।

মিস্ সোহিনী যে ডি সি ডি ডি সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে টোপ হিসেবে স্বপ্নাকে আমার সামনে রাখবে তা জানতাম। কারণ গোয়েন্দা হিসেবে আমি খুবই যোগ্য মানুষ। ইচ্ছে করলেই স্বপ্নাকে আমি মারতে পারতাম। অজস্র সুযোগ ছিল। স্বপ্নার শরীরী খিদে ছিল। আমাকে তার অদেয় কিছু ছিল না। কিন্তু আমি যে হ্যাবিচুয়াল খুনি নই সেটাই তো প্রমাণ হোল স্বপ্নাকে না খুন করে। তাছাড়া স্বপ্নাকে কেনই বা খুন করব? স্বপ্না তো আমার সঙ্গে কোন বেইমানি করেনি। কোন অহঙ্কার, কোন অবহেলা, কোন ঘৃণা করেনি বরং তার কাছে গেলে আমার নির্মম একাকিত্ব ঘুচে যেতো। সে আমাকে সান্ত্বনা দিত। ও আমাকে ভালবেসে ফেলেছিল।

ওকে অজ্ঞান করেছিলাম একটাই কারণে, ও বলেছিল নিজেকে পুলিসের হাতে তুলে দিতে। এবং সে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে যতদিন না আমি ছাড়া পাই।

নাহ্ তা হয় না। সত্যি বলতে কি স্বপ্নাকে আমিও ভালোবেসেছি। তাই ওকে মিথ্যে আশ্বাসে বসিয়ে রাখতে চাই না। অম্লান, যদি পার তোমার স্বপ্নাদির একটা বিয়ে দিও। ওর সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, ও বড় একা। ও বড় সংসার ভালবাসে। নিজের সংসার। ও নিজেকে মা হিসেবে দেখতে চায়।

অম্লান ভাই আমার, স্বপ্নার বেলা বয়ে যাচ্ছে। ওকে আমার কথা বলে বিয়েতে রাজি করিও।

মিস্ সোহিনী, এবং সুবীর, আমি চললাম। কোন ভাবেই আমাকে তোমরা ধরতে পারবে না। তোমাদের থেকে আমি অনেক বেশি এফিসিয়েন্ট। কখন পালাতে হয়, কী ভাবে পালাতে হয় আর পালিয়ে গেলে আর তাকে ধরা যায় না এগুলো তোমাদের থেকে আমার মগজে বেশি খেলে। বোধ হয় আমার মগজে খুনি আর ডিটেকটিভ দুজনে বাসা বেঁধে আছে বলে।

নাহ্ শাস্তি এড়াতে নয়। আমার শাস্তি কী হওয়া উচিতসেটা আমি জানি। সেটাই আমি বেছে নিলাম। কিন্তু তোমাদের তথাকথিত শাস্তি বিধান আমার জানা আছে। ওগুলো আজ কিছু মানুষের হাতে খেলার সামগ্রী হয়ে গেছে। এক মহাচিন্তকের ভাষায় বলতে হয়, আইন

সে তো তামাসা মাত্র, বড়লোকেরা পয়সা খরচ করিয়া উপভোগ করিয়া থাকেন। উপভোগটা এখনও চলছে। তবে সেটা বড়লোক বা জমিদারদের নয়। সেদিনের সেই মহাজনেরা মরে ভূত হয়নি, তারা হয়েছে রাজনীতিবিদ। পয়সা খরচ করে নয়, নিজেদের স্বার্থ বাঁচানোর যন্ত্র হিসেবে আইন নামক একটি খেলার ফর্মুলা প্রয়োগ করে দেশটাকে ধাপ্পাবাজিতে ভরিয়ে দিয়েছে। তাই, এদের শাস্তি আমার মনঃপূত নয়। আমি আমার শান্তির খোঁজেই চললাম। সেটা কী জানি না। হ'তে পারে নির্বাসন। সভ্য জগত থেকে চিরনির্বাসন। আই ওয়ান্ট পিস। আ ম্যান ইন সার্চ অব ইটারন্যাল পিস। জানি না তা পাওয়া যায় কি না। আর ঐ না পাওয়াটাই নিজেকে ছিঁড়ে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট। মিথ্যে আমায় খুঁজো না। পাবে না। ইতি,

তোমাদের গোলাপসুন্দর।